নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কামিনীর
কণ্ঠহার
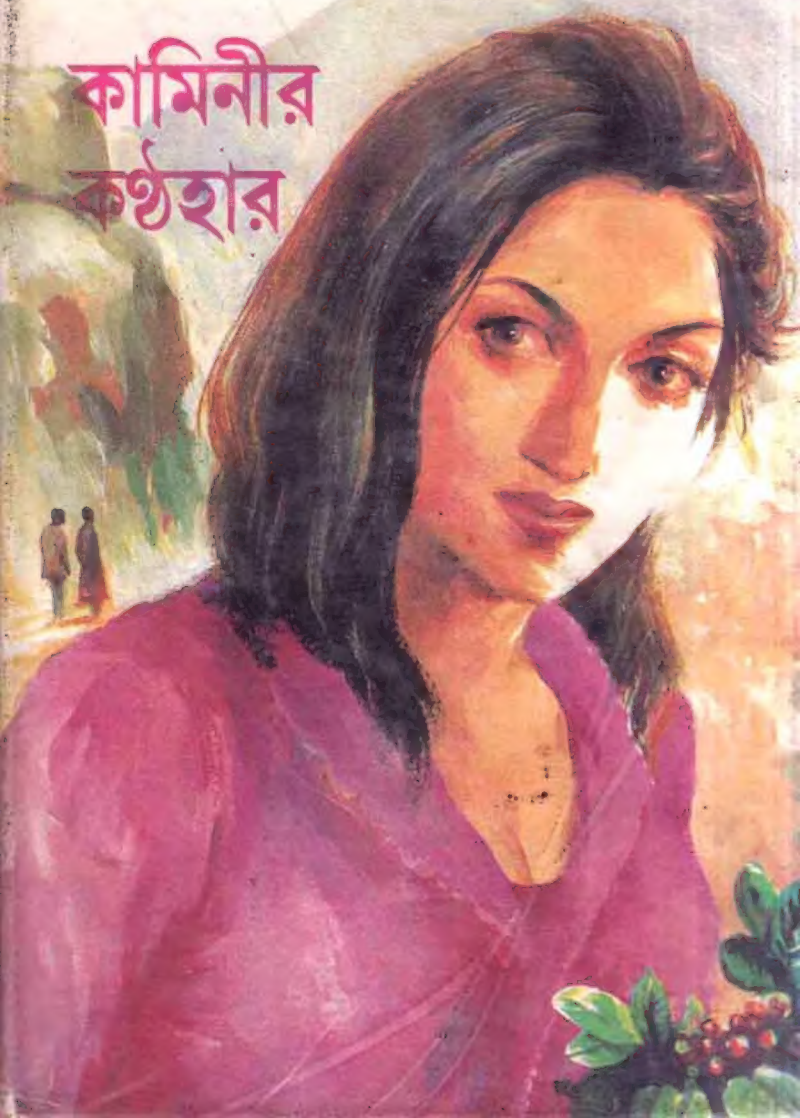
এতে আছে

কা মি নী র ক ণ্ঠ হা র

ভাদুড়িমশাই কোনও কথাই বলছিলেন না। হাতে একটা পেনসিল, পাশে একটা ইরেজার। চুপচাপ তিনি আজকের বাংলা কাগজের ভিতরের দিকের একটা পাতায় চোখ রেখে বসে ছিলেন। অথচ কিছু যে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন, তাও নয়। মাঝে-মাঝে পেনসিল দিয়ে কাগজের পাতাতেই কিছু লিখছেন, আবার ইরেজার দিয়ে দু-একটা কথা মুছেও দিচ্ছেন মাঝে-মাঝে, এদিকে আমরা যে একটা জরুরি বিষয়ে তুমুল তর্ক চালাচ্ছি, সেদিকে কোনও নজরই তাঁর নেই।

আজ শনিবার, সাতাশে এপ্রিল, ভাদুড়িমশাই এবারে বাংলা নববর্ষে কলকাতায় আসতে পারেননি, বাঙ্গালোরে কী একটা জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় সেখানেই আটকে গিয়েছিলেন, সেটা মিটিয়ে গতকাল তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছন। পৌঁছেই আমাকে খবর দিয়েছিলেন, ফলে আজ সকালে সদানন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমি অরুণ সান্যালের কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়েছি।

মামাবাবুর সঙ্গে কৌশিকও চলে এসেছে কলকাতায়। অরুণ সান্যালের স্বাস্থ্য মাঝখানে ভাল যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ, ব্লাড প্রেশার ফ্লাকচুয়েট করছে না, একদম নর্মাল, বিকেলের দিকে নিয়মিত চৌরঙ্গীর চেম্বারে বসছেন, রোগী দেখছেন আগের মতোই। আড্ডাও তাই জমজমাট। একটু আগে ক্রিকেট নিয়ে কথা হচ্ছিল। কৌশিক বলছিল, সৌরভ যখন বড় একটা রান পেয়েছে, তখন আর দেখতে হবে না, সিরিজ আমরা জিতবই।

শুনে অরুণ সান্যাল বললেন, "তা নয় জিতলি, কিন্তু ফুটবলের কথাটা ভুলে যাসনি। যাতে আমরা এশিয়া-চ্যাম্পিয়ন ছিলুম, তার স্ট্যান্ডার্ড তো এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। যে-খেলা চুনি-পিকে-বলরামরা দেখিয়ে গেছে, তার নখের জুগ্যি খেলাও কি আজকাল দেখতে পাস?"

কৌশিক বলল, "বোস্-জেঠু সেই যে হাবুল বাঁড়ুজ্যের গপ্পো বলেছিলেন, সেই যিনি...."

সদানন্দবাবু ফুঁসে উঠে বললেন, "গপ্পো নয় হে ছোকরা, তাঁর খেলা আমি নিজের চোকে দেকিচি।.....কিন্তু খেলার কতা থাক্, ইদিকে ফাইনান্স মিনিস্টার যে আমাদের ডুবিয়ে ছাড়লেন, সেটা ভেবে দেকেচ?"

"কেন, তিনি আবার কী করলেন?" আমি বললুম, "কিছু ছাড় তো দিয়েছেন।"

"ঘোড়ার ডিম দিয়েচেন!" সদানন্দবাবু বললেন, "আমরা সিনিয়ার সিটিজেনরা কী পেলুম? ভেবেছিলুম, অন্তত আমাদের বয়েসের কতা ভেবে সিনিয়র

সিটিজেনদের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করবেন, আর-কিছু না হোক ফিক্স্‌ড ডিপোজিটের সুদ খানিকটে বাড়িয়ে দেবেন। তা দিলেন কি?....ঠিক আচে, ভোট আসুক, তখন ঠ্যালা বুজবেন অখন!"

অরুণ সান্যাল হেসে বললেন, "বোসদা, আপনি যে ভোটের কথা ভাবছেন, তাতে ওঁকে দাঁড়াতে হয় না, উনি রাজ্যসভার মেম্বার।"

"ঠিক কতা! আমি সেই জন্যেই একটা দাবি তোলার কতা ভাবচি।"

বললুম, "দাবিটা কী?"

সদানন্দবাবু বললেন, "খুবই সিম্পল ডিমান্ড! রাজ্যসভার মেম্বারকে ফাইনান্স মিনিস্টার করা চলবে না। তাঁকে লোকসভার মেম্বার হতে হবে, ইলেকশন ফেস করতে হবে।"

অরুণ সান্যাল বললেন, "খুবই ন্যায্য দাবি! তো বোসদা, এই নিয়ে আপনি একটা চিঠি লিখে ফেলুন। খুব কড়া চিঠি। তারপর কাগজে সেটা ছাপিয়ে দিন।"

"ওই হয়েছে মুশকিল!" সদানন্দবাবু এতক্ষণ টগবগ করে ফুটছিলেন, হঠাৎ চুপসে গিয়ে বললেন, "লেকালিকি আমার আসে না। কিরণবাবু রাইটার মানুষ, এই কতাটা উনি যদি একটু গুচিয়ে-গাচিয়ে লিকে দেন তো বেশ হয়। আমি অবিশ্যি সই করে দেব অকন।......তবে হ্যাঁ, চিঠিখানা বাংলায় লেকা চলবে না, ওটা ইংরিজিতে লেকা চাই। ইংরিজি কাগজে ছাপতে হবে, যাতে নিউ দিল্লির কর্তাদের চোকে পড়ে।"

চিঠি লেখার দায়িত্বটা যে কেন এত লোক থাকতে উনি বেছে-বেছে আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন, তা ঠিক বোধগম্য হল না, তবে এটা ঠিকই বুঝলুম যে, সদানন্দবাবু যখন একবার ব্যাপারটাকে ধরেছেন, তখন নিস্তার পাওয়া শক্ত হবে। তাই তখনকার মতো রেহাই পাবার জন্যে বললুম, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেখন।"

অরুণ সান্যাল বললেন, "আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলুম।"

"কী ভাবছিলেন?"

"ভাবছিলুম যে, ফিক্স্‌ড ডিপোজিটের উপরে সুদ যখন আর বাড়ছেই না, বরং দিনে-দিনে কমেই যাচ্ছে, তখন ব্যাঙ্কে টাকা না-রেখে কিছু জমিজমা কিনে রাখলে কেমন হয়? জমির দাম তো লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ছে। ওতে রিটার্ন অনেক বেশি। কী, কথাটা ভুল বললুম?"

"ষোলো আনার ওপরে আঠারো আনা ভুল বলেচেন।" সদানন্দবাবু বললেন, "জমি? ওতে তো ডাহা লোকসান।"

"এ-কথা কেন বলছেন?"

"বলচি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সের কথা ভেবে।" সদানন্দবাবু বললেন, "আরে মশাই জমি তো কিনবেন, তারপরে সেটা রক্ষা করবে কে?"

"কেন, দরোয়ান রাখব।"

সদানন্দবাবু তেতো গলায় বললেন, "তবেই হয়েচে। তা হলে শুনুন, আমার কী হয়েছেল। বছর দশেক আগের কতা। সস্তায় পেয়ে বাঁশবেড়ের ওদিকে এক বিঘে জমি কিনেছিলুম। দরোয়ানও রেখেছিলুম একটা। কাচেই হংসেশ্বরী দেবী আর রাধামাধবের মন্দির। অতি পবিত্র জায়গা। ভেবেছিলুম যে, কমলি তো বড় হচ্চে, বছর কয়েক বাদে ওর বে দিতে হবে। তখন মেয়ে-জামাইকে আমাদের শ্যালদার বাড়িতে বসিয়ে আমরা কত্তা-গিন্নি গিয়ে বাঁশবেড়েতে একটা ছোট্টমতন বাড়ি বানিয়ে নিয়ে সেখেনেই থাকব। কিন্তু তা আর হল কোতায়!"

"হল না কেন?"

"কী করে হবে। জমি কিনলুম, তার রেজিস্টারি হল, দরোয়ানও রেখেছিলুম একটা, লোক্যাল ম্যান, গাঁজাখোর বটে, তবে সবাই বলল, ভেরি অনেস্ট। মাইনে ঠিক হল মান্থলি পঞ্চাশ টাকা। তো বছর খানেক সেই টাকা তাকে পাঠিয়েছিলুমও। তারপর একদিন মিসেস বোসকে সঙ্গে নিয়ে সেখেনে গিয়ে কী দেকলুম জানেন?"

"কী দেখলেন?"

"দেকলুম যে, আমার জমিতে গোলপোস্ট বসিয়ে গাঁয়ের ছেলেরা ফুটবল খেলচে। জিজ্ঞেস করতে বলল, ওটা ওদের খেলার মাঠ। এখন ফুটবল খেলচে, এরপরে শীত পড়লে ব্যাটবল খেলবে। তো ব্যাপার দেকেই যা বোজবার আমি বুজে গেলুম!"

"কী বুঝলেন?"

"বুঝলুম, সব্বোনাশ হয়েচে!"

"থানায় যাননি?"

"গেসলুম। কিন্তু দারোগাবাবু বললেন, এখন ও-জমির পজেশান পেতে গেলে ল' অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম দেকা দেবে, শান্তিভঙ্গ হবে। এইসব বলে একগাল হেসে দারোগাবাবু অ্যাডভাইস দিলেন, মিটিয়ে ফেলুন মশাই। তো কী আর করব, যে-দামে কিনেছিলুম, তার অর্ধেক টাকায় জমিটা ফের বেচে দিতে হল।....সান্যালমশাই, জমি কেনার কতা বলছিলেন তো? আমি বলি, জমি না কিনে টাকাটা বরং জলে ফেলে দিন!"

দ্বিতীয় রাউন্ডের চা নিয়ে কাজের মেয়েটি ড্রইংরুমে ঢুকল। সঙ্গে মালতী। সেন্টার টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে কাজের মেয়েটিকে মালতী বলল, "তুই এবারে হেঁশেলে গিয়ে ডালটা নামা, তারপর ভাতটা চাপিয়ে দে। আমি একটু বাদে যাচ্ছি।"

তারপর পট থেকে কাপে-কাপে লিকার ঢালতে-ঢালতে বলল, "বোসদা আর কিরণদা তো স্রেফ লিকার খান। কৌশিক, তুই তোর নিজের আর মামাবাবুর কাপে দুধ আর চিনি মিশিয়ে নে। তোর বাবার আর এখন চা খেয়ে দরকার

নেই। বাড়তি এক কাপ চা আছে বটে, তবে সেটা আমিই খেয়ে নিচ্ছি।''

অরুণ সান্যাল কাতর কণ্ঠে বললেন, ''আমাকে দেবে না?''

কাল রাতে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। সকালটা এখনও তেতে ওঠেনি। সম্ভবত সেইজন্যেই মালতীর মেজাজ মোটামুটি ঠাণ্ডা। চায়ের কাপটা অরুণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ''যেই একটু সুস্থ হয়ে উঠেছ, অমনি অনিয়ম শুরু করলে! কাল থেকে কিন্তু সকালে ওই এক কাপই তোমার বরাদ্দ।.....তা কী নিয়ে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল?''

কৌশিক বলল, ''অনেক কিছু নিয়ে। প্রথমে ক্রিকেট, তারপর ফুটবল, তারপর আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশবন্ত সিন্‌হার বাজেট, তারপর ল্যান্ডেড প্রপার্টি। বাবা বলছিলেন, ব্যাঙ্কে টাকা না রেখে জমি কেনাই ভাল।''

''সাধে বলছিলুম?'' একটা চুমুক দিয়ে তাঁর চায়ের কাপটা সোফার পাশের সাইড টেবিলে নামিয়ে রেখে অরুণ সান্যাল বললেন, ''ফিক্স্‌ড ডিপোজিটের সুদের হার তো ধাপে-ধাপে কমছে! এই সেদিনও ছিল থার্টিন পার্সেন্ট, সেখান থেকে কমতে-কমতে কোথায় নেমেছে দ্যাখো!''

সদানন্দবাবু বললেন, ''ডাক্তারবাবু তাই জমি কেনার কতা বলচেন। তাতে আমি বললুম, অমন কাজটি করবেন না। জমি কিনেচেন কি মরেচেন! আরে মশাই, আপনার পাইক-বরকন্দাজ আচে? লেঠেল আচে? তা যকন নেই, তকন জমিটা রক্ষে করবে কে?''

মালতী বলল, ''তার মানে?''

''মানে অতি সিম্পিল।'' সদানন্দবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বললেন, ''জমি তো আমিও কিনেছিলুম, কিন্তু রাকতে পারলুম কি? হাপ প্রাইসে বেচে দিতে হল। না বেচে উপায় ছিল না, প্রায় বেহাত হয়ে গেসল।....ডাক্তারবাবুকে তাই বলছিলুম যে, আমরা হচ্চি নিদিরাম সদ্দার। আমাদের না আচে ঢাল, না আচে তরোয়াল, জমি রাকা কি আমাদের কম্মো?''

''যাচ্চলে!'' বেজার মুখে মালতী বলল, ''সারাটা জীবন কি তা হলে ফ্ল্যাটেই থাকব নাকি? সেই যতীন বাগচি রোডে ফ্ল্যাটে ছিলুম, আবার এই কাঁকুড়গাছিতেও সেই তিন-কামরার ফ্ল্যাট!''

কৌশিক বলল, ''সেটা কমু হল? জায়গার তো অভাব হচ্ছে না, দিব্যি কুলিয়ে যাচ্ছে। কী, কুলোচ্ছে না?''

''এখন কুলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোর তো বিয়ে হবে, তখন কুলোবে না।''

''বুঝেছি, জমি কিনে বাড়ি করার প্ল্যানটা তা হলে তুমিই বাবার মাথায় ঢুকিয়েছ?''

''ঢুকিয়ে অন্যায় করেছি?''

সদানন্দবাবু বললেন, ''ন্যায়-অন্যায়ের কতা হচ্চে না, মিসেস সান্যাল। কতা

হচ্চে যা কিনবেন, তা দখলে রাকতে পারবেন কি না, তা-ই নিয়ে। তা আমি বলি কী, জায়গা নিয়ে যকন ভাবচেন, তকন বরং পাশের ফ্ল্যাটটাও কিনে ফেলুন।"

"সেভেন-বি ফ্ল্যাটটা?" ওটা বিক্রি হবে নাকি?"

"হবে।" এক গাল হেসে সদানন্দবাবু বললেন, "আজই সকালের কাগজে ক্লাসিফায়েড কলামে বিজ্ঞাপন দেকলুম। এই একই ঠিকানা, বাড়ির নামও গগনবিহার, তার মানে এই একই বাড়ি। ইদিকে আবার ফ্ল্যাটের নম্বরও সাতের বি। তার মানে আপনাদের একেবারে পাশের ফ্ল্যাট। একবার কতা বলে দেকুন না, লেগে যেতে পারে।"

আমি বললুম, "যদি ডিসট্রেস সেল হয়....আই মিন ভদ্রলোকের যদি এখুনি টাকার দরকার হয়..মানে দরকার তো হতেই পারে....ধার শোধ করার জন্যে কি ধরুন এখানকার পাট তুলে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার জন্যে, তা হলে দাম নিয়ে হয়তো তেমন ঝুলোঝুলিও করবেন না, মোটামুটি একটা রিজনেব্‌ল অ্যামাউন্ট পেলেই ছেড়ে দেবেন।"

"কিন্তু রিজনেব্‌ল প্রাইস মানেও তো বেশ কয়েক লাখের ধাক্কা।" অরুণ সান্যাল বললেন, "এই ধরুন দশ-বারো লাখ, তার কমে তো আর হচ্ছে না। তা সেটাই বা আমি এখন কোত্থেকে পাব?"

মালতী বলল, "ঠিক আছে, তোমাকে জমি কিনতে হবে না, ফ্ল্যাটও কিনতে হবে না। তার চাইতে বরং আমাকে কিছু টাকা দাও, আমি গোটা কয় গয়না কিনে রাখি।"

কৌশিক বলল, "তুমি আবার গয়না দিয়ে কী করবে?"

"ওরে বাবা, আমি নিজের জন্যে কিনছি না, আজ না হোক কাল তো তুই বিয়ে করবি, তখন তোর বউকে দেব। ব্যাঙ্কে টাকা রাখার চাইতে সে অনেক ভাল, সোনার দাম তো আর কমবে না, বাড়বে। যা বাজার পড়েছে, তাতে গয়নাগাটি কেনাই দেখছি বুদ্ধিমানের কাজ।.....দাদা কী বলো?"

মালতীর দাদা ভাদুড়িমশাই এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি, বাংলা কাগজখানার আড়ালে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন আর পেনসিল দিয়ে মাঝে-মাঝে কিছু লিখছিলেন। চা'ও খেয়ে নিয়েছিলেন নিঃশব্দে। এবারে হাতের কাগজ নামিয়ে রেখে বললেন, "পেয়েছি!"

সদানন্দবাবু হামলে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী পেলেন?"

"যেটার দরকার ছিল, সেটাই পেলুম।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "মালতী পাইয়ে দিল!"

মালতী তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। বলল, "আমি? আমি আবার কী পাইয়ে দিলুম?"

"গয়নাগাটি। ভার্টিক্যালি যে শব্দটা নেমেছে, তার শেষ অক্ষরটা হল 'টি'। তাই হরাইজন্টালি যে পাঁচ অক্ষরের শব্দটা বসবে, তারও শেষ অক্ষরটা 'টি' হওয়া চাই। এদিকে সূত্র দেওয়া হয়েছে 'অনেক মেয়েরই যা প্রিয়'। ব্যস, তোর মুখ থেকে বেরিয়েছিল বলেই 'গয়নাগাটি' শব্দটা পেয়ে গেলুম, আর ছকও অমনি মিলে গেল!"

"মিলে গেছে, ভাল কথা!" মালতী বলল, "তবে কিনা সূত্রটা নির্ভুল নয়, দাদা।"

"এ-কথা বলছিস কেন?"

"এইজন্যে বলছি যে, গয়নাগাটি শুধু মেয়েদের নয়, অনেক ছেলেরও প্রিয়। কেন, ছেলেরা আংটি পরে না? হার পরে না? অনেকে তো মাকড়িও পরে।"

"ঠিক, ঠিক। এককালে অঙ্গদও পরত।"

অরুণ সান্যাল বললেন, "সেটা আবার কী বস্তু?"

"হাতের গয়না।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কনুইয়ের একটু উপরে ধারণ করতে হয়। সেকালে রাজা-রাজড়ারা পরতেন। কালিদাসের যক্ষও পরত। মেঘদূতের মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে। বিরহের ঠ্যালায় বেচারা এমন রোগা হয়ে গেসল যে, হাতের অঙ্গদ ঢলঢলে হয়ে খসে পড়ে যায়।"

"তা-ই?" প্রশ্নটা সদানন্দবাবুর।

"হ্যাঁ, তা-ই!" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কালিদাস অন্তত সেইরকমই লিখেছেন। প্যারীমোহন সেনগুপ্তের তর্জমা পড়েননি? 'খসিয়া ভূমি পরে সোনার বালা পড়ে, নিটোল বাহু হল এমনই ক্ষীণ।' ওই সোনার বালাজোড়া আসলে বিরহী যক্ষের অঙ্গদই।"

সদানন্দবাবু বললেন, "আমার দিদিশাশুড়িও অঙ্গদ পরতেন। তবে তাঁর কেসটা একটু আলাদা।"

অরুণ সান্যাল বললেন, "কী রকম?"

"তিনি রোগা হননি, মোটা হয়ে গেসলেন। ফলে অঙ্গদ তাঁর মাংসের মধ্যে কেটে বসে গেসল। শেষকালে স্যাকরা ডাকতে হয়। সে এসে কাতুরি দিয়ে সেই অঙ্গদ কেটে তা ধরুন আরও ইঞ্চিখানেক বাড়িয়ে দেয়। তবে কিনা আমার দিদিশাশুড়ি খুব দুধ-ঘি-ছানা খেতেন তো, এরপর থেকে সে-সব বন্ধ হয়ে গেসল। দাদাশ্বশুর বলেছিলেন, ছি ছি, ফের যদি স্যাকরা ডেকে গয়নার সাইজ বাড়িয়ে নিতে হয় তো নাতি-নাতনি-নাতবউয়েরা হাসাহাসি করবে!"

মালতী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে পড়েছিল। বলল, "আমি এবারে ওদিকে যাই। দেখি রান্না কদ্দুর এগোল।"

হাসতে-হাসতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি বললুম, "কিন্তু একটা কথা যে বুঝতে পারছি না, ভাদুড়িমশাই।"

"কী কথা?"

"বরাবর তো ইংরেজি কাগজের ওআর্ড-জাম্বলটা করতেন দেখেছি। বাংলা কাগজের ক্রসওআর্ড আবার কবে থেকে ধরলেন?"

"আজ থেকে ধরলুম।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তবে ওআর্ড-জাম্বলও ছাড়িনি।"

"ওটা হয়ে গেছে?"

"আপনারা আসার আগেই হয়ে গেছে। যে অক্ষরগুলি পেয়েছিলুম, সেগুলি হল আর-ই-ডি-আর-ইউ-এম-ই-আর। ঠিক করে বসাতেই মার্ডারার শব্দটা বেরিয়ে পড়ল।"

"ওরেব্বাবা!" সদানন্দবাবু বললেন, "ই কী কাণ্ড! গয়নাগাটি নিয়ে কতা হচ্চিল, তার ওপরে আবার মার্ডারার! নাঃ, মাতাটা গরম করে দিলেন দেকচি!"

আমি বললুম, "যাদৃশী ভাবনা যস্য! এ-সব শব্দ বোধ হয় আপনার মতন লোকদের কথা ভেবেই বসানো হয়, ভাদুড়িমশাই।"

ভাদুড়িমশাই হাসলেন, তবে আমার কথার জবাবে কিছু বললেন না, সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাথাটা কি খুব গরম হয়েছে?"

"খুব।"

"তা হলে চলুন, একটা ঠাণ্ডা জায়গা থেকে ঘুরে আসি।"

সদানন্দবাবু উৎফুল্ল গলায় বললেন, "তা হলে তো ভালই হয়ে। কোতায় যাবার কতা ভাবচেন? দার্জিলিং? কার্শিয়ং? শিলং?"

"না। ডুণ্ডা ভ্যালি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "হিমালয়ের কোলে। এখন যাকে উত্তরাঞ্চল বলে, সেই জায়গায়। আমার এক বন্ধু থাকেন, তিনি যেতে লিখেছেন, ভাবছি আজ তো সাতাশে, মঙ্গলবার তিরিশ তারিখে রওনা হব। আপনারা যাবেন?

"যাব।" আমি বললুম, "কিন্তু কীসের জন্যে? স্রেফ বেড়ানো?"

আমার কথায় একটু সন্দেহের ছোঁয়া ছিল। ভাদুড়িমশাই সেটা বুঝতে পেরে হেসে বললেন, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বেড়াব তো বটেই, তবে কিনা একটু কাজও আছে।"

।। ২।।

আজ দোসরা মে, বৃহস্পতিবার। হাতঘড়িতে দেখছি, রাত এখন এগারোটা। আমি আর সদানন্দবাবু একই ঘরে আছি। সদানন্দবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার ঘুম আসছে না। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে গত দু'দিনের কথা লিখে রাখছি, নইলে পরে হয়তো ভুলে যাব।

তিরিশে এপ্রিল মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সকালের ফ্লাইটে দিল্লি আসি।

গ্রেটার কৈলাসের বিকাশ বিশ্বাস আমার অতি স্নেহের পাত্র, অনেক দিনের বন্ধুও বটে। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগের দিন ফোনে তাকে আমাদের দিল্লি যাওয়ার কথা জানিয়ে রেখেছিলুম ঠিকই, তবে তাই বলে সে যে গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে আসবে, তা ভাবিনি। বিকাশ ধরে বসল যে, তার বাড়িতেই উঠতে হবে। তা অবশ্য ওঠা হল না। চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীবাড়ির লাগোয়া যে একটা চমৎকার গেস্ট হাউস হালে বানানো হয়েছে, ভাদুড়িমশাই আগে থাকতেই সেখানে দুটো ঘর বুক করে রেখেছিলেন, ফলে সেখানেই উঠতে হয়।

বিকাশই অবশ্য সেখানে পৌঁছে দেয় আমাদের।

যেমন কালীবাড়ি, তেমন বাগান, তেমন লন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বোশেখ মাস, কড়া রোদ্দুর, অথচ লনের ঘাস এতটুকু হলদে হয়ে যায়নি। বোঝা যায়, মেনটেন্যান্সে কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই। সদানন্দবাবু তো বলেই ফেললেন যে, পারলে তিনি তাঁর বাদবাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিতেন। "এ তো স্বর্গরাজ্য মশাই!" এই কথাটা অবশ্য কাল বিকেলে হরিদ্বারে ও হৃষীকেশেও তিনি বলেছেন, আবার আজ দুপুরে নরেন্দ্রনগরে ও বিকেলবেলায় ভুণ্ডা ভ্যালিতে পৌঁছেও তিনি রিপিট করেছেন।

এখন আবার আগের কথায় ফিরে যাই। গ্রেটার কৈলাস থেকে চিত্তরঞ্জন পার্কের দূরত্ব নেহাতই সামান্য। সন্ধেবেলায় এসে বিকাশ আমাদের তাই তার গ্রেটার কৈলাসের বাড়িতে টেনে নিয়ে যায়, তারপর রাতের খাওয়া খাইয়ে সে-ই আবার আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যায় কালীবাড়ির গেস্ট হাউসে। ইতিমধ্যে হৃষীকেশে যাওয়ার ট্যাক্সির ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছিল। তিরিশে এপ্রিল রাতটা আমরা চিত্তরঞ্জন পার্কে কাটাই। পরদিন সকালে সেখানেই স্নান আর ব্রেকফাস্ট করি। তারপর গেস্ট হাউসের বিল মিটিয়ে কালীবাড়ির টিলা থেকে নীচের রাস্তায় নেমে দেখি, ট্যাক্সি এসে গেছে।

ট্যাক্সিওয়ালার নাম ইন্দরলাল। বয়েস বছর পঁচিশ-তিরিশের বেশি হবে না। হরিয়ানার হট্টাকট্টা জোয়ান যুবক। সে-ই গাড়ির মালিক, চালকও সে-ই। ইন্দরলালের মেজাজটাও ভাল, নইলে কি আর গাড়ি চালাতে-চালাতে অমন গুনগুন করে গান গায়। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ইন্দরের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে যে, যতদিন না আমরা দিল্লি ফিরছি, ইন্দরও ততদিন আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তা সাতুই মে'র আগে তো আমরা দিল্লি ফিরে কলকাতার প্লেন ধরছি না, সেই ক'টা দিন ইন্দর যদি আমাদের কাজে বহাল থাকে তো ভালই, কাছাকাছি কয়েকটা জায়গা থেকে একটু ঘুরে আসা যাবে।

যা বলছিলুম। দিল্লিতে খুচরো কয়েকটা কাজ সেরে নিয়ে আমরা হৃষীকেশের পথে রওনা দিলুম। এই রাস্তায় আমি আগেও দু'বার এসেছি। একবার ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে, একবার একা। মোদীনগর, মুজফ্ফরনগর, রুরকি ইত্যাদি

সব জায়গা পার হয়ে হরিদ্বার পৌঁছতে-পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যায়। সেখানে দুপুরের খাওয়া সেরে নিই। খাওয়ার আগে সদানন্দবাবু বায়না ধরেছিলেন যে, হরকি পৈরিতে তিনি লোহার শেকল ধরে গঙ্গাস্নানটা সেরে নেবেন। ভাদুড়িমশাইয়ের আপত্তিতে সেটা সম্ভব হয়নি। ঘাটের ধারে একটা গলিতে ঢুকে বাসমতী চালের ভাত, অড়হর ডাল আর রাজমা'র একটা তরকারি দিয়ে নিরামিষ মধ্যাহ্নভোজ সমাধা হল। শেষপাতে যে টক দইটা দিয়েছিল, সেটাও খারাপ লাগল না।

রাতটা হৃষীকেশে কাটাই। কলকাতার বাইরে গেলে সাধারণত আমরা দুটো ঘর নিয়ে থাকি। একটা ছেড়ে দিই ভাদুড়িমশাইকে। অন্যটায় থাকি আমি আর সদানন্দবাবু। এবার অনেক চেষ্টা করেও হৃষীকেশের কোনও হোটেলে দুটো ঘর পাওয়া গেল না। যাত্রী-সংখ্যা হঠাৎ নাকি ভীষণ বেড়ে গেছে, সর্বত্র ভিড়। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এখানকার পার্বতী নিগমের ট্যুরিস্ট লজে একটা থ্রি-বেডেড রুম নিতে হল। বাথরুম একটা বলে একটু অসুবিধে হল বটে, কিন্তু ঘরটা খোলামেলা, তার উপর কাচের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালে পাহাড় চোখে পড়ে। সন্ধে নামার আগেই লজ থেকে বেরিয়ে, খানিক হেঁটে, লছমন-ঝুলা পেরিয়ে গঙ্গার ওপার থেকে দিব্যি ঘুরেও আসা গেল। পুরি আর সবজি সহযোগে নৈশাহারও ওপারেই সমাধা করেছি। হাঁটাহাঁটি কম হয়নি। লজে ফিরে বিছানায় গা ঢেলে দেওয়া মাত্র ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে এল।

আজ দোসরা মে একটু দেরিতে ঘুম ভেঙেছিল। ভাদুড়িমশাই অবশ্য সাত-সকালে বিছানা থেকে উঠে পড়েছেন। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে এক চক্কর ঘুরেও এসেছেন এরই মধ্যে। লজে ফিরে তিনিই আমাদের ঘুম ভাঙান। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, আটটা বাজে। বেশ শীত। ভাদুড়িমশাইয়ের তো বরফ-ঠাণ্ডা জলেও স্নান করতে কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু যেমন আমার, তেমন সদানন্দবাবুরও গরম জল চাই। সেটা জোগাড় করতে অবশ্য বেগ পেতে হয়নি। চৌকিদারকে ডেকে তার হাতে একটা পাঁচ টাকার কয়েন গুঁজে দিতেই এক বালতি গরম জলের ব্যবস্থা হয়ে যায়। চটপট স্নান আর প্রাতরাশ সেরে নিয়ে, লজ ছেড়ে আমরা ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়ি।

হৃষীকেশের সামনে নদী, পিছনে পাহাড়। পাহাড়কে বেড় দিয়ে উঠে গেছে চকচকে কালো পিচের রাস্তা। সেই ঘোরানো রাস্তায় পাক খেতে-খেতে ইন্দ্রলালের গাড়ি একেবারে পাহাড়চূড়ায় গিয়ে পৌঁছল। নীচের দিকে তাকালে শুধুই পাহাড়, খাত, শীর্ণ দু-একটি ঝর্না আর গাছপালা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না, তবু মনে হয় যেন হৃষীকেশের একেবারে মাথায় আমরা চড়ে বসেছি। জায়গাটা আসলে একটা ছোট্ট শহর। নাম নরেন্দ্রনগর। ছিমছাম পরিপাটি জায়গা। দেখতে অনেকটা দার্জিলিঙের ম্যালের মতো। শহরের মাঝমধ্যিখানে একটা মার্কেট প্লেসও চোখে পড়ল। ট্যাক্সি থামিয়ে ভাদুড়িমশাই এক কার্টন সিগারেট কিনলেন। পথের ধারে

একটা দোকানে ঢুকে চা'ও খাওয়া হল। তারপর ফের উতরাই।

নীচে নেমে সমতলভূমি। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট জনবসতি। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের বাড়ি, খাপরার চাল। একটার পরে একটা বসতি পার হয়ে যাচ্ছি। হিন্দোলা, আগরখাল, ফাকট, জাজলস, নাগনি, চামুয়া, টিহারি, গোদিসরাই, চলদিয়ানা, জাম, নাগুন—নামের ফলকগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠেই ফের ছিটকে পিছনে চলে যাচ্ছে, কোনও কিছুই ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। না ঘরবাড়ি, না গেরস্থালি, না মানুষজন।

দেখতে-দেখতে ধরাসু বলে একটা জায়গায় পৌঁছে গেলুম। পথ এখান থেকে তিন দিকে চলে গেছে। পিছনের রাস্তা ধরে নরেন্দ্রনগরে ফিরে যেতে পারি। বাঁ দিকের রাস্তা চলে গেছে যমুনোত্রীর দিকে, আর গঙ্গোত্রীর দিকে যেতে হলে ধরতে হবে ডান দিকের পথ। আমরা ডান দিকের পথ ধরি। গঙ্গোত্রী দূরের ব্যাপার। তার অনেক আগে পড়বে উত্তরকাশী শহর। আমরা অবশ্য উত্তরকাশীতেও যাব না। তার আগে পড়বে ডুণ্ডা ভ্যালি। আপাতত সেখানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে।

একটা কথা বলতে ভুলেছি। ধরাসুতে পৌঁছবার আগেই বেশ কয়েকটা বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়া আমাদের চোখে পড়েছিল। কিন্তু চোখ ভরে সেগুলো দেখব কী! মাঝখানে ভাদুড়িমশাই যে-ই একবার উত্তরকাশীর নাম করেছেন, সদানন্দবাবু অমনি চমকে উঠে বললেন, "সে কী, এখানে আবার কাশী এল কোত্থেকে?"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "কাশী কি আর একটা? কাশী অনেক। কলকাতায় আছে কাশীপুর। তেমনি এখানেও আছে উত্তরকাশী।"

"যেমন ধরুন শ্রীনগর।" আমি বললুম, "ওটা কাশ্মীরেও আছে, আবার হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথে যাবার পথেও আছে।"

ইন্দরলাল বলল, "লঙ্কাকো নাম আপলোগ শুনা হোগা।"

সদানন্দবাবু বললেন, "হাঁ হাঁ, জরুর শুনা। য়হাঁ রাচ্ছস রহ্‌তা থা।"

"দুর মশাই," ভাদুড়িমশাই বললেন, "শুধু লঙ্কায় কেন, রাক্ষস-খোক্কস সব জায়গাতেই ছিল। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, লঙ্কাই কি মাত্র একটা নাকি?"

ইন্দরলাল বলল, "উয়ো ভি দোঠো হ্যায়!"

"অন্তত দুটো।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তার মধ্যে একটার কথা তো আমরা সবাই জানি। ওই মানে কলম্বো যার রাজধানী, আর আমাদের সত্যেন দত্ত যাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন—ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ।"

সদানন্দবাবু বললেন, "ঠিক আচে, ঠিক আচে, ওটার কতা সবাই জানে। অন্যটা কোতায়?"

"এই রাস্তা দিয়ে গঙ্গোত্রী যাবার পথে পড়বে।" আমি বললুম, "সেখানে চড়াই-

উতরাই ঠেঙিয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে ভৈরবঘাটে পৌঁছতে হবে। স্রেফ হাঁটাপথ। নো ট্যাক্সি, নো বাস!"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "আপনি ও-পথে শেষ কবে গেসলেন?"

"সত্তরের দশকে। নাইন্টিন সেভেন্টিফাইভে টু বি প্রিসাইজ।"

"তখন হাঁটতে হত। এখন বোধহয় লঙ্কাতে ব্রিজ হয়ে গেছে। সারাসরি ওখান থেকে গাড়িতে করেই ভৈরবঘাট হয়ে গঙ্গোত্রী চলে যাওয়া যায়।"

সদানন্দবাবু এতক্ষণে একটা মজার মন্তব্য করলেন। বললেন, "তার মানে সেই লঙ্কার মতন এই লঙ্কাতেও অ্যাদ্দিনে সেতুবন্ধন হয়ে গেচে?"

"হওয়াই সম্ভব।....আরে, বাঁ দিকে দেখুন...দেখুন!"

এতক্ষণ ডান দিকে তাকিয়ে ছিলুম, চোখ সেদিক থেকে ফেরানো যাচ্ছিল না। কী করে ফেরাব, অনেক সৌভাগ্য করে জন্মালে তবেই এমন একটা নদী দেখা যায়। পাথরে ভরা খাতের উপর দিয়ে নাচতে-নাচতে চলেছে স্বচ্ছ জলধারা। প্রচণ্ড স্রোত, ওর মধ্যে পড়লে হাতিও নিমেষে ভেসে যাবে। অপলক চোখে সেই জলধারাকেই দেখছিলুম আমি, ভাদুড়িমশাইয়ের কথায় চমক ভাঙল। বাঁ দিকে তাকিয়ে আর-এক চমক। হিমালয় একেবারে কাছে চলে এসেছে, আর তারই ঢালে পরপর ফুটে উঠছে বাড়িঘরের ছবি।

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কেমন দেখছেন?"

বললুম, "এই পথ দিয়ে আগেও তো গিয়েছি। কিন্তু যদ্দুর মনে পড়ছে, তখন এত বাড়িঘর ছিল না।"

"এখন অনেক বেড়ে গেছে। যাওয়াই স্বাভাবিক। অনেকেই একটু নিরিবিলি শান্তিতে জীবন কাটাতে চায় তো, তারা ঠিকই খবর পেয়ে যায়।"

"কারা থাকে এখানে?"

"মোস্টলি রিটায়ার্ড আর্মি অফিসারস!... কী সদানন্দবাবু, থাকতে ইচ্ছে হয় এখানে?"

সদানন্দবাবু বললেন, "জায়গাটার নাম কী?"

"ডুণ্ডা ভ্যালি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কয়েকটা দিন এখন এখানেই থাকব। ....ইন্দরলাল, সামনের বাঁ দিকে যে রাস্তাটা গেছে, ওখানেই গাড়ি ঘুরিয়ে ভিতরে ঢোকো।"

ভ্যালিটা আদ্যন্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঁচু পাঁচিল, তার উপরে কাঁটাতার। গেটটা ফুট বারো চওড়া। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেই কিন্তু বাধা পেতে হল। দেখলুম, চুঙ্গি কর আদায় করার জন্যে হাইওয়ের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো অব্দি যেমন কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে রাস্তা আটকে রাখা হয়, এখানেও ঠিক সেই রকমের ব্যবস্থা। ট্যাক্সি থামাতেই গেটের একদিকের সেন্ট্রি বক্স থেকে খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা একটি লোক বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির পাশে দাঁড়াল। হিন্দিতে জিজ্ঞেস

করল আমরা কার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ভাদুড়িমশাইও ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুর নাম বলতেই যে আমরা ছাড়া পেলুম, তা নয়। সান্ত্রি তার পকেট থেকে একটা কর্ডলেস ফোন বার করে বোতাম টিপে কারও সঙ্গে কিছু কথা বলল। তারপর ওদিক থেকে জবাব শুনে বলল, "যাইয়ে... তেরা নাম্বার কোঠি।"

রাস্তা থেকে ভাদুড়িমশাই আবার গাড়িতে উঠে পড়লেন। কাঠের ডাণ্ডা উপরে উঠে গেল। বাড়ি খুঁজতেও বেগ পেতে হল না। কেননা, খানিক এগোতেই চোখে পড়ল যে, এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ির সামনের লনে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ছেন। অনুমান করে নিতে অসুবিধে হল না যে, গেট থেকে সান্ত্রিটি এঁকেই ফোন করেছিল, তা নইলে আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের জন্যে ইনি অপেক্ষা করবেন কেন?

আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলুম। ভাদুড়িমশাই এগিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলার দু'হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "আমি আমার কথা রেখেছি, মিনি। কেমন আছিস?"

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, "কেমন দেখছ?"

"দশ বছর বাদে দেখছি বলে মনেই হচ্ছে না। অ্যাজ প্রিটি অ্যাজ এভার। ...আয়, আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই।"

ভাদুড়িমশাই আমাদের সঙ্গে ভদ্রমহিলার পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম তো একটু আগেই শুনেছি, এখন পুরো নাম শুনলুম। কামিনী রাসেল। এঁর স্বামী হারবার্ট রাসেল অবশ্য সাহেব নন, হিমাচল প্রদেশের মানুষ। আর্মিতে ডাক্তার ছিলেন। রিটায়ার করে এখানে জমি কিনে বাংলো বানিয়ে নিয়েছেন।

"বার্টি কোথায়?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তাকে দেখছি না কেন?"

"রোগী দেখতে গেছে।" কামিনী বললেন, "তোমরা আসার একটু আগে বেরিয়ে গেল।"

"কখন ফিরবে?"

"কিচ্ছু ঠিক নেই। মাইল দশেক দূরে একটা গ্রামে নাকি একই সঙ্গে জনা তিনেকের কলেরা হয়েছে। দরকার হলে রাত্তিরটা ও সেখানেই থেকে যাবে। ফিরতে-ফিরতে কাল সকাল।....কিন্তু তোমরা আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। ভিতরে চলো, হাতমুখ ধোও, কিছু খেয়ে নাও, তারপর কথা হবে।...ওহো, তোমাদের ট্যাক্সিটা কি ছেড়ে দেবে নাকি?"

"না।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি, আমরা এখানে যে ক'দিন আছি, ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তোদের এখানে ড্রাইভারদের থাকার কোনও আলাদা ব্যবস্থা নেই? থাকলে ওকে দেখিয়ে দে।"

"আছে।" কামিনী বললেন, "কিন্তু ওর আলাদা থাকার দরকার কী, আমাদের

একতলাটা তো খালিই পড়ে থাকে, ও বরং সেখানেই থাকুক।"

ইন্দরলালকে একতলায় তার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আমরা দোতলায় উঠে আসি।

বাংলোটার বর্ণনা দেওয়া দরকার। কিন্তু তার আগে ডুণ্ডা ভ্যালির আরও একটু বর্ণনা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। এটা যেমন মানুষের সম্পর্কে, তেমনি সবকিছু সম্পর্কেই সত্য। কেন না, পরে যখন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখি, তখন প্রথম দর্শনে যা খুব ভাল লেগেছিল, তার মধ্যে অনেক খুঁত বেরিয়ে পড়ে। ডুণ্ডা ভ্যালি সম্পর্কে কিন্তু কথাটা একটুও খাটছে না। জায়গাটাকে যে সেই উনিশশো পঁচাত্তর সালে প্রথম দেখেছিলুম, সে তো আগেই বলেছি। সেটা ছিল ঝলক-দর্শনের ব্যাপার। শিয়রে পাহাড়, সামনে বইছে স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথী, গোমুখ থেকে নেমে আসা পার্বত্য যে নদীর জল সমতল-ভূমির গঙ্গার মতো ঘোলাটে গেরুয়া নয়, কাকচক্ষুর মতো নির্মল। তার উপরে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা। সে এক অত্যাশ্চর্য রূপময় দৃশ্য। মনে হচ্ছিল আমি যেন এক অন্য জগতে এসে পৌঁছেছি। পূর্বজন্মের অনেক সুকৃতির ফলেই এমন একটা দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হল।

সেই ভাল লাগার ব্যাপারটা কিন্তু এবারেও কমতি হল না। ডুণ্ডা ভ্যালিতে তখন ছিল মাত্র গুটি পঁচিশ-তিরিশ বাড়ি। সবই বাংলো প্যাটার্নের। দোতলা বাড়ি, সামনে লন। জায়গাটা তখন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল না। এখন পাঁচিল উঠেছে। বাংলোর সংখ্যাও তা প্রায় একশো-দেড়শো হবে। উঁচু ভিতের উপরে হাত-পা-ছড়ানো বাংলো। প্রতিটি বাংলোর সামনে সেই আগের মতোই লন আর বাগান। লনের ঘাস মসৃণভাবে ছাঁটা; বাগান দেখলেও বোঝা যায় যে, যত্নে কোনও ত্রুটি নেই। সেই পাহাড় আর সেই নদীও ইতিমধ্যে হাপিস হয়ে যায়নি! না, সে-বারে যাকে অত ভাল লেগেছিল, এবারেই বা তাকে তবে খারাপ লাগবে কেন। বাংলোর সংখ্যা ইতিমধ্যে বেড়েছে বটে, কিন্তু এই উপত্যকার রূপের বাহার তাতে কিছুমাত্র কমেনি।

আমরা ইটের বাড়ি দেখতে অভ্যস্ত। এখানে সবই পাথরের বাড়ি। রাসেলদের বাড়িটিও তা-ই। একতলার মেঝে মোজেইক-করা । দোতলার মেঝে পালিশ করা কাঠের। সিঁড়িও কাঠের। টালির ছাত। জানলা সবই কাচের। একতলায় বড়-বড় দুটি ঘর। প্রথমটি ড্রয়িংরুম। তারই একদিক থেকে চওড়া কাঠের ধাপের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। একতলার দ্বিতীয় ঘরটি লাইব্রেরি। অধিকাংশ বই-ই হয় পাহাড় কিংবা ভ্রমণ-সংক্রান্ত। নামজাদা শিল্পীদের বেশ কিছু অ্যালবাম ও কিছু রান্নার বইও চোখে পড়ল। তারই মধ্যে হঠাৎ শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের এক-এক সেট রচনাবলি দেখে চমকে যাই। কারণটা পরে বুঝতে পেরেছি। কামিনীর বাবা গুজরাতি হলেও মা ছিলেন বাঙালি। ও দুটি সেট সম্ভবত তাঁরই। একতলার

পিছন দিকে কিচেন ও ডাইনিং রুম।

দোতলায় পাশাপাশি তিনটি বেডরুম। গেস্ট-রুমটি পিছন দিকে। তার সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে দাঁড়ালে পাহাড় চোখে পড়ে। ফাঁকা জায়গাটুকুতে বড়-বড় কয়েকটি টব। তার থেকে গুটিকয় লতানে ফুলগাছ ছাতে উঠে গেছে।

বাড়ির পুবদিকে খাঁজকাটা টালি বসানো ড্রাইভ। ড্রাইভের শেষে গ্যারাজ। গ্যারাজটিও দোতলা। ড্রাইভার দোতলায় থাকে। মূল বাড়ির দোতলায় যে তিনটি বেডরুমের কথা বলেছি, তার শেষেরটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভাদুড়িমশাইকে। আমি আর সদানন্দবাবু গেস্টরুমটির দখল নিয়েছি। ইন্দরলাল জায়গা নিয়েছে গ্যারাজের উপরকার ঘরে। কামিনীদের গাড়ি আছে, সেটা ওঁরা কর্তা-গিন্নি দুজনেই চালান। এখনও ড্রাইভার রাখেননি। রাখলে একতলার ড্রয়িং রুমের একপাশে ইন্দরলালের জন্যে একটা বিছানার ব্যবস্থা করতে হত।

ভাদুড়িমশাই যে এখানে শুধুই বেড়াতে আসেননি, কিছু কাজও যে তাঁর আছে, তা জানি। কিন্তু কাজটা কী তা জানি না।

আর লিখতে পারছি না। রাত প্রায় একটা বাজে। এবারে শুয়ে পড়ব।

।।৩।।

কলকাতার তুলনায় সূর্যাস্ত এখানে অনেক দেরিতে হয়। তেমনি আবার সূর্যদেব এখানে ঘুম থেকে ওঠেনও অনেক দেরিতে। এখন বৈশাখ মাস, সাড়ে চারটেতেই কলকাতার আকাশে এখন প্রথম আলোর চরণধ্বনি শোনা যায়। আজ তেসরা মে, শুক্রবার। কাল রাত্তিরে একটু দেরি করে শুয়েছিলুম বটে, কিন্তু কী জানি কেন, ভোর পাঁচটাতেই আজ আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেটা অবশ্য প্রথম দফার নিদ্রাভঙ্গ। ঘর অন্ধকার, আকাশে আলো ফোটেনি দেখে পাশ ফিরে ফের ঘুমিয়ে পড়ি। দ্বিতীয় দফার নিদ্রাভঙ্গ হতে-হতে আটটা বাজে। সদানন্দবাবু হাঁকডাক শুরু করে না দিলে হয়তো আরও দেরি হত।

চোখ খুলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললুম, "ওরে বাবা, এ যে অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনি কখন উঠলেন?"

"সাতটায়। ভাদুড়িমশাই তারও আগে উঠেছেন। দু'জনে মিলে মাইল তিনেক হেঁটে এলুম।"

"বাইরে গেসলেন নাকি?"

"না। কম্পাউন্ডের মধ্যেই দিব্যি রাস্তা রয়েছে, বাইরে যাবার দরকারই হল না।"

"চা খাওয়া হয়েছে?"

"অনেকক্ষণ।" বলতে-বলতে ভাদুড়িমশাই ঘরে ঢুকলেন। "সাতটায় বেড-টি

দিয়েছিল। আপনারটা ওই টেবিলে ঢাকা দেওয়া রয়েছে, আপনি ঘুমোচ্ছেন দেখে সদানন্দবাবু আর আপনাকে জাগাননি।"

"ঠিক আছে, ওটা খেয়ে নিচ্ছি।" আমি বললুম, "নতুন করে আর চা দিতে বলার দরকার নেই।"

"ওটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, খাওয়া যাবে না।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "বরং এক কাজ করা যাক। চটপট মুখহাত ধুয়ে নিন, তারপর চলুন, বাইরে থেকে সবাই মিলে আর-এক চক্কর ঘুরে আসি। বাইরে মানে কম্পাউন্ডের বাইরে। রাস্তার ধারে এক-আধটা চায়ের দোকান কি আর নেই? সেখানেই চা খেয়ে নেবেন।"

"একটু বাদেই তো ব্রেকফাস্ট দেবে।" আমি বললুম, "বেড-টি মিস করেছি, এবারে ব্রেকফাস্টও মিস করব নাকি?"

"ব্রেকফাস্ট দশটার আগে দেবে না, তার আগেই আমরা ফিরে আসব ...চলুন, চলুন, আর সময় নষ্ট করবেন না।"

তা-ই হল। মুখহাত ধুয়ে, জামাকাপড় পালটে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। ভাদুড়িমশাই আর সদানন্দবাবুর সঙ্গে আমি দোতলা থেকে নীচে নেমে এলুম। কম্পাউন্ডের বাইরে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানও পাওয়া গেল। বিস্বাদ চা। তা-ই কোনও রকমে গলাধঃকরণ করে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা নদীর ধারে গিয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়লুম। চমৎকার বাতাস বইছে। ঘুমের জড়তা নিমেষে কেটে গেল।

কম্পাউন্ড থেকে বেরোবার সময়েই লক্ষ করেছিলুম যে, সান্ত্রি পালটে গেছে। নতুন লোকটিকে জানাতে হল যে, আমরা কে, কার গেস্ট, কত নম্বর বাংলোয় উঠেছি। ব্যাপার দেখে আমি আর সদানন্দবাবু যে একটু হকচকিয়ে গেছি, ভাদুড়িমশাই সেটা ঠিকই বুঝে গেসলেন। কম্পাউন্ডের বাইরে বেরিয়ে এসেই তিনি বলেন, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখানকার সিকিওরিটির ব্যবস্থা খুবই কড়া। ডুগ্গা ভ্যালি থেকে কোনও গাড়ি বেরোলে কিংবা বাইরে থেকে কোনও গাড়ি এখানে ঢুকলে সান্ত্রি তার নম্বর আর সময় লিখে রাখে। ভিতর থেকে কোনও অপরিচিত মানুষ বেরোলেও তাকে জেরা না-করে ছাড়া হয় না।

নদীর ধারে বসে গল্প করতে-করতে কামিনী রাসেল সম্পর্কেও বেশ কিছু খবর জানা গেল। পাঠকদেরও সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি।

কামিনী রাসেলদের পরিবারের সঙ্গে ভাদুড়িমশাইয়ের পরিচয় ও যোগাযোগ বাঙ্গালোরে। এঁদের তিনি প্রায় তিরিশ বছর ধরে চেনেন। কামিনীর বাবা গুজরাতি, মা বাঙালি। বাবা জানকীদাস পটেল ছিলেন আমেদাবাদের বিখ্যাত ব্যবসায়ী। ঠাকুর্দা অশ্বিনীভাই পটেল গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমা পড়ে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হন। শান্তিনিকেতনের খবর তিনি রাখতেন। ছেলের ইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ হবার পরে তাকে তিনি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন। এ হল পঞ্চাশের দশকের গোড়ার

কথা। জানকীদাসের বয়েস তখন বছর কুড়ি। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময়ে তাঁর পরিচয় হয় রঞ্জনার সঙ্গে। দুজনে একই ক্লাসে পড়তেন। পরিচয় থেকে প্রণয়। প্রণয় থেকে পরিণয়। অশ্বিনীভাই বেশিদিন বাঁচেননি। জানকীদাস ও রঞ্জনার বিয়ের বছর পাঁচেক বাদে তিনি মারা যান। যেহেতু বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, তাই পারিবারিক ব্যাবসার পুরো ঝক্কি এসে পড়ে জানকীদাসের ঘাড়ে। এদিকে আমেদাবাদের জলবায়ু রঞ্জনার সহ্য হচ্ছিল না, তিনি মাঝে-মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শে জানকীদাসকে তাই আমেদাবাদ ছাড়তে হয়। অশ্বিনীভাইয়ের জুয়েলারির কারবার এক জ্ঞাতিভাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাঙ্গালোরে চলে আসেন। এ হল ১৯৭৫ সালের কথা। জানকীদাস আর রঞ্জনা, দুজনেরই বয়েস তখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কামিনী তাঁদের একমাত্র সন্তান। তার বয়েস তখন বারো-তেরোর বেশি হবে না।

জিজ্ঞেস করলুম, "তার মানে তো কামিনীর বয়েস এখন চল্লিশ। তা-ই না?"

"তা তো হবেই।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু ওর কথায় একটু পরে আসছি। তার আগে জানকীদাস সম্পর্কে আর দু-একটা কথা বলে নিই। ভদ্রলোকের ব্যাবসা-বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। একটা নতুন জায়গায় এসে রাতারাতি ব্যাবসা জমানো নেহাত চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। বলতে গেলে প্রায় অসম্ভবই। জানকীদাস কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করলেন। ওঁর কারবারের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে পুরো একটা বছরও লাগল না।"

"কীসের কারবার?"

"কারবার সেই একই। জুয়েলারি। তবে শুধু সোনারুপোর নয়। সেই সঙ্গে দামি পাথরের। হিরে-মুক্তো-চুনি-পান্নার। গয়না বানাবার ব্যাপারে বাঙালি কারিগরদের সুখ্যাতির কথা জানতেন তো, তাই কলকাতার বউবাজার-পাড়া চুঁড়ে, অনেক বেশি মাইনের টোপ দিয়ে, বেশ কয়েকজন নামী কারিগরকে বাঙ্গালোরে নিয়ে গেসলেন। তাদের দিয়ে এমন সব ডিজাইনের গয়না বানিয়ে শো-কেস সাজাতে লাগলেন, যা দেখে গোটা কর্ণাটকে একেবারে ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেল। যেমন ডিজাইন, তেমনি পাথর সেটিংয়ের কাজ। কী বলব, জানকীদাসের দোকান থেকে কেনা হয়েছে, দেখতে-দেখতে এটাই যেন বাঙ্গালোর আর মাইসোরের অভিজাত মহিলা-মহলের একটা স্ট্যাটাস-সিম্বল হয়ে দাঁড়ায়।"

একটুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, "শুধু জানকীদাসের ব্যাবসাবুদ্ধির তারিফ করলে অবিশ্যি ভুল হবে। ঝানু কারবারি তো তিনি ছিলেনই, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি না আর-একজনের শিল্পরুচি যুক্ত হত, জানকীদসের জয়েলারি তা হলে অত তাড়াতাড়ি অতটা বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারত না। আরও অনেক সময় লেগে যেত।"

"সেই আর-একজন কে?"

"জানকীদাসের স্ত্রী রঞ্জনা। একে তো শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রী তিনি, তার উপরে অলঙ্করণের ব্যাপারে তাঁর উদ্‌ভাবনী শক্তিও ছিল অসাধারণ। নিজের সম্পর্কে কখনও কিছু বলতে চাইতেন না, কিন্তু আমি জানকীদাসের কাছেই শুনেছি যে, প্রতিটি গয়নার নকশা রঞ্জনা নিজের হাতে এঁকে দেখিয়ে দিতেন। শুধু তা-ই নয়, কারিগরদের ডেকে বুঝিয়ে দিতেন কোন গয়নায় কোন পাথরের সেটিং হলে সবচেয়ে বেশি মানাবে।"

ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে পটেলদের পরিচয় আশি সালে। দোকান থেকে কিছু দামি গয়না চুরি হয়েছিল। থানায় জানালে সেটাই হত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু জানকীদাস যেহেতু তাঁরই এক খানদানি কাস্টমারকে সন্দেহ করছিলেন, তাই লোক-জানাজানি হবার ভয়ে তিনি থানায় না-গিয়ে ভাদুড়িমশাইকে তদন্তের ভার দেন। ভাদুড়িমশাই বুঝতে পারেন, জানকীদাসের সন্দেহ অমূলক নয়। নামজাদা পরিবারের সেই খদ্দেরের উপরে অন্যভাবে চাপ খাটিয়ে তিনি গয়না উদ্ধার করে আনেন।

রঞ্জনা দীর্ঘজীবী ছিলেন না। বিরাশি সালে, মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। স্ত্রীর এই অকালবিয়োগের বেদনা জানকীদাস সহ্য করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যু হয় পঁচাশি সালে।

সদানন্দবাবু মনে-মনে হিসেব কষছিলেন বোধহয়। বললেন, "কামিনীর বয়েস তো তখন খুবই কম হবার কতা। মেরেকেটে বাইশ-তেইশ। ওই বয়েসেই বাপের ব্যাবসার ঝক্কি ওকে সামলাতে হল?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "সামলানো ওর পক্ষে শক্ত হত না। বুদ্ধিমতী মেয়ে, ইতিমধ্যে বি. এসসি. পাসও করে ফেলেছিল। তার উপরে বাপের কাছ থেকে পেয়েছিল গুজরাতি ব্যাবসাবুদ্ধি। বাই দ্য ওয়ে, ওর আঁকা ছবি তো আপনারা দেখেননি?"

বললুম, "আমরা যে-ঘরে আছি, তার দেওয়ালে একটা ল্যান্ডস্কেপ চোখে পড়েছে। ওটা কার আঁকা?"

"কামিনীর।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "অল্প বয়েসের আঁকা। মাইসোরের আর্ট-এগজিবিশনে ওটা গোল্ড মেডেল পেয়েছিল। পরে ওর আঁকার ধাঁচ পালটে যায়। নীচের লাইব্রেরি-রুমে ওর খান তিন-চার অয়েল টাঙানো আছে। পরে দেখে নেবেন।"

"তার মানে মায়ের কাছ থেকেও যে কিছু পায়নি, তা নয়।"

"তা তো বটেই। কিন্তু যা বলছিলুম, বাপের কারবারের ঝক্কি সামলানো ও মেয়ের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত হত না। যদি অবশ্য সেদিকে ওর মন থাকত। সেটাই যে নেই!"

"মন তা হলে কোন দিকে? শুধুই ছবি আঁকার দিকে?"

"তা হলেও তো হত।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "সেক্ষেত্রে ভাবা যেত যে, ঠিক আছে, ছবি আঁকার উপরেই নির্ভর করছে ওর অস্তিত্ব। ও ছবি আঁকতেই জন্মেছে, তা-ই আঁকুক। এমন আর্টিস্ট, এমন স্কাল্‌প্‌টরের কথা তো সবাই জানে, যাকে ধ্রুব বলে বুঝেছে তার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে যাদের আটকায়নি। ভাবতুম যে, কামিনীও সেই গোত্রের। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, সেটাও এক্ষেত্রে আমি ভাবতে পারছি না।"

"কেন পারছেন না?"

"এইজন্যে পারছি না যে, ছবি আঁকা ও ছেড়ে দিয়েছে। আসলে ও খেয়ালি মানুষ। এক-এক সময় এক-একটা খেয়াল ওর মাথায় চাপে। যখন যেটা চাপে, তখন তা-ই নিয়েই ও মশগুল। যখন কলেজে পড়ত, তখন ছবি আঁকতে-আঁকতে ও ছেড়ে দেয়। তারপরে ধরে তবলা। ক্যান ইউ ইমাজিন, অব অল থিংস তবলা! যা কিনা মেয়েরা বাজায় না। সেটা ওকে জানাতে ও কী বলল জানেন? বলল, সেইজন্যেই বাজাব! তারপর তবলা ছেড়ে ধরল সরোদ। সেটাও যথারীতি ছাড়ল! ওই যে বললুম, সবই ওর খেয়াল! তার মধ্যে আবার মাঝে-মাঝেই যেটা চাগাড় দেয়, সেটাকে ঠিক খেয়ালও বলতে পারছি না। আসলে সেটা ঘোর বদখেয়াল!"

"তার মানে?"

ভাদুড়িমশাই তক্ষুনি-তক্ষুনি আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না। খানিকক্ষণ একেবারে নিঃশব্দ বসে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখুন, বয়েসে আমি ওর বাপের চেয়েও কিছু বড়। আমাকে ও আংকল বলে। যতই খেয়ালি হোক, আমি ওকে স্নেহও কিছু কম করি না। ওর বাবা আর মা, দুজনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুজনকেই আমি খুব কাছের থেকে দেখেছি। তাই বলতে পারি যে, অমন সজ্জন একালে খুব কমই চোখে পড়ে। আর সেইজন্যেই আমার মাঝে-মাঝে বড় ধাঁধা লেগে যায়। কিছুতেই বুঝতে পারি না যে, এমন উন্মাদ মেয়ে ওঁদের কী করে হল!"

"অ্যাঁ, উন্মাদ?" সদানন্দবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "তার মানে পাগল?"

"যে-মেয়ে দুমদাম প্রেমে পড়ে, আর প্রেমে পড়লেই যার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, তাকে আপনি পাগল ছাড়া আর কী বলবেন? শুধু প্রেমে পড়া নয়, সেই সঙ্গে বিয়ে করার জন্যে খেপে যাওয়া!"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ। বার্টি রাসেল ওর ক'নম্বর স্বামী জানেন?"

সদানন্দবাবু ঢোক গিলে বললেন, "ক'নম্বর?"

"চার নম্বর।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "এর আগে ও আরও তিন-তিন বার বিয়ে করেছে।"

"বলেন কী?"

"ঠিকই বলছি। কামিনীর প্রথম বিয়ে হয়েছিল এক বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বাউণ্ডুলে আর্টিস্টের সঙ্গে। ছোকরা কাঠকয়লা দিয়ে ছবি আঁকত, তারপর সেই ছবি পার্কের রেলিঙে টাঙিয়ে বিক্রি করত। কামিনীর তখনও বিয়ের বয়েস হয়নি, বয়েস ভাঁড়িয়ে বিয়ে করে বরকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি বাড়িতে এসে হাজির হয়। মুখে তিন দিনের না-কামানো দাড়ি, পরনে তাপ্পি-মারা জিনসের প্যান্টালুন আর ময়লা শার্ট—জামাতা-বাবাজীবনকে দেখে রঞ্জনা শয্যা নেন। তারপরে আর বেশিদিন তিনি বাঁচেননি। সে বিয়ে বছর খানেক টিকেছিল। কামিনী নিজেই একদিন তার নতুন প্রেমিককে ডেকে এনে আর্টিস্ট-বেচারাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেয়।"

"নতুন প্রেমিকটি কী করত?"

"ফিল্মে ফাইটারের চাকরি করত। দেখতে নেহাত খারাপ ছিল না, কিন্তু বিদ্যে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় বিয়েটাও বেশি দিন টেকেনি।"

"আর থার্ড ম্যারেজ?"

"সেটা যে খুব খারাপ হয়েছিল, এমনিতে তা বলা যাচ্ছে না। সেও প্রেম করে বিয়ে। প্রেমিকটি অধ্যাপক, বাঙ্গালোরেরই একটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কমার্স কলেজে অ্যাকাউন্টেন্সি পড়াত। বয়েস অবশ্য একটু বেশি, এই ধরুন চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, তা ওই বয়েসে তো অনেকেই আজকাল বিয়ে করে। ...কী মশাই করে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা করে বই কী!" সদানন্দবাবু বললেন, "তা এটাও টিকল না কেন?"

"কী করে টিকবে?" ভাদুড়িমশাই তেতো হাসলেন। "মাসখানেক যেতে-না-যেতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। জানা গেল যে, প্রেমিক পুরুষটি ব্যাচেলার নয়, তার বউ-বাচ্চা রয়েছে, বউ থাকত গ্রামের বাড়িতে, খবর পেয়ে সে শহরে এসে মামলা ঠুকে দিয়েছে। বিগ্যামির চার্জ। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বাবাজীবনের জেল হয়ে যায়।"

সদানন্দবাবু বললেন, "উরেব্বাবা!"

আমি বললুম, "তারপরে এই ফোর্থ ম্যারেজ? উইথ বার্টি রাসেল?"

"হ্যাঁ।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "এটা যে কদ্দিন টিকবে, কে জানে।"

"এতসব হুজ্জুতের মধ্যে কারবার দেখার সময় পায়?"

"কারবার কি ওর হাতে আছে যে দেখবে?"

"তার মানে?"

"মানে খুবই সহজ।" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "রঞ্জনার মৃত্যুর পরেও বছর কয়েক বেঁচে ছিলেন জানকীদাস। কামিনীর প্রথম বিয়ের ধাক্কাটা তিনি সামলাতে পেরেছিলেন, কিন্তু ফিল্মি ফাইটারের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ের ধাক্কাটা আর পারলেন না। তা ছাড়া তিনি স্পষ্ট বুঝে গেসলেন যে, লেখাপড়ায় মেয়েটা চৌখস

ঠিকই, সেই সঙ্গে মায়ের শিল্পরুচির সঙ্গে বাপের ক্ষুরধার বুদ্ধিও সে পেয়েছে বটে, কিন্তু এতসব গুণের কোনওটাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগবে না। তার কারণ, ওর মাথায় রয়েছে পাগলামির বীজ!"

আবার একটুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, "এটা বোঝার পরে জানকীদাস আর সময় নষ্ট করেননি, জুয়েলারির ব্যাবসাটা তিনি বিক্রি করে দেন। বাড়িটা লিখে দিলেন মেয়ের নামে। রঞ্জনার যা কিছু গয়নাগাটি ছিল, সবই মেয়ের হাতে তুলে দিলেন। আর ব্যাবসা বিক্রি করে যা পাওয়া গিয়েছিল, তার থেকে কামিনীর নামে ব্যাঙ্কে একটা পঁচিশ লাখ টাকার ফিক্সড অ্যাকাউন্ট খুলে বাদবাকি টাকা দান করলেন রামকৃষ্ণ মিশনকে। ...এ হল ১৯৮৫ সালের কথা। জানকীদাস সেই বছরই মারা যান।"

বললুম, "আপনার তো খুবই বন্ধু ছিলেন, মৃত্যুর আগে আপনাকে কিছু বলে যাননি?"

"একটাই কথা বলেছিলেন। মেয়েটা তো ঘোর উন্মাদ, বিপদে পড়লে ওকে যেন আমি দেখি।"

"বাপের মৃত্যুর পরে শোধরায়নি?"

"কোথায় আর শোধরাল! জানকীদাসের মৃত্যুর পরে দিন কয়েক একটু গুম মেরে ছিল। তারপর বছর দুয়েক বাদে বিয়ে করল ওই অধ্যাপককে। অ্যানাদার ডিজাস্টার! তা সে-বিয়েও তো বিগ্যামির চার্জে আদালতের নাকচ রায়ে হয়ে গেল!"

"তারপর?"

"তারপর পাঁচ বছর বাদে এই বিয়ে! এটা হল নাইন্টিটুতে। বার্টিরও আগে একটা বিয়ে হয়েছিল, সেটা টেকেনি। আর্মির ডাক্তার, বয়েস এখন বছর পঞ্চাশ, আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে এখানে আছে।"

"এ-বিয়েও প্রেম করে হয়েছিল?"

"না। খবরের কাগজের ম্যাট্রিমনিয়াল কলামের বিজ্ঞাপন দেখে।"

"এটা টিকবে তো?"

ভাদুড়িমশাই হাসলেন। "দশটা বছর যখন টিকে গেছে, তখন বোধহয় চট করে আর ভাঙবে না। ...ওহো একটা মজার কথাই বলা হয়নি। এমনিতে পাগলি হলে কী হয়, মেয়েটার ব্যাবসাবুদ্ধি প্রখর কিন্তু। বাপের কাছ থেকে কিছু গয়নাগাটি, একটা বাড়ি আর ওই পঁচিশ লাখ টাকা পেয়েছিল, সে তো জানেন। তা ওর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, একবার ভাবুন দেখি! সেভারেল ক্রোর্‌স!"

"বটে?"

"হ্যাঁ, স্রেফ শেয়ার কেনা-বেচা করে। ভাবা যায়?"

শুনলুম। শুনে বার কয়েক ঢোক গিললুম। তারপর বললুম, "আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। আপনি এখানে যে কাজে এসেছেন, মনে হচ্ছে সেটা কামিনীরই কাজ, ওই আপনাকে এখানে ডেকে এনেছে। তা কাজটা কী?"

"সেই একই কাজ।" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "ওর বাপের দোকানের গয়নাগাটি উদ্ধার করে দিয়েছিলুম, এবারে ওর একটা দামি গয়না উদ্ধার করে দিতে হবে।"

সদানন্দবাবু বললেন, "আবার সেই বাংলা ক্রসওয়ার্ড! সেখানেও শব্দটা ছিল গয়নাগাটি।"

আমার মনে পড়ে গেল ইংরেজি ওআর্ড-জাম্বলের কথা। সেখানে শব্দটা ছিল মার্ডারার। কিন্তু সেটা আর বললুম না।

॥ ৪ ॥

নদীর ধার থেকে বাংলোয় ফিরতে-ফিরতে প্রায় দশটাই বেজে যায়। ভাদুড়িমশাইয়ের পিছনে-পিছনে একতলার ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখি, কামিনী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলে?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ভোরবেলায় উঠে সদানন্দবাবুকে নিয়ে হাঁটতে গিয়েছিলুম। কিরণবাবু তো তোরই মতো ঘুমকাতুরে। আটটায় ফিরে এসে ওঁর ঘুম ভাঙাই। তারপর ওঁকে নিয়ে নদীর ধারে গেসলুম। চমৎকার জায়গা, বাতাসটাও ইনভিগরেটিং, উঠতে ইচ্ছে করছিল না। ...তা বার্টিকে দেখছি না যে? সে কোথায়?"

"ফেরেনি।" কামিনী বলল, "একটু আগে ফোন করেছিল। বলল, একটা কেস একটু গোলমেলে, তাকে ফেলে রেখে ফিরতে পারছে না। তবে লাঞ্চের আগে ফিরবে।"

"ব্রেকফাস্ট কোথায় করবে? আর তা ছাড়া বেরিয়ে গেছে তো কাল বিকেল হওয়ার আগেই। তা হলে রাত্তিরের খাওয়াটাই বা কোথায় গেল?"

"সঙ্গে কিছু স্যান্ডুইচ দিয়ে দিয়েছিলুম। সেই সঙ্গে এক ফ্লাস্ক কফি। ডিনার যদি করে থাকে, তো তা-ই দিয়েই করেছে!"

"আর ব্রেকফাস্ট?"

কামিনী হেসে বলল, "আজ আর সেটা ওর কপালে নেই। তবে ও নিয়ে তোমরা ভেবো না তো! ডাক্তারদের অমন হয়েই থাকে।"

কাজের লোকটি প্লেটভর্তি টোস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর দুটো-দুটো করে টোস্ট আমাদের প্লেটে নামিয়ে দিয়ে বলল, "ডিম কীরকম হবে?"

ভাদুড়িমশাই কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই কীরকম খাস?"

"বাবা তো ভেজিটেরিয়ান ছিলেন," কামিনী বলল, "বাড়িতে তাই মাছ-মাংস আর ডিম কখনও ঢুকতই না। ওসব জিনিস মা'ও ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমি বাঙ্গালোরে থাকতে খাইনি। তবে এখন খাই।"

"তুই যে-রকম পছন্দ করিস, আমাদের জন্যেও তা-ই বলে দে। আমাদের সব রকমই পছন্দ।"

"ঠিক আছে।" কাজের লোকটির দিকে তাকিয়ে কামিনী বলল, "প্লেন অমলেট। তবে হ্যাঁ, পেঁয়াজ দিয়ো না, আর কুচোনো কাঁচালঙ্কা একটু বেশি করে দিয়ো।"

ডাইনিং রুমের পাশেই কিচেন। মালকিনের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে কাজের লোকটি কিচেনে চলে গেল। ভাদুড়িমশাই বললেন, "তোর গয়নাটার কথা কাল শোনাই হল না। আজ শুনব।....মানে গয়নাটা যে চুরি হয়েছে...."

"ওটা তো চুরি হয়নি।.....চুরির কথা আবার কখন বললুম?"

"তা হলে?" ভাদুড়িমশাইকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল। "তা হলে তুই কী বলেছিলি?"

"এখুনি বলব? ইন ডিটেলস?"

"না, থাক্।" এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "চা খেয়ে উপরে যাই। তখন শুনব।"

অমলেট এসে গিয়েছিল। টোস্ট অমলেট আর চা খেয়ে আমরা উপরে উঠে এলুম। উপরে, সামনের দিকে বিশাল বারান্দা। মূল বাড়ির কাঠামো থেকে সেটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। একটি কাজের লোক এসে সেখানে একটা গোল টেবিল ঘিরে ছোট-ছোট চারটে ক্যানভাসের চেয়ার রেখে গেল। আমরা তাতে আরাম করে বসার পরে ভাদুড়িমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তোর বাড়িতে কাজের লোক মোট ক'জন রে?"

কামিনী বলল, "পাঁচজন। একজন কুক, তাকে তোমরা একতলায় দেখেছ। বাকি চারজন অন্য সব কাজ করে।"

"অন্য সব কাজ মানে কী কাজ?"

"একটি মেয়ে আছে, সে বাসন-কোসন ধোয় আর জামাকাপড় কাচে। বাদবাকি তিনজন পুরুষ। তাদের মধ্যে একজন যেমন দোতলা ঝাঁটপাট দেয়, মেঝে মোছে, ডাস্টিং করে সব সাফসুতরো রাখে, আর একজনও তেমনি সেই একই কাজ করে একতলায়।"

"এখনও একজনের কথা বলিসনি। সে কী করে?"

"বাগানের কাজ করে। তা ছাড়া গাড়ি ধোয়।"

"এরা কি রাত্তিরেও এখানে মানে এই বাড়িতে থাকে?"

"না।" কামিনী বলল, "রাত্তিরে ওরা কেউই এখানে থাকে না। সকালে আসে,

যে যার নিজের কাজ করে, তারপর বিকেল হবার আগেই বাড়ি চলে যায়।"

"বাড়ি কোথায়?"

"পাহাড়ের বস্তিতে।... যাচ্চলে, তুমি তো গয়নার কথা কিছু শুনছ না!"

"শুনব, অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "এক্ষুনি গয়নার কথায় আসছি। তার আগে আর দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই।"

"বেশ, করো।"

"ওরা যে পাহাড়ের বস্তিতে থাকে, তা তো শুনলুম। তা সবাই কি একই বস্তিতে থাকে?"

"না, আলাদা-আলাদা বস্তিতে।"

"সেগুলির ডিসট্যান্স এখান থেকে কতটা?"

"সবই দু'তিন মাইলের মধ্যে।" কামিনী বলল, "তবে বোঝোই তো, পাহাড়ি জায়গা, সূর্য ডুবলেই গোটা এলাকা অন্ধকার। তা ছাড়া পাহাড়ে এখন বুনো জন্তু-জানোয়ার অনেক কমে গেছে ঠিকই, তবে একেবারেই যে নেই, তা নয়। সাপ আর বিছের ভয়ও আছে। ওরা তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়।"

"চাইতেই পারে," সদানন্দবাবু বললেন, "জন্তু-জানোয়ার আচে, সাপখোপ আচে, তা হলে আর চাইবে না কেন?....আচ্ছা, একটা কতা বলুন তো, ভুতপেত্নির ভয় নেই তো?"

কামিনী হেসে বলল, "তাও আছে বই কী!.... মানে ওদের কথা বলছি, ভীষণ ভূতের ভয়! বিশেষ করে ওই যে মেয়েটার কথা বললুম, লছমি....বাসন মাজা আর কাপড়চোপর কাচার কাজ করে...তার যে কী ভীষণ ভূতের ভয়, সে আর কী বলব!"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওরা তো বিকেল না হতেই বাড়ি চলে যায়। বাটিও কি আর নিত্যি তিরিশ দিন বাড়িতে থাকে? ডাক্তার মানুষ, রাত্তিরের দিকে কল এলে তাকেও নিশ্চয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়, রাত্তিরে আর বাড়ি ফিরতে পারে না, এই যেমন কাল রাত্তিরে ফেরেনি। তখন তোর ভয় করে না?"

"কীসের ভয়?" কামিনী এবারে হো-হো করে হেসে উঠল। "ভূতের? ধুত্, আমি কি ভূতে বিশ্বাস করি নাকি?"

"ভূত না-ই থাক, চোর-ডাকাত তো আছে। নাকি তাও নেই?"

"তা থাকবে না কেন! তবে ডুঙ্গা ভ্যালির এই হাউসিং কমপ্লেক্সে চোর-ডাকাতের ভয়ও নেই, আঙ্কল। এখানকার পাহারা ভীষণ কড়া।"

"সেটা আমরা এরই মধ্যে বুঝেছি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তবু এত বড় একটা বাড়িতে একা থাকতে একটু অস্বস্তি হওয়াই তো স্বাভাবিক। কাজের মেয়েটাকে তো মাঝেমধ্যে থাকতে বলতে পারিস।"

"ওর নিজের সংসার আছে না? আর তা ছাড়া লছমি থাকলেই বা লাভ

কী? বরং অর্জুন....আই মিন আমাদের কুক.... ওই যে লোকটি তোমাদের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করল... সে থাকলে লাভ হত। তা হলে আর রাত্তিরের খাবারটা নিত্যি-নিত্যি আমাকে গরম করে নিতে হত না।"

"অর্জুনকে তো তোদের বাঙ্গালোরের বাড়িতেও দেখেছি।"

"দেখতেই পারো, ও বাবার আমলের লোক। বাঙ্গালোরে তো তুমি মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে আসতে। মুখটা মনে রেখেছ দেখছি।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "আমি সব কিছুই মনে রাখি। কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। অর্জুন তা হলে বাঙ্গালোরের লোক নয়?"

"না, বাঙ্গালোরে গিয়েছিল কাজের ধান্দায়। আসলে ও গাড়োয়ালি, বার্টির সঙ্গে আমার বিয়ে হবার পর খুশি হয়েই আমার সঙ্গে এখানে চলে এসেছে।"

"কিন্তু তোরা তো প্রথম একটা বছর উত্তরকাশীতে ছিলি। অথচ অর্জুনের বাড়ি এখানকার পাহাড়ি বস্তিতে। তখন তা হলে রোজ-রোজ বাড়িতে ফিরতে পারত না।"

"না।" কামিনী বলল, "তখন সপ্তাহে একদিন...রবিবার বাড়ি আসত, আবার সোমবার সকালে বাস ধরে চলে যেত উত্তরকাশী। পরে ওই আমাদের খবর দেয় যে, ভুগ্গা ভ্যালির কলোনিতে জমি পাওয়া যাচ্ছে। শুনে আমরা এখানকার কলোনির কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জমি কিনে বাড়ি বানাই। বার্টি আর্মির ডাক্তার ছিল, তাই জমি পেতে অসুবিধে হয়নি।"

"তাতে যেমন তোদের, তেমন অর্জুনেরও লাভ হল, কী বলিস?"

"তা তো হলই। ও এখন রোজই বাড়ি ফিরতে পারে।"

"এরা সবাই....মানে তোদের এই বাড়িতে যারা কাজ করে...সবাই বিশ্বাসযোগ্য লোক?"

"অবিশ্বাস করার মতন তো কখনও কিছু দেখিনি।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। একটা সিগারেট ধরালেন। দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটাকে শূন্যে বার দুই সজোরে নেড়ে নেভালেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, "যদি কিছু মনে না করিস, তো একটা প্রশ্ন করব।"

কামিনী হেসে বলল, "বেশ তো, করো।"

"বার্টির রোজগারপত্তর কেমন?"

"ভালই।" কামিনী বলল, "আর্মি থেকে আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পেনশনটা নেহাত খারাপ পায় না। তা ছাড়া ডাক্তারি তো আর ছেড়ে দেয়নি।"

"তাতেও কিছু আসে, কেমন?"

"যতটা আসতে পারত, তার সিকির সিকিও আসে না।"

"কেন?"

"ওর রুগি দেখার ফি কত জানো?"

"কত?"

"পার ভিজিট দু'টাকা। বলে, এখানকার লোকজন বড় গরিব, এর বেশি দেবে কোত্থেকে?"

"তা হলে ওই দু'টাকাই বা নেয় কেন?"

"ওর তরফে তারও একটা জবাব আছে।" কামিনী হাসল। "ও বলে যে, একেবারে ফ্রিতে রুগি দেখলে ডাক্তার সম্পর্কে রুগির আস্থা জন্মায় না।"

"ঠিকই বলে।"

"তা ছাড়া, রোজগারের কথা উঠছেই বা কেন?" কামিনী বলল, "বার্টির টাকা আর আমার টাকা কি আলাদা? ও যা-ই পেনশন পাক, শেয়ার কেনা-বেচার ব্যাবসায় আমি কি কম রোজগার করি নাকি?"

ভাদুড়িমশাইয়ের চোখে কৌতুক ঝিলিক দিল। বললেন, "কত রোজগার করিস?"

"তার কি কিছু ঠিক আছে নাকি? সবই তো বাজার ওঠা-পড়ার ব্যাপার। পড়তির বাজারে যা কিনি, সেটা ধরে রেখে দেখতে থাকি, বাজার উঠছে কি না। খানিকটা ওঠার পরে বেচে দিই। গত মাসে পাঁচ লাখ লাভ হয়েছিল। এ-মাসে কিনেছি, কিন্তু বাজার ভাল নয়, তাই এখুনি বিক্রি করছি না, আরও কিছু দিন দেখব।"

"ব্যাবসা শুরু করার সময় তো বেশ-কিছু টাকা প্রথমে ইনভেস্ট করতে হয়েছিল। কত টাকার শেয়ার কিনেছিলি?"

"পঁচিশ লাখ টাকার।"

"সে-টাকা পেলি কোথায়?"

"বা রে!" কামিনী হেসে বলল, "বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দিয়েছিল না? সে-টাকা পুরো তুলে নিয়ে শেয়ারে খাটিয়ে দিই।"

"যাক, তা হলে বাঙ্গালোরের বাড়িটা বেচিসনি?"

"আরে না না, বাড়ি বিক্রি করিনি, ভাড়াটেও বসাইনি।"

"আর তোর মায়ের যে গয়নাগাটি তুই পেয়েছিস, সেগুলির কী হল?"

"তারও একটাও বেচিনি।" কথাটা বলেই তীব্র চোখে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকাল কামিনী। বলল, "কী ব্যাপার বলো তো? টাকা, বাড়ি, গয়না—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এত সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? রাত্তিরে ঘুম ঠিকমতো হয়েছিল?"

"তা হয়েছিল। সকাল-সকাল ঘুমিয়েছি, উঠেও পড়েছি ভোর না হতেই। তারপরে তো দু'দফা ঘুরেও এলুম।..... তা যে-কথা হচ্ছিল..."

ভাদুড়িমশাইকে কথাটা শেষ করতে দিল না কামিনী। মাঝপথে বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি যে ঘনঘন চা খাও, তা ভুলেই গেসলুম। আর-এক রাউন্ড চা দিতে বলি?"

"তা বল্।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "শীতের জায়গা, চা ছাড়া চলে?"

কামিনী আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাদের জন্যে কী বলব। চা না কফি?"

সদানন্দবাবু বললেন, "চা। তবে শুধু লিকার। আমি আর কিরণবাবু দুধ-চিনি মিশিয়ে চা খাই না। আর হ্যাঁ, লিকারটা খুব হাল্কা হলে ভাল হয়।"

"তা-ই হবে।" কামিনী বলল, "আপনারা বসুন, আমি চায়ের কথা বলে আসছি।"

ফিরে এল মিনিট পাঁচেক বাদে। এসে তার চেয়ারে বসে পড়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "খালি চারু-আঙ্কলের সঙ্গে কথা বলছি, আপনাদের সঙ্গে তো কথাই হচ্ছে না। এর আগে আপনারা এদিকে কখনও এসেছেন?"

বললুম, "আমি এসেছি, তবে সদানন্দবাবু আসেননি।"

সদানন্দবাবু বললেন, "আমি একবার এয়াঁদের সঙ্গে মুসুরি এসেছিলুম, তখন ডেরাডুন, হরিদ্বার আর হৃষীকেশটাও দেখা হয়ে গেসল। তবে কিনা আমার দৌড় ওই পর্যন্ত, হৃষীকেশ ছাড়িয়ে ইদিকে কখনও আসা হয়নি।"

আমরা দেরাদুন বলি, সদানন্দবাবু বলেন ডেরাডুন। আমরা দেড় টাকা বললেও সদানন্দবাবু বলেন ডেড় টাকা। এটা বোধহয় নর্থ ক্যালকাটার উচ্চারণ।

কামিনী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি এদিকে এসেছিলেন কেন? জাস্ট বেড়াতে?"

বললুম, "ঠিক তা-ই। আসলে যমুনোত্রী গেসলুম। ফিরতি পথে মনে হল, এসেই যখন পড়েছি, তখন গঙ্গোত্রীও দেখে যাই। নয়তো আবার কবে আসা হবে কে জানে। তো গঙ্গোত্রী গেসলুম এই পথেই। অনেকদিন আগের কথা, তখন এই ডুণ্ডা ভ্যালিতে এত ঘরবাড়ি দেখিনি।"

"তখন এত ঘরবাড়ি ছিলই না, তা হলে আর দেখবেন কোত্থেকে!"

চা এসে গেল। যে লোকটি আমাদের সামনের গোল টেবিলে চায়ের ট্রে নামিয়ে রাখল, একটু আগে একতলার ডাইনিং রুমে তাকে আমরা দেখেছি। এ-বাড়ির কুক, অর্জুন। লোকটির বয়েস মনে হল বছর ষাটেক। তবে একমাথা পাকা চুল ছাড়া শরীরে কোথাও বয়েসের ছাপ তত স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। চামড়া কুঁচকোয়নি, হাঁটাচলার ভঙ্গিটিও সতেজ।

কামিনী বলল, "এদের চিনতে পেরেছ অর্জুন?"

"ভাদুড়িসাবকে চিনেছি।" অর্জুন মৃদু হেসে বলল, "বাঙ্গালোরে বড়বাবুর কাছে আসতেন। তবে এঁদের চিনলাম না।"

"এঁরা আঙ্কলের বন্ধু, বেড়াতে এসেছেন, দিন কয়েক থাকবেন।.... তা তুমি কেন চা নিয়ে এলে, যোগীশ্বরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হত।"

"ওর ঘর ঝাঁট দেওয়া আর মোছার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে। বসে ছিল, তাই বাটনা বাটতে লাগিয়ে দিয়ে চা'টা নিজেই নিয়ে এলাম। এঁরা লাঞ্চে কী খাবেন?"

"তোমরা যা খাও, তা-ই খাব।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "বেশি কিছু করতে যেয়ো না।"

"আপনারা বাংগালি, আপনাদের মাছ চাই।" অর্জুন বলল, "আজ কিন্তু মাছ পাইনি। মিট আছে। কী আইটেম করব?"

কামিনী বলল, "ডাল, ভাত, সবজি আর মিট-কারি।....ও হ্যাঁ, খানকয় চাপাটিও কোরো। ডাক্তারবাবু তো ভাত খান না, তাঁর চাপাটি চাই।"

অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কামিনী টি পট থেকে পেয়ালায়-পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বলল, "লাঞ্চ একটা থেকে দুটোর মধ্যে। তারপর একটু বিশ্রাম করে নিয়ো, আঙ্কল। বিকেলে কোথাও বেড়াতে যাবে?"

ভাদুড়িমশাই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কথা ঘোরাসনে মিনি। যতবার আমি গয়নাগাটির কথা তুলছি, ততবারই তুই অন্য কথায় চলে যাচ্ছিস। কী ভাবিস তুই বল্ তো? আমার মেমারি একদম লোপ পেয়ে গেছে?"

"এ-কথা কেন বলছ?"

"এইজন্যে বলছি যে, আমার স্পষ্ট মনে আছে, কলকাতায় ফোন করে তুই আমাকে জানিয়েছিলি যে, তোর একটা দামি গয়না চুরি হয়েছে। অথচ আজ বললি, 'ওটা তো চুরি হয়নি!' কী ব্যাপার বল্ তো? চুরি যদি না-ই হবে তো ফোনে আমাকে চুরির কথা বলেছিলি কেন?"

তক্ষুনি-তক্ষুনি প্রশ্নটার কোনও জবাব দিল না কামিনী। মুখ নিচু করে চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভাদুড়িমশাই ফের সেই একই প্রশ্ন করলেন। "কেন বলেছিলি?"

মুখ না তুলেই স্খলিত গলায় কামিনী বলল, "বলতে হয়েছিল।"

"তার মানে?"

এতক্ষণে মুখ তুলল কামিনী। বলল, "না-বলে উপায় ছিল না।"

"তারই বা কী মানে?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "একটা জিনিস চুরি হয়নি। অথচ সেটা চুরি হয়েছে না-বলে তোর উপায় ছিল না, এর কোনও মানে হয়?"

"হয়।" অস্ফুট গলায় কামিনী বলল, "তোমাকে যখন ফোন করি, বার্টি তখন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল যে! তাই গয়নার ব্যাপারে তাকে যা বলেছিলুম,

তোমাকেও তা-ই বলতে হল।"

"ওকেই বা তোর মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল কেন?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "না, না, অস্বস্তির কিছু নেই। আমাকে যা বলা যায়, তা এঁদের দু'জনের সামনেও স্বচ্ছন্দে বলতে পারিস। সব কথা খুলে বল্, কিচ্ছু লুকোস না।"

॥ ৫ ॥

গয়নাটা যদি চুরি না-ও হয়ে থাকে, তবু মূল ব্যাপারটা যে একটা দামি গয়না নিয়েই, সেটা আঁচ করতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। একইসঙ্গে আশা করছিলুম, সেটা নিয়ে যে-সমস্যাই দেখা দিয়ে থাকুক, এবারে তা জানা যাবে। কামিনী কিন্তু তক্ষুনি-তক্ষুনি গয়নার প্রসঙ্গে ঢুকল না। বলল, "তোমাকে কবে ফোন করেছিলুম?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ছাব্বিশে এপ্রিল। দ্যাট ওয়জ আ ফ্রাইডে।"

"তোমরা কাল এসেছ। কাল ছিল দোসরা মে।" অনুচ্চ গলায় আঙুলের কর গুনতে-গুনতে কামিনী বলল, "সাতাশ....আঠাশ...ঊনত্রিশ...তিরিশ....এক.....দুই। তার মানে আমার ফোন পাবার ছ'দিন বাদে এলে। জানি না এর মধ্যে কিছু হয়ে গেল কি না।"

"কী হবে?"

এটার কোনও জবাব দিল না কামিনী। বলল, "আজও তো শুক্রবার। ঠিক আছে, আজ তার আসার দিন হলেও সে আসবে না।"

"কার আসার দিন?"

"লিজার।"

"সে কে?"

"লিজা ওয়েভার্লি। নার্স কাম ম্যাসিওর। উত্তরকাশীর ডিসট্রিক্ট হসপিটালে কাজ করে। সোম, বুধ আর শুক্রবার তার নাইট-ডিউটি থাকে। তাই ওই তিনদিন দুপুরে এসে আমাকে মাসাজ করিয়ে যায়। তবে আজ শুক্রবার হলেও সে আসবে না। কী একটা কাজে আটকে গেছে। বার্টিও বাড়িতে নেই। সো উই ক্যান টক ফ্রিলি।"

ভাদুড়িমশাইয়ের ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, "যখন কাজের লোকেদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম, তখন কই তার কথা তো আমাকে বলিসনি?"

"লিজা কি এ-বাড়ির ডোমেস্টিক স্টাফের মধ্যে পড়ে যে, তার কথা বলব? আর তা ছাড়া, ওর কথা বলতে হলে তো আর-একজনের কথাও বলতে হয়।"

"সেই আর-একজনই বা কে?"

"দুখন।"

"সে কী করে?"

"বার্টির অ্যাসিস্ট্যান্ট। ডাক্তারবাবুর ব্যাগ বয়, সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরে। পাস-করা কম্পাউন্ডার নয়, তবে বার্টি ওকে ওষুধপত্তরের ব্যাপারটা খানিক-খানিক শিখিয়ে নিয়েছে।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "লিজা থাকে কোথায়?"

"এখান থেকে উত্তরকাশীর পথে যদি যাও তো মাইল তিনেক গেলেই বাঁ দিকে পড়বে নতুন একটা সরকারি হাউসিং কমপ্লেক্স। বাইরের ফলকে সেটা লেখাই আছে। কমপ্লেক্সে ঢুকে বাঁ দিকের থার্ড বাড়িটার দোতলায় থাকে।"

"বিবাহিত?"

"হ্যাঁ, তবে বছর দুয়েক আগে স্বামী মারা গেছেন।"

"বয়েস কত?"

"বছর তিরিশ-বত্রিশ।"

"বাড়িতে আর কে থাকে?"

"লিজার মা আর ছেলে। বাচ্চা ছেলে, বয়েস বছর তিনেক।"

ভাদুড়িমশাই মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "দুখন?"

"দুখন কী?"

"লিজার কথা তো শুনলুম, দুখন থাকে কোথায়?"

"সে থাকে এ-বাড়ির অন্য সব কাজের লোক যেখানে থাকে, সেই-খানেই।"

"তার মানে পাহাড়ি বস্তিতে?"

"হ্যাঁ। তবে ওদের তুলনায় অনেক কাছে। আমাদের বাড়ির পিছনেই তো পাহাড়। খানিকটা উঠে গেলেই ওর বাড়ি।"

"ঠিক আছে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "এবারে কাজের কথায় আয়। গয়নাটার কী হল? যা বুঝতে পারছি, ওটা চুরি হয়নি।"

"না, চুরি হয়নি।"

"অথচ বার্টিকে ভুল বোঝাবার জন্যে তোকে চুরির কথা বলতে হয়েছিল, কেমন?"

"হ্যাঁ।"

"ভুল বোঝাবার দরকার হল কেন? ওটা কাউকে দান করেছিস?....মানে এমন কাউকে, বার্টি যাকে পছন্দ করে না?"

সেলফোন বেজে উঠল। হাউসকোটের পকেট থেকে যন্ত্রটা বার করে কানে লাগিয়ে কামিনী বলল, "হ্যালো....সে কী, লাঞ্চে আসতে পারছ না? তা হলে কখন ফিরবে?....বিকেলের আগে নয়?....দেখো বাবু, বাইরে যা-তা খেয়ে একটা

অসুখ বাধিয়ে বোসো না।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁরা ভাল আছেন, আঙ্কলের সঙ্গে কথা বলবে?...ঠিক আছে, একটু তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা কোরো। বাই!"

যন্ত্রটা ফের পকেটে পুরে, ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে কামিনী বলল, "বোঝো ব্যাপার! কাল বিকেলের আগে বেরিয়ে গেছে, আজ বিকেলের আগে ফিরবে না! কোনও মানে হয়?"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "এমন তো হতেই পারে। ডাক্তার মানুষ, রুগিকে ফেলে আসতে পারছে না। নাথিং আনইউজুয়াল।"

"ডাক্তার বিয়ে করে ভুল করেছি!"

"কী যে বলিস! বার্টিকে তো বাঙ্গালোরে দেখেছি...অ্যান এক্সেলেন্ট ইয়াংম্যান!"

"এখন আর খুব ইয়াং নেই!"। কামিনী হেসে বলল, "গত মাসে পঞ্চাশ পেরল! টাক পড়ে গেছে! দেখলে চিনতে পারবে না!"

"বিকেলে তো আসছে, তখনই বোঝা যাবে, চিনতে পারি কি না। কিন্তু সে-কথা থাক, গয়নাটার কথা শুনি। ওটা দান করেছিস কাউকে?...আচ্ছা, সে-কথাও পরে শুনব। আগে বল্, ওটার দাম কত।"

"দাম কত, তা জানি না।" কামিনী শুকনো গলায় বলল, "তবে গয়নাটা তুমি হয়তো দেখে থাকবে।"

"কোন্ গয়নাটার কথা বলছিস?"

"মা যেটা এমনিতে না পরলেও বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান হলে পরতেন। একটা নেকলেস।"

"তোর মায়ের নেকলেস তো কম ছিল না, তার মধ্যে কোনটা?"

"যেটা আসলে ঠাকুমা'র নেকলেস, মা'কে দিয়েছিলেন।"

শুনে ভাদুড়িমশাই যেভাবে মুখ দিয়ে বাতাস টানলেন, তার শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল। তাঁর চোখও দেখলুম হঠাৎ ভীষণ সরু হয়ে এসেছে। খানিকক্ষণ তিনি কোনও কথাই বলতে পারলেন না। মনে হল তাঁর বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েছে। খানিক বাদে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, "তোর ঠাকুমা যেটা তোর মা'কে দিয়েছিলেন? ঠিক বলছিস?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে সেই হিরের লেকলেসটা?"

"হ্যাঁ, লকেটে তিনটে হিরে সেট করা। মাঝখানেরটা বেশ বড়।"

ভাদুড়িমশাই আবার কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কামিনীর দিকে। তারপর বললেন, "ওটার দাম জানিস মিনি?"

"কী করে জানব?" নির্বিকার গলায় কামিনী বলল, "আমি শেয়ার কেনাবেচার ব্যাবসা করি, কোন্ শেয়ারের এখন কী দাম জিজ্ঞেস করো, আমি বলে দেব। গয়নাগাটির দাম আমি জানি না।"

"আমি জানি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তোর বাবা বলেছিলেন, শুধু ওই হিরে তিনটের দামই আড়াই লাখ। তা সে তো আজকের কথা নয়। এখনকার বাজারে কোন্ না লাখ পাঁচেক হবে। তা সেই পাঁচ লাখ টাকার নেকলেস তুই কী করেছিস? যদি না সেটা চুরি হয়ে থাকে তো দান করেছিস কাউকে?"

"না।"

"হারিয়ে ফেলেছিস?"

"না।"

"কারও কাছে বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়েছিস?"

"ধার নিতে যাব কেন?" কামিনী হেসে বলল, "আমার কি টাকার অভাব?"

"তা হলে?"

সেই একই রকমের নির্বিকার গলায় কামিনী বলল, "শোনো আঙ্কল, নেকলেসটা যদি চুরিই হত, তা হলে আর তোমাকে এইভাবে তলব করে এখানে টেনে আনতুম না।

"পুলিশে খবর দিতি?"

"অফ কোর্স।"

"কিন্তু বার্টি তো চুরির কথাই জানে, সে কেন পুলিশে খবর দেয়নি?"

"আমিই দিতে দিইনি। বলেছি যে, পুলিশ তো অপদার্থ, ওয়ার্থলেস। কিছুই করতে পারবে না, মাঝখান থেকে লোক-জানাজানি হবে। তার চেয়ে বরং আঙ্কলকে ডেকে পাঠাই, তিনি ঠিকই গয়নাটা উদ্ধার করে দিতে পারবেন।"

"বার্টি সে-কথা বিশ্বাস করল?"

"প্রথমে করতে চাইছিল না। পরে যখন বললুম যে, এর আগেও...আই মিন আমার বাবার আমলে....আমাদের গয়নার দোকানের একটা চুরির কিনারা করতে তোমাকেই ডাকা হয়েছিল, আর তুমিই গয়না উদ্ধার করে দিয়েছিলে, তখন আর কী করবে, মাথা চুলকে বলল, বেশ, তা হলে আঙ্কলকেই ডাকো। তো এই হচ্ছে ব্যাপার!"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "এই হচ্ছে ব্যাপারের মানে? কী যে ব্যাপার, কিছুই তো বুঝলুম না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে, এটা চুরির ব্যাপার নয়।"

"চুরির ব্যাপার নয়, হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়, কাউকে দান করার কি কোথাও বন্ধক রাখার ব্যাপারও নয়।"

"এসব যদি না-ই হবে, তা হলে ব্যাপারটা আসলে কী?" ঝাঁঝালো গলায় ভাদুড়িমশাই বললেন, "তুই কি আমাকে পাগল করে ছাড়বি? গয়নাটা কি উবে গেল? যা হয়েছে, খুলে বল, নয়তো আমি কিছুই করতে পারব না। আর হ্যাঁ, কিছু যদি না-ই করতে পারি, তো বেকার এখানে বসে থাকব কেন? কোনও মানে হয়? ট্যাক্সিটা তো ছাড়িনি, আজই বিকেলে আমরা দেরাদুন ফিরে যাব।"

কামিনী যে ঘোর অস্বস্তিতে পড়েছে, সেটা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়। একবার ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকাল, একবার আমাদের দিকে। কিন্তু কিছুই বলল না।

মনে হল, ভাদুড়িমশাই যদিও ওকে অভয় দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের সামনে সমস্ত কথাই স্বচ্ছন্দে বলা যায়, তবু ওর অস্বস্তি কাটছে না। এটা মনে হওয়া মাত্র আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললুম, "আমি আর সদানন্দবাবু বরং একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

ভাদুড়িমশাই ফের সেই ঝাঁঝালো গলায় নির্দেশ দিলেন, "না, আপনারা বসুন। ও যদি কিছু বলতে চায়, তো আপনাদের সামনেই বলবে।" তারপরেই কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন,. "জীবনে তো কাউকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে শিখিসনি! না তোর বাপকে, না তোর মা'কে, না আমাকে। কী করেই বা করবি, ওটা তোর কুষ্ঠিতেই লেখা নেই যে! তা না-ই থাক, তোর আঙ্কলকে তুই বিশ্বাসটা অন্তত করতি। সম্ভবত এখনও করিস। তো সেই আমিই তোকে যখন আশ্বাস দিয়েছি যে, এঁদের সামনে যা-কিছু বলবি, তার একটা কথাও আর-কেউ জানবে না, তখন তোর অস্বস্তি কীসের?"

মুখ নিচু করে বসে ছিল কামিনী। এবারে মুখ তুলে বলল, "কীসের অস্বস্তি, কাকে নিয়ে অস্বস্তি, বুঝতে পারছ না? অস্বস্তি আমার দাম্পত্য জীবন নিয়ে! অস্বস্তি বার্টিকে নিয়ে। বার্টি যদি আসল ব্যাপারটা জানতে পারে...."

কামিনীকে তার কথা শেষ করতে দিলেন না ভাদুড়িমশাই, মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তা হলে তোর জীবনে ফের অশান্তি দেখা দেবে, এই তো? ঠিক আছে, বার্টি কিছু জানবে না।.....নাউ লেট আস হ্যাভ দ্যা হোল স্টোরি। হোয়াট হ্যাপেনড টু দ্যাট নেকলেস?"

"ওটা একজনকে দিয়েছি।" চোখ নামিয়ে কামিনী বলল, "মানে....ঠিক যে দিয়েছি, তা নয়, দিতে বাধ্য হয়েছি।"

"কাকে?"

"তা জানি না।"

"তার মানে? একজনকে দিতে বাধ্য হয়েছিস, অথচ কাকে দিলি, সে কে, তা তুই জানিস না! কোনও মানে হয়?"

"সত্যিই জানি না!"

"তুই কিছু লুকোচ্ছিস মিনি।" ভাদুড়িমশাই প্রায় ধমক দেবার গলায় বললেন, "অ্যান্ড ইউ এক্সপেক্ট মি টু হেল্প ইউ আউট। আমার ধারণা, তুই মিথ্যে বলছিস। নেকলেসটা যাকে দিয়েছিস, তাকে চিনিস তুই, কিন্তু তা তুই স্বীকার করছিস না। ইউ আর আ ড্যাম লায়ার!"

"না আঙ্কল, আমি মিথ্যুক নই।" কাতর গলায় কামিনী বলল, "সত্যিই আমি চিনি না তাকে।"

"তা হলে ওই অত দামি নেকলেসটা তাকে দিলি কেন?"

"আমি যে ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম।"

"কীসের ভয়?"

"বার্টি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, এই ভয়।"

"আই সি!" ভাদুড়িমশাই বললেন, "ভয় পেয়েছিলি, তা তো বুঝলুম। কিন্তু তার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না। বার্টি তোকে ছেড়ে চলে যাবে, এমন ভয় পাবার কী কারণ ঘটল?"

চেয়ারে এতক্ষণে টান হয়ে বসল কামিনী। বুঝতে পারছিলুম; সে ভীষণ রকমের একটা অস্বস্তিতে ভুগছে। হয় সেইজন্যে সব কথা খোলাখুলি বলতে পারছে না, নয় তো বলতে চাইছে না। মনে হল, সেই অস্বস্তির ভাবটা বোধহয় কেটে গেছে। সরাসরি সে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকাল। বলল, "সব কথা না-শুনে তুমি ছাড়বে না। কেমন?"

"সব কথা না-শুনলে তোকে সাহায্য করব কী করে?"

"ঠিক আছে।" কামিনী বলল, "যা-যা ঘটেছে, পরপর সবই তোমাকে বলছি। শুধু একটা অনুরোধ, দয়া করে শিউরে উঠো না কিংবা শক্‌ড হোয়ো না।"

"আমরা শিউরে উঠব না।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "শক্‌ড হব না। কী জানিস, যে কাজ করি, তাতে শিউরে উঠতে কি শক্‌ড হতে আমি তো ভুলেই গেছি, আমার এই দুই বন্ধুরও বোধ হয় সেই একই অবস্থা। তবে হ্যাঁ, যে নোংরামি আর নীচতা মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে, তাতে একটু কষ্ট এখনও পাই ঠিকই। যা-ই হোক, তুই বলে যা, আমরা শুনছি।"

কামিনী বলল, "তোমাকে তো ছাব্বিশে এপ্রিল ফোন করেছিলুম, তা-ই না?"

"হ্যাঁ। রাত আটটায়। আমার ডায়েরিতে লেখা আছে।"

"তুমি তখুনি চলে এলে না কেন?"

"ওরে বোকা, তক্ষুনি-তক্ষুনি কি আসা যায়? কলকাতায় একটা কাজে এসেছিলুম। সেটা গুছিয়ে তুলতেই তো দু'তিন দিন লেগে গেল। তিরিশ তারিখে সকালের ফ্লাইটে দিল্লি আসি। সে রাতটা দিল্লিতে ছিলুম, পরের রাতে হৃষীকেশে। ব্যাস, কাল দোসরা মে তারিখেই তোর কাছে এসে হাজিরা দিয়েছি।.....নে, এখন তোর কথা বল।"

"ছাব্বিশে এপ্রিলের দু'দিন আগে ডাকে আমার নামে একটা প্যাকেট আসে।" কামিনী বলল, "লেটার বক্স খুলে প্যাকেটটা পাই। তাতে বিচ্ছিরি কয়েকটা ফোটোগ্রাফ ছিল।"

"কার ফোটোগ্রাফ?"

গলায় একটুও জড়তা নেই, কামিনী বলল, "আমার। হরর অব হরর্স, সবই উলঙ্গ অবস্থার ছবি!"

শুনে, ভাদুড়িমশাইয়ের কোনও ভাবান্তর হল না। নির্বিকার গলায় বললেন, "অমন ছবি কখনও কাউকে দিয়ে তুলিয়েছিলি?"

কামিনী ফুঁসে উঠে বলল, "এমন কথা তুমি ভাবলে কী করে?"

কথাটার জবাব না দিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "তুলিয়েছিলি?"

"কক্ষনো না।"

"ঠিক আছে, ছবিগুলো নিয়ে আয়, আমি দেখব।" কথাটা বলেই ভাদুড়িমশাই যোগ করলেন, "না না, ছবিগুলো নয়, যে-কোনও একটা আনলেই চলবে।"

বারান্দা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কামিনী আবার ফিরে এল। হাতে একটা প্যাকেট। তার থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বার করে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এখন বলো, এমন ছবি আমি তোলাতে পারি, আনলেস আই গো কমপ্লিটলি ম্যাড?"

ছবিটা ভাদুড়িমশাই দেখলেন মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই সেটা কামিনীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "ছবির সঙ্গে আর-কিছু ছিল না?"

"একটা চিঠি ছিল।" হাউসকোটের পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সেটাও ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কামিনী বলল, "পড়ে দ্যাখো।"

ভাদুড়িমশাই পড়লেন। তারপর চিঠিখানাকে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনারাও পড়ুন।"

ইংরেজিতে টাইপ করা অজস্র ভুলে ভরা চিঠি। বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়:

"এমন ছবি আমাদের কাছে আরও এক সেট আছে। তাতে যে শুধু তুমিই আছ তা নয়, তোমার সঙ্গে দেখা যাবে একটি ছেলেকেও। সেও তোমারই মতো উলঙ্গ। উপযুক্ত দাম পেলে নেগেটিভসহ সমস্ত ছবি তোমাকে ফেরত দেব। দাম না পেলে ছবিগুলি পাঠাব তোমার স্বামীকে।"

চিঠি পড়ে ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে তুলে দিলুম। ভাদুড়িমশাই সেটা কামিনীকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "দাম কীভাবে ঠিক হল?"

"পরের দিনই মানে পঁচিশে এপ্রিল দুপুরে টেলিফোন পাই। হেঁড়ে গলায় একটা লোক বলে, 'তোমার কাছে তিনটে হিরে বসানো একটা নেকলেস আছে, সেটা দিলে ছবি ফেরত পাবে।' সেইদিনই রাত্রে ফের ফোন আসে। সেই একই গলা। নেকলেসটা কীভাবে কোথায় পৌঁছে দিতে হবে, সে তা জানিয়ে দেয়।"

"কীভাবে পৌঁছে দিলি?"

"দাঁড়াও, বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেছে। জল খেয়ে এসে সব বলছি।"

বারান্দা থেকে কামিনী আবার ঘরে ঢুকে গেল।

॥ ৬ ॥

ঘর থেকে ফের বারান্দায় ফিরে আসতে এক মিনিটও লাগল না। বাঁ হাতে একটা সফ্‌ট ড্রিঙ্কের বোতল, ডান হাতে লম্বাটে একটা কাচের গেলাশ। দাঁড়ানো অবস্থাতেই বোতল থেকে গেলাশ ভর্তি করে পানীয় ঢেলে নিল কামিনী, এক নিশ্বাসে আধ গেলাশ শেষ করল, তারপর বোতল আর গেলাশ টেবিলে নামিয়ে রেখে, ধপ করে তার চেয়ারে বসে পড়ে, ডান হাতের উলটো পিঠটা একবার ঠোঁটোর উপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, "যে লোকটা ফোন করেছিল, তার গলা আমি চিনি না। সে বলেছিল, নেকলেসটা যে-কাউকে দিয়ে পৌঁছে দিলেই হবে। তবে পৌঁছে দিতে হবে পরের দিনই। কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটায়।"

"ক্যারিয়ার হিসেবে বিশেষ করও নাম করেনি?" ভাদুড়িমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

"না।" কামিনী বলল, "তবে এটা বলেছিল যে, যাকেই পাঠাই, সে যেন কোনও চালাকি করার চেষ্টা না করে। চালাকি করলে তার ফল ভাল হবে না।"

আমি বললুম, "পুলিশে খবর দেওয়া সম্পর্কে কিছু বলেনি?"

"বলেছিল বই কী। হুমকি দিয়েছিল, ওসব করলে পরিণাম খারাপ হবে।"

"ক্যারিয়ার হিসেবে কে ওটা নিয়ে গেল?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "মানে কে ওটা নিয়ে যাবে, সেটা তো আর তোকে বলে দেওয়া হয়নি। লোক ঠিক করার ব্যাপারটা তো তোর হাতেই ছিল।"

"তা ছিল। হুকুম ছিল শুধু এই যে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সে ওটা পৌঁছে দেবে।"

"কোথায় পৌঁছে দিতে হবে?"

"এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, অন ইয়োর ওয়ে টু উত্তরকাশী, একটা হাফ-বিল্ট বাড়িতে। বাড়ি মানে জাস্ট একটা স্ট্রাকচার। শুরু করা হয়েছিল, শেষ হয়নি, আর শেষ যে কখনও হবে, তাও মনে হয় না।"

"কেন?"

"বিকজ অব দ্য লোকেশন।" কামিনী বলল, "বাড়িটা নিয়ম ভেঙে তৈরি হচ্ছিল।"

"নিয়মটা কী?"

"নিয়ম আর কিছুই নয়, পাছে এখানকার সিনিক বিউটি নষ্ট হয়, তাই পাহাড়ের গায়ে কোনও পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার তোলা চলবে না। মালিক সেই নিয়ম ভেঙে পাহাড়ের গায়ে পাকা বাড়ি তুলছিল, একতলা দোতলার ইটের কাজ শেষও করে ফেলেছিল, তারপরেই তার উপরে নোটিস জারি করে কাজ আটকে দেওয়া হয়। ফলে ইলেকট্রিক লাইন, জলের কানেকশন, স্যানিটেশন, প্লাম্বার ওয়ার্ক ইত্যাদি

সব ফিনিশিংয়ের কাজ তো দূরের কথা, ইটের গায়ে প্লাস্টার পর্যন্ত পড়েনি। যদি উত্তরকাশীর দিকে যাও, তো রাস্তা থেকেই বাঁ দিকে তাকালে বাড়িটা দেখতে পাবে।"

"গয়নাটা সেখানে রেখে আসতে বলেছিল?" ভাদুড়িমশাই বললেন, 'ইন দ্যাট আনফিনিশড অ্যাবানডন্ড স্ট্রাকচার?"

"হ্যাঁ, একদম নির্জন জায়গা তো। একে ফাঁকা একটা স্ট্রাকচার, তায় ধারেকাছে লোকজন নেই, কারও চোখে পড়বে না, এইসব ভেবেই বোধহয় ওখানে রেখে আসতে বলেছিল।"

শুনে ভাদুড়িমশাই একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "পরের দিন মানে ছাব্বিশে এপ্রিল। সেদিন রাত আটটায় ওখানে কাকে পাঠালি?"

"প্রথমে ভেবেছিলুম, ডোমেস্টিক স্টাফেরই কাউকে পাঠাব।" কামিনী বলল, "গয়নার ভেলভেটের কেসটাকে কাপড় নয়তো কাগজ দিয়ে ভাল করে মুড়ে দিয়ে একটা প্যাকেটের মতন করে তাকে বলব, এর মধ্যে একটা বই আছে, একজনকে দিতে হবে, রাত আটটার সময় এটা ওখানে রেখে আসতে হবে। ......কিন্তু......"

"কিন্তু কী? পরে অন্যরকম মনে হল?"

"হ্যাঁ। পরে ভেবে দেখলুম, এ-বাড়ির যাকেই কাজটা করতে বলি না কেন, নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে সে বলাবলি করবেই। ফলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে, চাই কী বাটির কানেও উঠে যেতে পারে। তার উপরে আবার এদের প্রত্যেকেরই যা ভূতের ভয়, সূর্য ডোবার পর ওখানে যেতে কেউ রাজি হবে কি না, সেও সন্দেহের ব্যাপার। তা ছাড়া, জায়গাটা একটু দূরেও বটে!"

"তা ভেবেচিন্তে কী ঠিক করলি?"

"ঠিক করলুম, লিজাকে বলব।"

সদানন্দবাবু বললেন, "মানে....ওই যে মেয়েটি হপ্তায় তিনদিন আপনাকে মাসাজ করতে আসে?"

"হ্যাঁ, শুধুই যে মাসাজ করে, তা নয়," কামিনী বলল, "যোগ-ব্যায়ামের কয়েকটা আসনও করায়। তাতে বেশ উপকারও পাচ্ছি।"

আমি বললুম, "তা আপনি ঠিক করলেন যে, ক্যারিয়ারের কাজটা ওকে দিয়েই করাবেন?"

"হ্যাঁ, আমি ভেবে দেখলুম যে, ওকে বলাই ভাল। তার দুটো কারণ। প্রথম কারণ, ও একটু রেটিসেন্ট প্রকৃতির, দরকার ছাড়া এ-বাড়ির কারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলে না, ফলে ব্যাপারটা পাঁচকান হবার সম্ভাবনা কম।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "খুব গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে?"

কামিনী একটু হেসে বলল, "ঠিক তাও নয়। এমনিতে মিষ্টভাষী, সফ্‌ট স্পোক্‌ন, তবে তোমাদের তো বলেইছি যে, কিছুদিন আগে ওর স্বামী মারা গেছে.....নাকি

বলিনি?"

"হ্যাঁ, বলেছিস।"

"তো সেটাও ওর এই নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকার একটা কারণ হতে পারে। পারে না?"

"তা পারে বই কী।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু তুই তো দুটো কারণের কথা বলছিলি। লিজাকে বললে কথাটা পাঁচকান হবে না, এটা প্রথম কারণ। তা দ্বিতীয় কারণটা কী?"

"দ্বিতীয় কারণটা হল, নেকলেসটা যেখানে রেখে আসার কথা, সেই জায়গাটা ওর বাড়ি থেকে বিশেষ দূরেও নয়।"

আমি বললুম, "তা লিজাকে কথাটা বললেন কখন?"

"তার পরদিন সকালে।" কামিনী বলল, "অর্থাৎ যে দিন রাত্তির আটটায় নেকলেসটা সেই আনফিনিশড বাড়িতে রেখে আসার কথা। টুয়েন্টি সিক্সথ এপ্রিল টু বি প্রিসাইজ।"

"হ্যাঁ," ভাদুড়িমশাই বললেন, "আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে।"

"অ্যান্ড দ্যাট ওয়জ আ ফ্রাইডে। তাতে আমার সুবিধেই হল। কেন না, শুক্রবার লিজার আসার দিন। কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় আসে, এক ঘণ্টা মাসাজ করে, আসন করায়, তারপর চলেও যায় ঠিক এগারোটায়।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল কামিনী। তারপর বলল, "সে-দিনও ঠিক দশটাতেই এল, বেসিনে নিজের হাত-মুখ সাবান দিয়ে ধুয়ে বডি অয়েল দিয়ে আমাকে মাসাজ করল মিনিট পঁয়তাল্লিশ, আমাকে দুটো আসন করতে বলল, কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা দেখিয়ে দিল, তারপর যখন কাজ শেষ করে এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে যাচ্ছে তখন ওকে অনুরোধটা করলুম আমি।"

"ভেলভেটের বাক্সটা আগেই রেডি করে রেখেছিলি?"

"আগের রাত্তিরেই রেডি করে রেখেছিলুম। সেটা ওর হাতে দিয়ে বললুম, লিজা, উইল ইউ কাইন্ডলি ডু মি আ ফেভার?....ও তাতে একটু অবাক হয়ে বলল, কী করতে হবে? আমি বললুম, এই প্যাকেটে একটা বই আছে, এটা এক জায়গায় রাত আটটার সময় পৌঁছে দিতে হবে। কোথায় পৌঁছে দিতে হবে, তাও বললুম ওকে।"

"তুই রিকোয়েস্ট করতেই ও রাজি হয়ে গেল?"

"একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই যে রাজি হয়ে গেল, তা নয়। বলল, দিনের বেলায় হলে ওর কোনও অসুবিধে হত না। কিন্তু সোম বুধ আর শুক্রবারে তো হসপিটালে ওর নাইট ডিউটি থাকে, ওই তিনটে দিন তাই রাত্তিরের দিকে ও কোনো কাজ রাখে না, পাছে ডিউটিতে ওর লেট হয়ে যায়। বলে চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজা পর্যন্ত গিয়ে একটু থেমে দাঁড়াল। তারপর পিছন ফিরে বলল, ঠিক আছে, দিয়ে

দিন, আমি পৌঁছে দেব। আমি বললুম, কিন্তু তোমার তো হসপিটালে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। তাতে ও হেসে বলল, নাইট ডিউটি থাকলে বাড়ি থেকে তো আটটাতেই বেরিয়ে পড়তে হয়, আজ না হয় সাড়ে সাতটায় বার হব।''

''রাত আটটায় কেন একটা গড-ফরসেক্‌ন জায়গায় একটা বই পৌঁছে দিতে হবে, তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি?''

''না।'' কামিনী বলল, ''ওকে তো তা ধরো বছর দেড়েক ধরে দেখছি! এর মধ্যে যে কখনও ওকে কোনও অনুরোধ করিনি, তাও নয়। কিন্তু এই একটা ব্যাপার দেখেছি যে, অনুরোধ করলে ও হয় সেটা রাখে কিংবা সরাসরি বলে দেয়, সরি, অর্থাৎ অনুরোধটা রাখা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কোনও ব্যাপারেই কখনও কোনও প্রশ্ন করে না।''

''প্যাকেটটা ও ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় রেখে এসেছিল?''

''হ্যাঁ। ফোনে আমাকে বলা হয়েছিল, বাড়িতে ঢুকে সামনেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি পাওয়া যাবে। নেকলেসের কেসটা রাখতে হবে তার প্রথম ধাপে। ও তা-ই রেখে আসে।''

''সেখানে কেউ ছিল না?''

''থাকলেও লিজা তাকে দেখতে পায়নি। বাড়িটা তো অন্ধকার, তার মধ্যে দেখবেই বা কী করে?''

''কাউকে দেখতে পায়নি, এ-কথা লিজা তোকে কখন জানাল?''

''সোমবার আমাকে মাসাজ করতে এসে।'' কামিনী বলল, ''কিন্তু শুক্রবারই আমি একটা খুব মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলুম।''

শুনে, ভাদুড়িমশাইয়ের ভুরু একটু উপরে উঠে গিয়ে পরক্ষণেই আবার তার স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে এল। বললেন, ''বার্টি কিছু আঁচ করেছে?''

''ন্‌না, তা নয়।''

''মুশকিলটা তা হলে কীসের?''

কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল থেকে এবার আর গেলাশে পানীয় ঢেলে নিল না কামিনী। বোতলটাকেই উঁচু করে তুলে ধরে বাদবাকি তরল পদার্থটুকু সরাসরি গলায় ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে নিল। তারপর বলল, ''ওই শুক্রবার রাত্তিরেই আমাদের এই হাউসিং কমপ্লেক্সে একটা পার্টি ছিল।''

''কীসের পার্টি?''

''এখানে এক ভদ্রলোকের ছেলে বিলেতে একটা ভাল চাকরি পেয়েছে, সে বউ নিয়ে বিলেত চলে যাবে, সেই উপলক্ষে পার্টি। তা পার্টিতে আমি কী পোশাক পরে যাব, এমনিতে কখনও তা নিয়ে বার্টি কিছু বলে না। কিন্তু সেদিন রাত্তিরে হঠাৎ কী খেয়াল হল, আমি যখন পার্টিতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, তখন বলে বসল যে, আমার হিরের নেকলেসটা যদি পরি, তো দিব্যি হয়।''

"তাতে তুই কী বললি?"

"বললুম, যেটা পরে আছি, এটা তো কিছু খারাপ নয়! এখন যদি সেই নেকলেসটা পরি তো তার সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে আমার হাত আর কানের গয়নাও পালটাতে হবে। সে অনেক ঝামেলা, তাতে নাহক অনেক সময় নষ্ট হবে, পার্টিতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

ভাদুড়িমশাই মৃদু হেসে বললেন, "তার পরে কী হল, সে তো বুঝতেই পারছি। বার্টি জিদ ধরে বসে রইল যে, না, সেই নেকলেসটাই তোকে পরতে হবে, কেমন?"

কামিনী বলল, "ঠিক তা-ই। অন্য কখনও কিন্তু বার্টি এমন করে না। কিন্তু সেদিন যে কী হল...."

সদানন্দবাবু সম্ভবত একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেসলেন, কিংবা হয়তো এমনও হতে পারে যে, তারিখটা তিনি ঠিক খেয়াল করেননি। তাই বললেন, "তা আপনার হাজব্যান্ড যখন অত করে বলচেন, তখন না হয় একটু সময়ই নষ্ট হত, ওটা পরে নেওয়াই তো আপনার উচিত ছিল।"

আমি বললুম, "কোন্‌টা পরে নেওয়া?"

"কেন, ওই হিরের নেকলেসটা।" সদানন্দবাবু বললেন, "ওটা পরে নিলেই তো হত।"

ভাদুড়িমশাই ধমক দেওয়ার গলায় বললেন, "কী করে পরবে? গত শুক্রবার রাতের কথা হচ্ছে, সেটা ভুলে যাবেন না। হিরের নেকলেসটা কি তখন মিনির কাছে ছিল?"

কামিনী বলল, "সেদিন সকালেই তো আমি সেটা লিজার হাতে তুলে দিয়েছি!"

"এঃ হে!" সদানন্দবাবু দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বললেন, "ভুলে গেসলুম।"

"তখন কী হল?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "বার্টিকে তুই বললি, যে, ওটা চুরি হয়ে গেছে?"

"প্রথমেই বলিনি।" কামিনী বলল, "আসল কথাটা তো বার্টিকে জানাতে পারছিলুম না। জানাতে ভয়ও করছিল খুব।"

"কীসের ভয়?"

"প্রথম ভয়, বার্টি হয়তো বিশ্বাস করে বসবে যে, সত্যি-সত্যি আমি আমার ওইরকমের কদর্য ছবি তুলিয়েছি। তার উপরে আবার বিশ্বাস না-করলেও কি ভয় নেই?"

বললুম, "বিশ্বাস না-করলে তো মিটেই গেল। তখন আবার ভয় কীসের?"

"বিশ্বাস না-করলে উল্টে আমাকে চার্জ করে বলবে যে, আমি কেন একটা ব্ল্যাকমেলারকে ভয় পেয়ে ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করার জন্যে নেকলেসটা তাকে পাঠিয়েছি! বার্টিকে আপনারা চেনেন না, ও এমনিতে ভাল মানুষ, কিন্তু রেগে গেলে ওর মাথায় খুন চেপে যায়। ওকে যদি বলতুম যে, ছবি পাঠিয়ে আর

টেলিফোন করে যে-লোকটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, নেকলেসটা তাকে কোথায় পৌঁছে দিতে হবে, তা হলে তক্ষুনি ও রিভলভার নিয়ে সেখানে ছুটত। গিয়ে হয়তো সেখানে তাকে পেত না, কিংবা পেলেও একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হত। হয় সেই লোকটা ওর হাতে খুন হত, কিংবা তার হাতে বার্টি। সে-সব ভেবেই ওকে সত্যি কথাটা বলতে পারিনি!"

"অগত্যা চুরির কথা বললি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু সেটাও তো প্রথমে বলিসনি বলছিস। কখন বললি তা হলে?"

"বলছি। প্রথমে কিছুক্ষণ আলমারির লকার খুলে ফোঁজাখুঁজির ভান করলুম। তারপর বার্টিকে বললুম, আমি তো পাচ্ছি না, তুমি একবার দ্যাখো না। তা বার্টিও খানিকক্ষণ খুঁজল। শুধু আমার আলমারির লকার নয়, সব ক'টা আলমারির সব ক'টা লকার। তারপর শাড়ির ভাঁজে, গদির তলায়। কিন্তু বার্টিও কিছু পেল না। কী বলব, ওটা পাওয়া যাবে না জেনেও যে ওকে দিয়ে এত পরিশ্রম করাচ্ছি, তার জন্যে আমার খারাপও লাগছিল খুব। শেষকালে এক সময় বললুম, দ্যাখো, গত মাসে ওই নেকলেসটা পরে একটা পার্টিতে গিয়েছিলুম, বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেসল। তখন ওটা বিছানাতেই রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, লকারে আর তুলে রাখা যায়নি। নিশ্চয় চুরি হয়ে গেছে।"

"তাতে বার্টি কী বলল?"

"প্রথমে আমাকে একটু বকাবকি করল। তারপর বলল ইমিডিয়েটলি পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু, আঙ্কল, পুলিশে খবর দিতে বিবেকে বাধল আমার। আমি তো জানি, নেকলেসটা চুরি হয়নি। তা হলে পুলিশ ডেকে কী হবে। পুলিশ তো সন্দেহ করবে আমাদের বাড়ির কাজের লোকদেরই। অর্জুনকে, লছমিকে, যোগীশ্বরকে, হরিন্দরকে, দুখনকে। ওদের থানায় ধরে নিয়ে যাবে, পেটাবে। তা ছাড়া, লিজাকেও তো পুলিশ সন্দেহ করতে পারে। জেরা করতে পারে। বইয়ের প্যাকেট বলে তাকে যা দিয়েছি, সেটা সে খুলে দেখেছে কি না, তারই বা ঠিক কী। জেরায় জেরবার হয়ে সে যদি বলে দেয়, নেকলেসটা সেই প্যাকেটের মধ্যে ছিল, তা হলেই তো চিত্তির। বার্টিকে তাই বললুম, পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই, ওরা গুড ফর নাথিং, কোনও ক্রাইমেরই কিনারা করতে পারে না, বরং চারু আঙ্কলকে জানাই, তিনি নিশ্চয় ওটা উদ্ধার করে দিতে পারবেন।"

কামিনী থামতে ভাদুড়িমশাই বললেন, "বাস্, তারপরেই ফোন করলি আমাকে!"

"করতে বাধ্য হলুম।" কামিনী বলল, "সব কথা তো শুনলে, এখন বলো, সেদিন তোমাকে ফোন না-করে কোনও উপায় ছিল আমার? যদি না তোমাকে ফোন করতুম, তো বার্টি নিশ্চয়ই থানায় ফোন করে পুলিশকে সব জানাত। তা হলে আর কেলেঙ্কারির কিছু বাকি থাকত না।"

ভাদুড়িমশাইকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল। বললেন, "সবই তো বুঝলুম, মিনি।

কিন্তু আমিই বা এখন কী করব?”

কামিনী হেসে বলল, “কী আর করবে। যেন নেকলেসটাকে উদ্ধার না-করে ছাড়বে না, বার্টির সামনে এইরকম একটা ভাব দেখাবে, কয়েকটা দিন এখানে-ওখানে একটু ছুটোছুটি করবে, তারপর কলকাতায় ফিরে যাবে। বাই দ্যাট টাইম বার্টিও ধরে নেবে যে, তুমিও যখন কিছু করতে পারলে না, তখন পুলিশে খবর দিয়েও কোনও লাভ নেই।”

“আর নেকলেসটা?”

“ওটা যাবার ছিল, গেছে! ওটা দিয়ে যে আমি আমার ইজ্জত বাঁচাতে পেরেছি, তা-ই যথেষ্ট। ও নিয়ে তুমি আর ভেবো না।”

কথা বলতে-বলতেই হাতঘড়ির দিকে তাকাল কামিনী। বলল, “ওরে বাবা, একটা বাজতে চলল। একটু পরেই লাঞ্চের ডাক পড়বে। তোমরা স্নান করে নাও।”

“আর তুই?”

“আজ তো লিজা আসেনি, তাই মাসাজও হবে না। যোগব্যায়ামের গোটা কয়েক আসন তো করতে হবে, সে-সব নিজেই করে নেব। তারপর স্নানঘরে ঢুকব। খেতে বসব এই ধরো সওয়া একটা নাগাদ।....যাও, যাও, তোমরা আর দেরি কোরো না।”

বারান্দা থেকে কামিনী তার ঘরে চলে গেল। ভাদুড়িমশাইকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আমি আর সদানন্দবাবু আমাদের এলাকায় চলে এলুম। ঘরে ঢুকে সদানন্দবাবু বললেন, “আমি আর এখন চান করচি না, বরং মাতায় একটু জল ছিটিয়ে নেবখন, আপনি চান করে নিন।”

চান করে বাইরে এসে দেখি, সদানন্দবাবু গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। বললুম, “কী ব্যাপার? কিছু ভাবছেন?”

সদানন্দবাবু বললেন, “ভাবছি যে, মেয়েটা বদ্ধ পাগল! নইলে হাসতে-হাসতে অমন কতা বলতে পারে?”

“কী বলল?”

“ওই যে বলল, ওটা যাবার ছিল, গ্যাচে! অথচ যেটা গেল, তার দাম নাকি পাঁচ লাখ টাকা! ভাবা যায়?”

গম্ভীর গলায় বললুম, “যায়। বাজার চড়ুক, ও-মেয়ে শেয়ার বেচে ওর দ্বিগুণ টাকা তুলে নেবে।”

॥ ৭ ॥

ভাদুড়িমশাই তাঁর ঘর থেকে আমাদের ঘরে চলে এসেছিলেন। বসে-বসে গল্প হচ্ছিল। তার মধ্যে ফোটোগ্রাফগুলোর কথা একবারও ওঠেনি। কথা হচ্ছিল নেকলেসটা নিয়ে। ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওর মধ্যে যেটা বড়, তার একটা ইতিহাস আছে। মূলে ওটা কার ছিল, বলা শক্ত, তবে কামিনীর ঠাকুর্দার হাতে আসার আগে ওটা ছিল বরোদার এক বনেদি ব্যবসায়ীর হাতে। সে নাকি সুরাটের এক পোর্তুগিজ বণিকের কাছ থেকে ওটা কিনেছিল। কিন্তু কেনার পর মাত্র এক বছরের মধ্যেই তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানটি মারা যায়। তাতে তার ধারণা হয় যে, হিরেটা অপয়া, ওটা কেনার ফলেই তার স্ত্রীপুত্র মারা গেছে, এবারে ব্যাবসাও লাটে উঠবে। বাস্, তারপরে সে আর দেরি করেনি, কামিনীর ঠাকুর্দা অশ্বিনীভাই পটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে ওটা বেচে দেয়।"

সদানন্দবাবু বললেন, "হিরের যে পয়া-অপয়া আচে, এটা কিন্তু মিচে কতা নয়। আমার এক পিসশাশুড়ির কাচে শুনিচি, তাঁর দাদাশ্বশুরের ছেলেবেলায় একবার এমন ন্যাবা রোগ হয়েছিল যে, গোটা শরীর একেবারে হল্‌দে হয়ে যেত, বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। ডাক্তার-বদ্যি ফেল মেরে যাবার পরে ডাক পড়ল জ্যোতিষীর। তিনি এসে রুগির কুষ্টি দেখে বললেন, তোমরা করেচ কী, এর তো দেকচি হীরকারোগ্য যোগ রয়েচে, বাঁচাতে হলে এক্ষুনি একে হিরের আংটি পরাও।"

হেসে বললুম, "হিরের আংটি পরাতেই অমনি জন্ডিস সেরে গেল?"

"হাসবেন না, হাসবেন না," সদানন্দবাবু বললেন, "এর ভেতরে হাসির কিচু নেই। হিরের সত্যি পয়া-অপয়া আচে। কারও ভাল হয়, কারও মন্দ। কী রকমের মন্দ, সেটা যদি শুনতে চান তো আমাদের জেঙ্কিনস অ্যান্ড জেঙ্কিনস কোম্পানির শামুকখোলা টি-গার্ডেনের ম্যানেজারের গপ্পোটা বলি...."

গপ্পোটা শুরু হবার আগেই ঘণ্টা পড়ল।

ভাদুড়িমশাই বললেন, "লাঞ্চের ঘণ্টা। গপ্পোটা পরে শুনব, চলুন, খেতে যাওয়া যাক।"

হাতঘড়িতে দেড়টা বাজে। সবাই মিলে একতলার ডাইনিং রুমে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। অর্জুন টেবিলে প্লেট সাজিয়ে ফেলেছে। ভাদুড়িমশাই বললেন, "মিনি কোথায়? তাকে দেখছি না যে?"

প্রশ্নটা অর্জুনকে করেছিলেন। কিন্তু তার আর কোনও উত্তর দেবার দরকার হল না, হাতে একটা বোতল নিয়ে কামিনী এসে ঘরে ঢুকল। বলল, "তোমরা এসে গেছ দেখছি।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ঘণ্টা বাজাবার ব্যাপারটা তোদের বাঙ্গালোরের বাড়িতে ছিল। সেটা এখানেও চালু আছে দেখে ভাল লাগল। কাল রাত্তিরে অবশ্য ডিনারের

ঘণ্টা শুনিনি।”

কামিনী হেসে বলল, “ওটা অর্জুনের ব্যাপার। ও তো বিকেল-বিকেলই চলে যায়। রাত্তিরে তাই ঘণ্টাও বাজেনি, তোমরাও শোনোনি।”

“তা-ই বল্।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু তোর হাতে ওটা কীসের বোতল?”

“টনিকের। এনার্জি-প্লাস। এনার্জি বাড়ায়। কিছুদিন থেকে রোজ দু'বেলা দু'চামচ করে খাচ্ছি। দুপুরে আর রাতে খাওয়ার আগে।”

“কাল রাত্তিরে তো খেতে দেখিনি।”

“ডাইনিং রুমে নিয়ে আসিনি, তাই দ্যাখোনি। দোতলাতেই টনিকটা খেয়ে নিয়ে তারপর নীচে খাওয়ার ঘরে এসেছিলুম।”

“ওটা খেলে সত্যি এনার্জি বাড়ে?”

“না-বাড়লে আর খাচ্ছি কেন?” কামিনী একটা কাপে দু'চামচ ওষুধ ঢালল, তারপর ওষুধটা খেয়ে, মুখ-বিকৃতি করে বলল, “স্বাদটা অবশ্য অতি বিচ্ছিরি।”

ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা হোক, উপকার যখন পাচ্ছিস, তখন খেয়ে যা। ....তা যে-কাজে এসেছি, আমারও একটু এনার্জি দরকার, তাই তোর সঙ্গে রোজ আমিও একটু খেলে পারি...মানে ওই যে ক'টা দিন এখানে আছি আর কি।”

“খাবে?” কামিনী তার ওষুধের বোতলটাকে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে খুশি গলায় বলল, “দাঁড়াও, অর্জুনকে তা হলে আর-একটা কাপ দিতে বলি। স্বাদটা কিন্তু সত্যি খুব বিচ্ছিরি!”

“থাক, তা হলে আর এখন খেয়ে খিদেটা নষ্ট করব না!” ভাদুড়িমশাই বললেন, “আগে লাঞ্চ খাই, পরে উপরে গিয়ে ওষুধ খাব।”

“ওটা কিন্তু খাওয়ার আগেই খেতে হয়।”

“কে বলেছে? বার্টি?”

“বার্টির এত সময় কোথায় যে, বউয়ের স্বাস্থ্য আর ওষুধ নিয়ে ভাববে। সে তো তার দু'টাকা ভিজিটের রুগিদের নিয়েই ব্যস্ত!”

“বাঃ, বার্টি তোর শরীর” স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবে না?' ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “বাজে কথা বলিস না মিনি! সে যদি না-ই ভাববে তো ওষুধটা প্রেসক্রাইব করল কে?”

কামিনী বলল, “লিজা। তবে হ্যাঁ, লিজা এটা এনে দেবার পরে বার্টিকে না-জানিয়ে খেতে শুরু করিনি। তা বোতলটা দেখে সেও বলল, লিজা ঠিক ওষুধই এনেছে। এটা খুবই নাম-করা কোম্পানির টনিক, খেলে উপকার পাবই।”

খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল। অর্জুনের রান্নার হাত ভাল। পদ বেশি করেনি। ভাতের সঙ্গে ডাল, বেগুনভাজা, আলু-পোস্ত আর চিকেন কারি। শেষ পাতে জমাট টক-দই। সেও বাড়িতেই পাতা।

খাওয়া শেষ করে ভাদুড়িমশাই বললেন, "বার্টি তো বিকেলের আগে ফিরছে না। ততক্ষণ তুই কী করবি মিনি?"

"ঘরে গিয়ে একটা-কোনও বই পড়ব।" কামিনী বলল, "বই পড়তে-পড়তে যদি ঘুম এসে যায় তো ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেব। তোমরাও একটু ঘুমিয়ে নিলে পারো, আঙ্কল।"

"কিরণবাবু আর বোসমশাই কী করবেন, আমার জানা নেই, তবে আমি ঘুমোব না।" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "আমি রাতে ঘুমোই, দিনে জাগি। আর তা ছাড়া, আমাকে একটু বেরোতেও হবে।"

সদানন্দবাবু বললেন, ."কোতায়?"

কথাটার জবাব না-দিয়ে কামিনীর দিকে তাকিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "হ্যাঁ রে মিনি, রাজেশের কথা তোর মনে আছে?"

"কোন রাজেশ?"

"রাজেশ কুলকার্নি। বাঙ্গালোরে তোদের পাশের বাড়িতে একটি খ্রিস্টান পরিবার থাকত। মনে আছে?"

"মানে সেই বাড়ির সেই ছোট্ট ছেলেটা। যে তখন ইস্কুলে পড়ত, তারপর রোজ বিকেলে দোকানে যাবার আগে বাবা যাকে ডেকে পাঠিয়ে ঘণ্টাখানেক অঙ্ক শেখাতেন? তাকে কেন মনে থাকবে না?"

"যাক, মনে আছে তা হলে! তো সে আর এখন সেই ছোট্ট ছেলেটি নেই। তার বয়েস এখন বছর তিরিশেক।"

"কী করে সে এখন?"

"এম. এসসি. পাশ করে কর্ণাটকের একটা গ্রামের ইস্কুলে মাস্টারিতে ঢুকেছিল। বছর তিনেক আগে ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে কলেজে ঢোকে। এখন উত্তরকাশীর একটা কলেজে পড়ায়। কলেজটা শুনেছি ক্রিশচান মিশনারিদের। মনে হয় ভালই আছে।"

"বলো কী! তুমি এত সব খবর রাখো কী করে?"

"যে-ভাবে রাখতে হয়।....কী জানিস মিনি, আমি কাউকেই ভুলে যাই না। যেমন তোর খবর রাখি, তেমন রাজেশের খবরও রাখি। তা ভাবছি যে, রাজেশ যখন এত কাছে রয়েছে, তখন দুপুরটা বেকার বসে না-থেকে তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।"

"এখানে ওর বাড়ি?"

"বাড়ি ভাড়া করার দরকার হয়নি। হস্টেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হস্টেলের মধ্যেই দু'কামরার কোয়ার্টার্স। বিয়ে করেনি। বাবা তো ওর ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন, তোর বাবার সাহায্য না-পেলে ওর লেখাপড়াই হত না। যা-ই হোক, এখন মা'কে নিয়ে এখানে থাকে।"

"তাই-ই?" কামিনী বলল, "রাজেশ জানে যে, আমরা ওদের এত কাছে থাকি?"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "আগে জানত না। এখন জানে। আসলে, ওর সঙ্গে তো চিঠিপত্রে আমার যোগাযোগ ছিলই, ওর ফোন নাম্বারও আমি জানতুম, তা কলকাতা থেকে রওনা হবার আগের দিন ওকে ফোন করে আমার আসার কথা জানাই। এটাও বলি যে, এখানে এসে ওর সঙ্গে দেখা করব।"

"এখানে তুমি আমার কাছে উঠবে, তা ওকে বলেছ?"

"তা বলিনি, তবে আজ তো ওর সঙ্গে দেখাই হচ্ছে, তখন বলব।"

"তখন বোলো যে, মা'কে নিয়ে ও যেন অতি অবশ্য একদিন এখানে আসে। এলে আমরা দারুণ খুশি হব।...উঃ, সেই রাজেশ! ও আমাকে মিনিদিদি বলত আর আমি ওর মাকে বলতুম সার্দামাসি! সেই রাজেশ এত কাছে থাকে! এ তো ভাবাই যায় না! ওকে কিন্তু শিগগিরই একদিন আসতে বোলো, আঙ্কল!"

"বলব রে, বলব!"

কামিনীকে আশ্বস্ত করে আমাদের দিকে তাকালেন ভাদুড়িমশাই। বললেন, "কী ব্যাপার, আমি বেরুব শুনেও আপনারা চুপ করে আছেন যে? বেরুবার ইচ্ছে নেই? দুপুরে পড়ে-পড়ে ঘুমুবেন?"

বললুম, "কী যে বলেন! সেই কত বছর আগে উত্তরকাশীতে আসা হয়েছিল, আবার যখন শহরটাকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি, তখন ছাড়া যায়?"

সদানন্দবাবু বললেন, "আমি তো যাবই! বাবা বিশ্বনাথের কাশী অবিশ্যি আমার দেকা হয়নি, তবে এই কাশীকে দেকার সুযোগ যখন পেইচি, তখন ছাড়চি না।"

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। কাজের লোকটি টেবিল পরিষ্কার করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমরা উঠে পড়লুম। ভাদুড়িমশাই এনার্জি-বর্ধক ওষুধের বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে কামিনীকে বললেন, "এটা আমি আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। দু'চামচ খেয়ে তারপর বোতলটা তোর ঘরে দিয়ে আসব।"

কথাটা শেষ করে ভাদুড়িমশাই আর দাঁড়ালেন না। আমাদের নিয়ে দোতলায় চলে এলেন। নিজের ঘরে ঢোকার আগে বললেন, "সওয়া দুটো বাজে। দিবা-নিদ্রা মহাপাপ, তাই ঘুমোবার চেষ্টা করবেন না। ইন্দরলালকে বলা আছে, সে গাড়ি তৈরি রেখেছে। আমরা আড়াইটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ব। পনরো মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নীচে নামুন।"

বৈশাখ মাসের অর্ধেকটা কাবার হয়ে গেছে। কলকাতায় এখন নিশ্চয় দারুণ গরম। এখানে কিন্তু গরমের নামগন্ধ নেই। বেশি না-হলেও বাতাসে হালকা-মতন শীতের আমেজ, বিকেল হলে সেটা আরও বেড়ে যায়। সদানন্দবাবুকে বললুম,

"আর কিছু না হোক, অন্তত একটা জাম্পার পরে নেবেন। আর হ্যাঁ, ফিরতে-ফিরতে রাত হয়ে যেতে পারে, তাই সঙ্গে একটা মাফলারও রাখা ভাল।"

সদানন্দবাবু বললেন, "আমি মশাই একজোড়া মোজাও আমার পকেটে নিয়ে নিচ্চি। ফিরতি পথে পরে নেবখন। নয়তো চোরা ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। বিদেশে এসে অসুখ বাদিয়ে বসাটা কোনও কাজের কতা নয়।"

ঠিক আড়াইটেতেই নীচে নেমে, গাড়ি তৈরিই ছিল, আমরা বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার সময় দুটো ব্যাপার চোখে পড়ে। এক, পথ-আটকানো কাঠের ডাণ্ডাটা নামানো ছিল, আমাদের ট্যাক্সিটাকে বেরোতে দেবার জন্যে সেটা উপরে উঠে যায়। দুই, সেন্ট্রি-বক্সের লোকটি একটা খাতা খুলে কিছু লিখে নিল। সম্ভবত আমাদের গাড়ির নম্বর ও হাউসিং কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে যাবার সময়।

সদানন্দবাবু আমার পাঁজরে একটা খোঁচা মেরে চাপা গলায় বললেন, "দেকলেন ব্যাপারটা?"

উত্তরটা আর আমাকে দিতে হল না, যতই আস্তে বলে থাকুন, প্রশ্নটা আমাদের ড্রাইভার ইন্দরলালের কানে ঠিকই পৌঁছে গেছে। ঘাড় না-ঘুরিয়েই সে সামনের সিট থেকে বলল, "মায় ভি দেখা বাবুজি। সিকিওরিটি বহোত কড়া হ্যায়।"

ভাদুড়িমশাইও বসে আছেন সামনের-সিটে, ইন্দরলালের বাঁ পাশে। সদানন্দবাবুর কথাটা তিনিও শুনেছেন ঠিকই। বললেন, "যাক, আপনারা চোখ-কান খোলা রেখেছেন তা হলে?"

"সে তো আমি চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা রাকি!" সদানন্দবাবু বললেন, "সব দেকি, সব শুনি। তা নইলে আর আপনার কাজে হেল্‌প করব কী করে?"

"আপাতত আপনাদের ডান দিকের চোখ বন্ধ রাখলেও ক্ষতি নেই," ভাদুড়িমশাই বললেন, "নদীর শোভা না-দেখলেও চলবে। বাঁ দিকের সবকিছু কিন্তু দেখা চাই। পাহাড়, ঘরবাড়ি, লোকজন, মন্দির, দোকানপাট—সব। যদি ইন্টারেস্টিং কিছু চোখে পড়ে, উত্তরকাশীতে পৌঁছে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। এখন শুধু দেখতে থাকুন।"

উত্তরকাশীতে পৌঁছতে-পৌঁছতে সাড়ে তিনটে বাজল। পথ-চলতি লোকজনদের কাছ থেকে রাস্তার হদিশ জেনে নিয়ে রাজেশ কুলকার্নির কলেজে পৌঁছতে পৌনে চারটে। দিব্যি কলেজ। এল-শেপের তিনতলা বাড়ি, পাথুরে গাঁথনির শক্তপোক্ত স্ট্রাকচার, বিশাল কম্পাউন্ড, তার মধ্যে যেমন ফুটবল খেলার মাঠ, তেমন একটা টেনিস-কোর্টও চোখে পড়ল। একদিকে একটা গির্জা। মিশনারিদের সব কলেজেই যেমন থাকে। কলেজ-কম্পাউন্ডে ঢুকে রাজেশের খোঁজ করতে একটি ছাত্র বলল, "আর কে'র আজ লাস্ট ক্লাস ছিল আড়াইটেয়। এখন ওঁকে টিচার্স রুমেও পাবেন না। হয় লাইব্রেরিতে পাবেন, নয়তো হস্টেলে ওঁর কোয়ার্টার্সে।"

লাইব্রেরিতে পাওয়া গেল না। হস্টেলটা যে খেলার মাঠের ধারে, সেটা আমরা কলেজে ঢুকেই দেখে রেখেছি। সেখানে গিয়ে দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোয়ার্টার্স তিনতলায়, "কুলকার্নিসাব একটু আগে কলেজ থেকে ফিরেছেন, তাঁকে তাঁর বাড়িতেই পাওয়া যাবে।"

তিনতলায় উঠে কলিং বেল টিপতে দরজা খুলে যে যুবকটি বেরিয়ে এল, তার মুখচোখ দেখেই বোঝা যায় যে, সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। এগিয়ে এসে ভাদুড়িমশাইয়ের হাঁটু ছুঁয়ে বলল, "আঙ্কল, আপনি? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে, "এঁদের তো চিনলুম না!"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "এঁরাও তোর আঙ্কল, রাজেশ। ইনি চ্যাটার্জি-আঙ্কল আর উনি বোস-আঙ্কল। দু'জনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের হাঁটু ছুঁয়ে হাত জোড় করে রাজেশ বলল, "দাঁড়িয়ে থাকবেন না, দয়া করে ভিতরে আসুন।"

দরজা পেরোলেই ড্রয়িং রুম। ঘরটা বড় নয়, তবে আসবাবপত্রও অল্প। একদিকে একটি সেন্টার-টেবিল ঘিরে বেতের একটা টানা সোফা আর খান কয়েক বেতের চেয়ার, অন্যদিকে একটা কাচের বুক-কেসে কিছু বই। আসববাবপত্র কম বলে ধুলোময়লাও কম। একদিকে মস্ত জানালা। জানালায় পর্দা নেই। মাঝে-মাঝে হাওয়া আসছে। তাতে ঠাণ্ডার আমেজ।

ঘরে ঢুকে জমিয়ে বসা গেল। ভাদুড়িমশাই বললেন, "হ্যাঁ রে রাজেশ, তোর মা'কে যে দেখছি না? তিনি কোথায়?"

"মা দেরাদুনে তাঁর এক বোনের বাড়িতে গেছেন। আপন বোন নন, একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়। পরশু ফিরবেন।....দাঁড়ান, আপনাদের জন্যে চা করে আনি।"

"তোকেই চা করতে হবে?"

"সে তো মা থাকলেও আমি নিজেই চা করি।" রাজেশ হেসে বলল, "আপনারা গল্প করুন, আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি!"

রাজেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরে ভাদুড়িমশাই বললেন, "হস্টেলের ছাত্ররা থাকে একতলায় আর দোতলায়। তিনতলার পুরোটাই দেখছি রাজেশের দখলে। ঘর মাত্র দুটো বটে, কিন্তু ছাতটা বিরাট। দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে আছে।"

বললুম, "জায়গাটাও শুনেছি স্বাস্থ্যকর।"

সদানন্দবাবু বললেন, "ঠিকই শুনেচেন। আমি তো অলরেডি সেটা ফিল করতে শুরু করিচি।"

বিরাট একটা ট্রে'র উপরে চায়ের সরঞ্জাম আর আলাদা একটা প্লেটে কিছু বিস্কুট নিয়ে রাজেশ এসে ঘরে ঢুকল। বলল, "দুধ-চিনি মেশাইনি, আপনারা

মিশিয়ে নিন।"

আমরা যে-যার পেয়ালায় যে-যার মতন করে চা নিলুম। আমি আর সদানন্দবাবু স্রেফ লিকার, ভাদুড়িমশাই আর রাজেশ দুধ আর চিনি মিশিয়ে। নিজের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "চমৎকার চা।...তা হ্যাঁ রে রাজেশ, তোর ছেলেবেলা তো বাঙ্গালোরে কেটেছে, সেখানকার কথা মনে পড়ে?"

রাজেশ বলল, "খুব মনে পড়ে। বিশেষ করে মনে পড়ে পটেল-আঙ্কলদের কথা। ওঁরা কেমন আছেন?"

"রঞ্জনা বেঁচে নেই, জানকীদাসও মারা গেছে।... তা হ্যাঁ রে, তোর মিনিদিদির কথা মনে পড়ে না?"

"খুব মনে পড়ে। আমাকে ভারী ভালবাসত। তা মিনিদিদির খবর কী?"

"যদি বলি তোর মিনিদিদি এখন তোর খুব কাছেই থাকে, তা হলে বিশ্বাস করবি?"

"সত্যি? কোথায় থাকে সে?"

"ডুগ্গা ভ্যালিতে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "ড. হারবার্ট রাসেলের নাম শুনেছিস?"

"ওরেব্বাবা," রাজেশ বলল, "তাঁকে কে না জানে! তিনি তো মস্ত লোক। আ ভেরি ওয়াইডলি রেসপেক্টেড ফিজিশিয়ান। গরিবের বন্ধু। অত নামজাদা ডাক্তার মাত্র দু'টাকা ভিজিটে রুগি দেখেন, অনেককে নাকি ওষুধও দেন বিনি পয়সায়।"

"সেই মানুষটাই তোর মিনিদিদির স্বামী।"

"বলেন কী! তা মিনিদিদি যখন এত কাছে থাকে, তখন তো তার বাড়িতে একদিন যাওয়া উচিত। আমাকে চিনতে পারবে তো?"

"কী যে বলিস, তোর নাম বলতেই তোকে চিনতে পেরেছে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তোর ফোন-নাম্বার মিনিকে দিয়েছি। শিগগিরই তোকে ফোন করে ও বাড়িতে যেতে বলবে।"

কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ভাদুড়িমশাই। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা বসে-বসে গল্প করুন। রাজেশকে নিয়ে আমি বরং ওর কলেজটা একটু দেখে আসি।"

বুঝতে পেরেছিলুম যে, যে-কোনও কারণেই হোক, ভাদুড়িমশাই এখন রাজেশের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকতে চান। ইঙ্গিতটা ধরতে না পারায় সদানন্দবাবুও 'চলুন আমিও যাব' বলে উঠে পড়েছিলেন, আমি তাঁর পাঞ্জাবির খুট ধরে ফের বসিয়ে দিলুম।

রাজেশকে নিয়ে ভাদুড়িমশাই বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন ছ'টা নাগাদ। ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে দেখলুম ওই যাকে 'বিগ শপার' বলে সেই রকমের একটা

বড়সড় ব্যাগ। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বললেন, "গোটাকয় জিনিস আর কিছু ওষুধপত্তর কেনার ছিল, এখান থেকেই কিনে নিয়ে এলুম।"

ফিরতি পথে রওনা হতে-হতে সাড়ে ছ'টা।

।। ৮ ।।

জেলার নাম উত্তরকাশী, শহরের নামও তা-ই। ফিরতি পথে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে ট্যাক্সি যখন একটু ফাঁকা জায়গায় পড়ল, হাতঘড়িতে তখন পৌঁনে সাতটা। কিন্তু সূর্যাস্ত তো কলকাতার তুলনায় এখানে অনেক দেরিতে হয়, আকাশ থেকে আলো তাই তখনও মুছে যায়নি।

ভাদুড়িমশাই বললেন, "আসার পথে বাঁ দিকে চোখ রাখতে বলেছিলুম, এবারে ডান দিকে চোখ রাখুন।"

সদানন্দবাবু বললেন "তার মানে এই ফিরতি-পথেও নদীর দিকে চোক রাকা চলবে না? সেই পাহাড় দেকতে-দেকতেই যাব?"

"শুধু পাহাড় দেখবেন কেন? বাড়িঘর, লোকজন, দোকানপাট—সব দেখবেন।"

"সে তো আসার পথেই দেকিচি!"

"ইন্টারেস্টিং কিছু চোখে পড়েনি?"

"রাস্তার ধারে একটা ঝাঁকড়া-চুলো লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেকিচি, সঙ্গে একটা বাঁদর। বাঁদরটা তার কাঁধে বসে কলা খাচ্ছিল।"

"মানুষ কি শুধু কুকুর-বেড়াল আর গোরু-ছাগল পোষে?" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "বাঁদরও পোষে। ওটা ওর পোষা বাঁদর।....তো উল্লেখ করার মতো আর-কিছু আপনি দেখেননি?"

"কই, না তো।" সদানন্দবাবু বললেন, "তবে হ্যাঁ, একটা মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ডে হিন্দি লেকার নীচে বাংলায় লেকা রয়েচে দেকলুম বিশ্বনাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। দোকানটার মালিক বোধ করি বাঙালি। তা এটা কি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার নয়?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "খুবই ইন্টারেস্টিং।.....তা কিরণবাবু, এবারে আপনার কথা শুনি। আপনার চোখে কিছু পড়ল?"

"না।" আমি বললুম, "বাঁদর-কাঁধে লোকটাকে আমিও দেখেছি বটে, তবে সাইনবোর্ডে বাংলা হরফটা আমার চোখে পড়েনি। দুটো বাড়ি অবশ্য দেখেছি।"

"কোন দুটো বাড়ি?"

"যার কথা আজই কামিনীর মুখে শুনেছি আমরা। প্রথমটা অবশ্য আলাদা

একটা বাড়ি নয়, অনেকগুলো ফ্ল্যাটবাড়ি নিয়ে একটা হাউসিং এস্টেট। এটা মোটামুটি ডুণ্ডা ভ্যালি আর উত্তরকাশীর মাঝামাঝি জায়গায়। লিজা বোধহয় ওখানেই থাকে।”

“দ্বিতীয় বাড়িটার কথা বলুন।”

“সেটা আবার ওই হাউসিং এস্টেট আর উত্তরকাশীর মাঝামাঝি জায়গায়। মোটামুটি দুটো জায়গা থেকেই ইকুইডিসট্যান্ট।”

“এটা কী রকমের বাড়ি?”

“স্রেফ ইটের গাঁথনির একটা দোতলা স্ট্রাকচার। আনফিনিশ্‌ড। এমনকী ইটের ওপরে পলেস্তারাও পড়েনি। তা এই রকমের একটা বাড়ির কথাও তো আজই আমরা শুনেছি। তা-ই না?”

“থ্যাঙ্কস।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “আমি ধরেই নিয়েছিলুম যে, যে-দুটি বাড়ির কথা আপনারা আজই শুনেছেন, আর সে দুটো যে এই রাস্তার উপরেই, তাও যখন আপনারা জানেন, তখন অন্তত তাদের লোকেশনের দিকে আপনাদের খেয়াল থাকবে। কিন্তু এখন দেখছি, কিরণবাবুর খেয়াল থাকলেও সদানন্দবাবুর ছিল না। ...সদানন্দবাবু, তার শাস্তি কী জানেন?”

সদানন্দবাবু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, “না না, আমারও খেয়াল ছিল। বাড়ি দুটো আমিও দেকিচি, সে-কতা বলতুমও, তবে কিনা...ওই মানে...”

“শাস্তি হচ্ছে, আজ না হোক কাল রাত্তিরে ওই আনফিনিশড বাড়িটাতে আপনাকে একবার একা যেতে হবে।”

সদানন্দবাবু ডুকরে উঠে বললেন, “একদম একা?”

“একদম একা।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “অস্ত্র বলতে আপনার ওই খেটে-লাঠিটা অবশ্য থাকবে, ওটা দিয়ে আপনি যে-ই সেখানে থাকুক, তার নাকে এক-ঘা বসিয়ে দেবেন।”

আমি বললুম, “অবশ্য অন্ধকারে তাকে আপনি দেখতে পাবেন কি না, সেটা ঘোর সন্দেহের ব্যাপার। লাঠির সঙ্গে তাই একটা টর্চও সঙ্গে থাকা ভাল।”

আমরা যে তাঁকে নিয়ে মজা করছি, সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না সদানন্দবাবু। বললেন, “যাঃ, যতসব বেয়াড়া ঠাট্টা। কোনও মানে হয়?”

কথা বলতে-বলতে আমরা সেই পরিত্যক্ত বাড়িটার কাছে এসে পড়েছিলুম। চলন্ত ট্যাক্সি থেকে সেদিকে আঙুল তুলে ভাদুড়িমশাই বললেন, “বাড়িটা ভাল করে দেখে রাখুন সদানন্দবাবু। এখনও দিনের আলো একেবারে মিলিয়ে যায়নি, রাত্তিরে কিন্তু ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ভয় করবে না তো?”

এতক্ষণ যিনি মিনমিন করে কথা বলছিলেন, একেবারে হঠাৎই পালটে গেল তাঁর গলা। বুকে টোকা মেরে বললেন, “ভয় করবে? আমার? দেন ইউ ডোন্ট

নো সদানন্দ বোস! হা হা হা হা!"

আমার মনে হল, সদানন্দবাবু যদি পাগল না-ও হয়ে থাকেন, তো হতে আর খুব দেরি নেই। কিন্তু ভাদুড়িমশাই দেখলুম দারুণ খুশি। বললেন, "শাবাশ! ব্রেভো! এই তো চাই।"

বাদবাকি রাস্তাটা গল্পগুজব করে কাটল। হাউসিং এস্টেটের কাছেই একটা পেট্রোল পাম্প, সেখান থেকে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে তেল নিয়ে নিল ইন্দরলাল। ডুগ্গা ভ্যালিতে পৌঁছে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমরা ভিতরে ঢুকলুম না। ভাদুড়িমশাই-ই ঢুকতে দিলেন না। ইন্দরলালকে বললেন, "গেট ছাড়িয়ে গাড়িটা একেবারে পাঁচিলের শেষ অব্দি নিয়ে চলো, তারপর পাঁচিল যেখানে উত্তরে ঘুরেছে, সেখানে ডাইনে মোড় নিয়ে রাস্তা থেকে একটু নামিয়ে তোমার গাড়িকে পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড় করাও।"

তা-ই করল ইন্দরলাল। গাড়িটা এখন পাঁচিলের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। উঁচু পাঁচিল, তবু যাতে কেউ টপকাতে না পারে, তার জন্যে সেই পাঁচিলের উপরেও আদ্যন্ত টেনে নেওয়া হয়েছে ফুট-দেড়েক উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। সেটা চওড়াও অন্তত ফুটখানেক। তার উপরে একটা কাক মরে পড়ে আছে। তার পাশে তার থেকে ঝুলছে এক ফালি ব্রাউন রঙের মোটা ছিট-কাপড়।

বনেটে পা রেখে গাড়ির ছাতের উপরে উঠে পড়লেন ভাদুড়িমশাই। কাঁটাতারের বেড়াটা এখন তাঁর হাতের নাগালে। হাত বাড়ালেই সেটা তিনি ধরতে পারেন। হাতটা একবার বাড়িয়েছিলেনও। কিন্তু পরমুহূর্তেই হাতটা টেনে নিয়ে গাড়ির ছাত থেকে তিনি মাটিতে নেমে পড়লেন।

বললুম, "কী ব্যাপার, গেট দিয়েই তো ভিতরে ঢোকা যায়, তা হলে আর পাঁচিল ডিঙোবার দরকার কী?"

ভাদুড়িমশাই আমার কথার কোনও জবাব না দিয়ে সদানন্দবাবুর দিকে তাকালেন। বললেন, "আপনার লাঠিখানা সঙ্গে আছে?"

"মাথায় লোহার বল লাগানো লাঠিটা?" সদানন্দবাবু বললেন, "ওটা সব সময়েই আমার সঙ্গে থাকে।"

"ওটা দিন।"

লাঠিখানা নিয়ে ফের গাড়ির ছাতে উঠলেন ভাদুড়িমশাই। লাঠির যে দিকে রাবারের ফেরুল লাগানো থাকে, সেই দিকটা দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া থেকে ছিট-কাপড়ের টুকরোটা খসিয়ে আনলেন। তারপর গাড়িতে ঢুকে সদানন্দবাবুকে তার লাঠিখানা ফেরত দিয়ে ইন্দরলালকে বললেন, "এবারে গাড়ি ঘুরিয়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকো।"

বললুম, "লাঠির দরকার হল কেন? ছিট-কাপড়ের টুকরোটা আপনার কী কাজে লাগবে জানি না, তবে ওটা তো হাত বাড়িয়েই নিয়ে আসা যেত।"

"তা যেত।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "আর তার ফলে আমি মারাও যেতে পারতুম।"

"তার মানে?"

"মানে তো খুবই সোজা। লোহার কাঁটাতারের মধ্যে দিয়ে সম্ভবত ইলেকট্রিক কারেন্ট চালানো আছে। নইলে কাকটা ওখানে ওইভাবে মরে পড়ে থাকত না।"

গেট দিয়ে গাড়ি ভিতরে ঢুকল। পথ আটকানো কাঠের ডাণ্ডাটা তুলে নেওয়া হল। সেন্ট্রি-বক্সের লোকটি যে তার খাতা বার করেছে, তাও দেখলুম। ওর কাজ গাড়ির নম্বর আর ভিতরে ঢোকার সময় লিখে রাখা। সেটা লিখে রাখছে।

প্রায় সাড়ে আটটা। কাজের লোকেরা বিকেল-বিকেল যে যার বাড়ি চলে যায়। আজও চলে গিয়েছে। সদরের কলিং বেল বাজাতে তাই কামিনী এসে দরজা খুলে দিল। খানিকটা অনুযোগের গলায় বলল, "এত দেরি হল যে? রাজেশ ছাড়তে চাইছিল না বুঝি?"

"শুধু কি আর রাজেশের সঙ্গে দেখা করতে গেসলুম, আরও কাজ ছিল।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "সে-সব সারতে-সারতে দেরি হয়ে গেল। তা বার্টি ফিরেছে তো?"

"তোমরা বেরিয়ে যাবার খানিক বাদেই ফিরেছে।" কামিনী বলল, "ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েও নিয়েছে।.... তা তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভিতরে এসো। বার্টি তোমাদের জন্যে ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছে।"

সবাই মিলে একতলার ড্রয়িংরুমে ঢোকা গেল। ঘরের এককোণে একটা আর্ম চেয়ার। সেখানে ল্যাম্প স্ট্যান্ডের তলায় বসে যিনি একটা বই পড়ছিলেন, তিনিই যে ড. হারবার্ট রাসেল, সেটা বুঝে নিলুম। ভদ্রলোক আমাদের ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়ে বই থেকে চোখ তুলেই আরাম-কেদারা থেকে উঠে পড়েছিলেন, এবারে এগিয়ে এসে ভাদুড়িমশাইয়ের দু'হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে বললেন, "ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম! তা কাণ্ড দ্যাখো, আঙ্কল, আমরাই তোমাকে এখানে ডেকে আনলুম, অথচ তোমরা যখন এলে, তখন আমিই বাড়িতে ছিলুম না! হোঅট আ শেম!"

পরক্ষণেই আমার ও সদানন্দবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, "আমি বার্টি, আর আপনাদের পরিচয় আমি মিনির কাছে পেয়েছি, সো য়ু ডোন্ট হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলভস।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তোমার রুগিদের খবর কী?"

"গ্রামে একটা উৎসব ছিল," বার্টি বলল, "আর জানেনই তো, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া কোনও উৎসবই হয় না, তো তারই থেকে ফুড-পয়জনিং। যা-ই হোক, সময়মতো খবর পেয়েছিলুম তাই রক্ষে, একজন বাদে বাকি সবাই এ-যাত্রা বেঁচে

গেছে।"

"তোমার খুব ধকল গেল!"

"ও কিছু না," বার্টি হেসে বলল, "বাড়িতে ফিরে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়েছি, বাস্, ধকল তাতেই কেটে গেছে।..... তা আপনাদের জন্যে একটু কফির ব্যবস্থা করি?"

কামিনী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "এখন কফি? পাগলামি কোরো না, ন'টা বাজতে চলল, খাবারগুলো গরম করে এখুনি তোমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করছি।"

ঘর থেকে কামিনী বেরিয়ে গেল।

ডিনারের ডাক পড়ল মিনিট দশেক পরেই।

ডাইনিং রুমে ঢুকে ভাদুড়িমশাই বললেন, "বাইরে থেকে ঘুরে এসেছি। উপরে গিয়ে জামাকাপড় পালটে এলে হত না?"

কামিনী বলল, "খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আঙ্কল। এখানেই বেসিনে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে যাও।"

তা-ই বসতে হল। খেতে বসে ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওরে মিনি, যেমন লাঞ্চ তেমন ডিনারের আগে তুই তো সেই টনিকটা খাস। সেটা খাবি না?"

"সেটা তো তোমার কাছে। বেরোবার আগে তো আর সেটা আমাকে দিয়ে যাওনি। নিজে খাওয়ার পরে বোধহয় তোমার ঘরেই রেখে দিয়েছ।"

"তা-ই হবে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "বুড়ো হয়েছি তো, অনেক দরকারি কথাও আজকাল দেখছি ভুলে যাই। যাক গে, স্বাদটা যখন ভাল লাগছিল না, তখন আর ওটা খাবার দরকার নেই, তোর জন্যে একটা নতুন বোতল নিয়ে এসেছি। এই দ্যাখ!"

বিগ শপারটা হাতে ঝুলিয়েই ডাইনিং রুমে ঢুকেছিলেন ভাদুড়িমশাই, এবারে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বোতলটা বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন।

কামিনী বলল, "আরে, এটা তো একই টনিক—এনার্জি প্লাস।"

"রাইট। কিন্তু টনিকটা এক হলেও স্বাদটা আলাদা। এনার্জি প্লাস আসলে অনেক স্বাদের হয়। এটা অরেঞ্জ ফ্লেভার্ড। খেয়ে দ্যাখ, খারাপ লাগবে না।"

বার্টিকে দিয়ে বোতলের মুখ খুলিয়ে একটা কাপে দু'চামচ ঢেলে তক্ষুনি খেয়ে নিল কামিনী। তারপর ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে বলল, "চমৎকার! থ্যাঙ্ক ইউ অ্যাঙ্কল। তা এটা কিনলে কোথায়?"

"কেন, উত্তরকাশীতে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "দাঁড়া, উত্তরকাশী থেকে তোর জন্যে আর-একটা জিনিসও এনেছি।"

বলে, ফের সেই ঝোলার মধ্যে হাত ঢোকালেন। এবারে বার হল সোনালি র‍্যাপিং পেপারে জরির ফিতে দিয়ে মোড়া একটা প্যাকেট।

কামিনী বলল, "কী আছে ওর মধ্যে?"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "উত্তরকাশীর বিখ্যাত মিঠাইওয়ালা গয়াপ্রসাদের কালাকাঁদ। রাজেশ তোর জন্যে পাঠিয়েছে। তার ছেলেবেলার মিনিদিদির কথা সে ভোলেনি।"

বার্টি বলল, "আপনারা যে রাজেশের কাছে গিয়েছিলেন, সে-কথা মিনির কাছে শুনেছি। তা ওকে একদিন আসতে বললেই তো হয়।.... আপনার কাছে ওর ফোন নাম্বার আছে আঙ্কল?"

"কেন, ওর সঙ্গে কথা বলবে?"

"আমি কথা না-বলে বরং মিনি বলুক।" বার্টি বলল, "মিনি, তুমিই ওকে ফোন করে বলে দাও যে, পরশু রবিবার সকালেই যদি ও চলে আসে তো আমরা ভারী খুশি হব। সারাটা দিন আমাদের সঙ্গে কাটাক, তারপরে বিকেলে আবার উত্তরকাশীতে ফিরে যাবে।"

কামিনী বলল, "আসতে যে বলব, তুমি সেদিন বাড়িতে থাকতে পারবে তো? তুমি হোস্ট, সেটা ভুলে যেয়ো না। কাউকে আসতে বলে তারপর নিজেই যদি বাড়িতে না থাকো, তো সে ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," বার্টি বলল, "আমি সেদিন বাড়িতেই থাকব। আরে বাবা, ডাক্তাররাও তো মানুষ, তাদেরও তো এক-আধদিন বাড়িতে থাকার দরকার হতে পারে, তাদেরও তো অসুখ-বিসুখ হয়, নাকি হয় না?"

কামিনী বলেছিল, বার্টির বয়েস এখন পঞ্চাশ। চেহারা দেখে কিন্তু আর-একটু কম বলে মনে হয়। টাক পড়েছে, এটাও বাজে কথা। তবে হ্যাঁ, মাথার সামনের দিকের চুল খানিকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে। টুথব্রাশ গোঁফ, দাড়ি নেই। থুতনিতে গোটিটা, ওই যাকে ছাগল-দাড়ি বলে আর কী, চোখে পড়ার মতো। ড্রয়িং রুমে ঢুকে চোখে চশমা দেখেছিলুম, আমরা ঘরে ঢুকতেই বার্টি সেটা খুলে রাখে। তার মানে প্লাস পাওয়ারের চশমা, বই পড়ার সময় কি কাগজপত্রে চোখ বুলোবার সময় ওটার দরকার হয়, অন্য সময়ে হয় না। যেমন এখন ওর চোখে চশমা নেই। চোখের মণির রং আশ্চর্য নীল। মুখে সব সময়েই একটু হাসি লেগে আছে। কথাবার্তা শুনে মনে হয়, মানুষটি খোলামেলা ধরনের। এটাও মনে হল যে, তিন-তিনবার ভুল করার পরে কামিনী অন্তত এইবার কোনও ভুল করেনি, সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য একজন মানুষকে সে তার জীবনসঙ্গী হিসেবে খুঁজে পেয়েছে।

খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল সাড়ে ন'টার মধ্যেই। কিন্তু গল্প যেন আর শেষ হতে চাইছিল না। বাঙ্গালোরের গল্প। কামিনীর বাবা আর মায়ের গল্প। কামিনীর ছেলেবেলার গল্প। তার ছবি আঁকা আর সরোদ শেখার গল্প। রাজেশদের পরিবার আর কামিনীদের পরিবারের মধুর সম্পর্কের গল্প। গল্পে হঠাৎ ছেদ পড়ল ভাদুড়িমশাইয়ের কথায়। "ওরে বাবা, এ যে সাড়ে দশটা বাজে! ওহে বার্টি, পরশু

রোববার সকালে তো রাজেশ এখানে আসবে, তুমিও সারাদিন তাই বাড়িতেই থাকছ, তাই না?"

বার্টি হেসে বলল, "সে তো থাকতেই হবে।"

"আর কাল?"

"কাল সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট করেই রোগী দেখতে যাব। এখানকারই একটা পাহাড়ি বস্তিতে। ফিরতে-ফিরতে বারোটা-একটা। ইট'স আ ক্রাউডেড ডে।"

"তা হলে আর একটিও কথা না বলে শুয়ে পড়ো গিয়ে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "বিকেলে ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়েছ বটে, কিন্তু গতকাল থেকে যা খাটাখাটনি গেছে, তার ধকল তাতে কাটেনি। এখন আর গল্প না করে উঠে পড়ো। য়ু নিড রেস্ট।"

বার্টিকে সত্যিই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সে আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ল।

ফোনটা বাজল তার মিনিট দশেক বাদে। আমরা তখনও ডাইনিং রুমে বসে গল্প করছি। কামিনী বলল, "তোমরা বোসো আঙ্কল, বার্টি সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে, আমিই ড্রয়িং রুমে গিয়ে লাইনটা নিয়ে নিচ্ছি।" কথাটা বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল মিনিট পাঁচেক বাদেই। ভাদুড়িমশাই বললেন, "নিশ্চয় কোনও রুগির ফোন? বার্টিকে এখন আবার ঘুম থেকে উঠে বেরুতে হবে নাকি?"

কামিনী কোনও উত্তর দিল না। একটা পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে রইল। দেখে মনে হল, তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে।

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কী রে, কী হল? কথা বলছিস না কেন? কার ফোন?"

এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরল কামিনীর। শুকনো ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "সেই লোকটার।"

"কোন লোকটার? যার কথায় ভয় পেয়ে তুই নেকলেসটা দিয়ে দিয়েছিস?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখন আবার আমার যে একটা মুক্তোর মালা আছে, সেটা চাইছে! বলছে যে, কাল রাত্তিরেই কাউকে দিয়ে পাঠাতে হবে! সেই একই জায়গায়!"

ভাদুড়িমশাই মৃদু হাসলেন। বললেন, "এতে এত অবাক হচ্ছিস কেন?"

"হব না? ও তো এর পরে আরও চাইবে!"

"চাইতেই পারে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "যারা ব্ল্যাকমেল করে, শিকারকে তারা সহজে ছাড়ে না। এ-লোকটাও তোকে সহজে ছাড়বে না, মিনি! ক্রমাগত ভয় দেখিয়ে তোর সর্বস্ব লুঠ করবে!"

"তা হলে কী করব আমি এখন? ওর কথা মতো কাজ না-করলে তো ছবিগুলো বার্টির কাছে পাঠিয়ে দেবে! তা হলে যে কী কাণ্ড হবে, তা তো ভাবতেই আমার হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছে! বার্টিকে সব খুলে বলব?"

ভাদুড়িমশাই আবার মৃদু হাসলেন। বললেন, "বলা উচিত ছিল প্রথম যখন

ওই কদর্য ফোটোগুলো আর ওই চিঠিটা পেয়েছিলি, তখনই। তা যখন বলিসনি, তখন এবারেও বলিস না।''

''এবারে তা হলে কী করব?''

''প্রথমবারে যা করেছিলি, এবারেও তা-ই করবি। মুক্তোর মালাটা পাঠিয়ে দিবি।''

''ওগুলো কালচার্ড পার্ল নয়, আঙ্কল!'' কামিনী ডুকরে উঠে বলল, ''খাঁটি মুক্তো!''

''তা হোক।'' ভাদুড়িমশাই তাঁর মুখের হাসিটা ধরে রেখে নির্বিকার গলায় বললেন, ''চেয়েছে যখন, তখন পাঠিয়েই দে!''

।। ৯ ।।

আজ চৌঠা মে, শনিবার। কাল রাতে মন চঞ্চল ছিল, তাই ঘুম আসতে দেরি হয়। আজ অবশ্য সকাল-সকালই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। চোখমুখ ধুয়ে চা খেয়ে, ডুগ্গা ভ্যালির এই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই এক চক্কর ঘুরেও এলুম। বার্টি আজ সাড়ে সাতটার মধ্যেই ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছে, দুখনকে সঙ্গে করে আটটা নাগাদ সে তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়েও গেল। কাছেই একটা পাহাড়ি বস্তিতে গিয়ে রোগী দেখবে, বারোটা সাড়ে-বারোটার আগে ফিরবে না।

উপরে উঠে ভাদুড়িমশাইয়ের ঘরে গিয়ে তাঁকে পেলুম না। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখলুম, সেখানে বসে তিনি কামিনীর সঙ্গে কথা বলছেন। পাশে বসে আছেন সদানন্দবাবু। আমাকে দেখে ভাদুড়িমশাই বললেন, ''আসুন কিরণবাবু। আপনার খোঁজ করেছিলুম, শুনলুম আপনি বাইরে বেরিয়েছেন। মিনিট পাঁচেক আগে আবার ফোন করেছিল সে।''

বললুম, ''সে মানে কে? সেই লোকটা, যে কাল রাতে ফোন করেছিল?''

কামিনী বলল, ''হ্যাঁ। ফোন করে হুমকি দিয়ে মনে করিয়ে দিল যে, মুক্তোর মালাটা তার আজই চাই। কাউকে দিয়ে যেন সেটা পাঠাবার ব্যবস্থা করি। যাকেই পাঠাই, সে যেন ঠিক সেখানেই মালাটা রেখে আসে।''

''কখন রেখে আসবে, তাও বলল নাকি?''

''হ্যাঁ, আগের বারের মতো রাত ঠিক আটটায়।''

ভাদুড়িমশাই বললেন, ''মুক্তোর মালার কেসটা সেই আগের মতোই প্যাক করে রেখেছিস তো?''

''কাল রাত্তিরেই উপরে উঠে প্যাক করে রেখেছি। বার্টি অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, কিচ্ছু টের পায়নি।''

''পাঠাবি কাকে দিয়ে?''

"আগের বারে তো লিজাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলুম।"

"এবারেও তা হলে তাকে দিয়েই পাঠা। ....নাকি তাতে কোনও অসুবিধে আছে?"

"নেই বলি কী করে?" কামিনী একটু ইতস্তত করে বলল, "সে-বারে তো এককথায় রাজি হয়নি, প্রথমটায় সরাসরি 'না'-ই বলে দিয়েছিল।"

"সে তো ওর নাইট-ডিউটির জন্যে।"

"হ্যাঁ, বলেছিল যে, প্যাকেটটা যেখানে পৌঁছে দিতে হবে, সেই জায়গাটা ওর বাড়ির থেকে তেমন কিছু দূরে নয় ঠিকই, তবে কিনা রাত আটটায় যদি সেখানে যেতে হয় তো হাসপাতালে পৌঁছতে ওর দেরি হয়ে যাবে।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল ঠিকই।"

"তা হয়েছিল," কামিনী বলল, "কিন্তু এবারেও যে রাজি হবে, তা কী করে বলি?"

"আহা, একবার অনুরোধ করেই দ্যাখ না," ভাদুড়িমশাই বললেন, "তোরই কাছে শুনেছি যে, নম্র স্বভাবের সফ্‌ট-স্পোকন মেয়ে, তাই অসুবিধে একটু আছে ঠিকই, তবু জাস্ট টু প্লিজ ইউ, রাজি হয়তো হয়েও যেতে পারে। অ্যাট লিস্ট দেয়ার'স নো হার্ম ইন আস্কিং। তা-ই না?"

"আর যদি রাজি না হয়?" কামিনী বলল, "তখন কী করব? বাড়ির কাজের লোকেদের তো আর অনুরোধ করা যায় না, পাঁচকান হবে। তা ছাড়া, ওরা কেউ রাজি হবে বলে মনেও হয় না। যা ওদের ভূতের ভয়!"

"ঠিক আছে," ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, " লিজা যদি রাজি না হয় তো সদানন্দবাবুই কাজটা করে দেবেন। কী সদানন্দবাবু, আপনি রাজি তো?"

সদানন্দবাবুর যে ভিতরে-ভিতরে এত সাহস, সেটা জানতুম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, "অফ কোর্স! কুছ পরোয়া নেই ম্যাডাম, আমি যাব।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তবে তো গোল মিটেই গেল। তবে হ্যাঁ, লিজাকে একবার অনুরোধ করেই দ্যাখ না। তার তো কালই আসার কথা ছিল। কিন্তু আসেনি। তবে আজ আসবে। তা-ই তো?"

"হ্যাঁ।"

"কখন আসবে?"

"ঠিক দশটায়।" কামিনী বলল, "নিজের স্কুটারে আসে, একদিনও দেরি করে না।"

ভাদুড়িমশাই তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওরেব্বাস, এখন তো সাড়ে ন'টা। তা হলে ব্রেকফাস্ট করবি কখন? চল্ চল্, নীচে যাই, লিজা আসার আগে ব্রেকফাস্টটা করে নে!"

"যেদিন মাসাজ থাকে, সেদিন আর আমি ব্রেকফাস্ট করি না।" কামিনী বলল, "সকালে এক গ্লাস দুধ খেয়ে নিয়েছি, ওতেই হবে।"

"ঠিক আছে," ভাদুড়িমশাই বললেন, "তুই যখন ব্রেকফাস্ট করবি না, তখন আমাদেরও কিছু তাড়া নেই। লিজা এলে তখন আমরা নীচে নামব। ইতিমধ্যে একটা কথা মনে করিয়ে দিই। লিজা তো এক ঘণ্টা এখানে থাকে, দশটায় এসে এগারোটায় চলে যায়। তা-ই না?"

"হ্যাঁ।"

"তা আজ যখন ফিরে যাবে, তখন ওকে রিকোয়েস্টটা করতে ভুলিস না কিন্তু।"

"তা করব। তবে রাজি হবে কি না, সন্দেহ আছে।"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "রাজি না-হলেও তো সমস্যা হচ্ছে না। ইন দ্যাট কেস আমাদের সদানন্দবাবু তো আছেনই। তোর ওই প্যাকেটটা তিনিই যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন।"

শব্দ শুনে বুঝেছিলুম, একটা মোটর-বাইক এই হাউসিং কমপ্লেক্সের ভিতরে এসে ঢুকেছে। সেকেন্ড কয়েক বাদেই একতলার সদর-দরজার বেল বেজে উঠল। তারও একটু পরে দোতলার কাজের লোকটি এসে জানাল, মেমসাব এসে গেছেন। কামিনী বলল, "মেমসাবকে উপরে নিয়ে আয়।"

ভাদুড়িমশাই উঠে পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলুন, আপনাদের ঘরে গিয়ে বসা যাক। ওটা একটু দূরে। ওখানে কথা বললে এখান থেকে শোনা যাবে না।"

লিজা ওয়েভার্লি দোতলায় ওঠার আগেই আমরা আমাদের ঘরে চলে এলুম। অর্জুন আমাদের ঘরের সামনের ছাতে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে বলল, "খোকি তো আজ নাস্তা খাবে না, আপনারা কি নীচে গিয়ে নাস্তা খাবেন, নাকি উপরে পাঠিয়ে দেব?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "নীচেই যাব, তবে এখন নয়। আধঘণ্টা বাদে যাব।"

অর্জুন নীচে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে ভাদুড়িমশাই জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে তাঁর সেলফোন বার করে বললেন, "আপনারা গল্প করুন, এখন আমি পরপর কয়েকটা ফোন করব।"

দু'তরফা কথা শোনার তো উপায় নেই, একমাত্র ভাদুড়িমশাইয়ের কথাই আমরা শুনতে পাচ্ছি। সেই একতরফা কথা এই রকম :

"আমি চারু ভাদুড়ি কথা বলছি। সব ঠিক আছে তো?.... ভেরি গুড। রিপোর্টটা কখন পাওয়া যাবে?...ঠিক আছে, তা হলেই হবে। পরের কাজটাই সবচেয়ে জরুরি।

ছ'টা নাগাদ বাচ্চাটাকে তুলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিজের কাছে নয়, এস. পি.-র বাড়িতে।.....সব বাচ্চাই চকোলেট ভালবাসে, তাই প্রচুর চকোলেট সঙ্গে থাকা দরকার।....তাও বলে দিতে হবে? জাস্ট টেল হিম দ্যাট য়ু আর টেকিং হিম টু আ চকোলেট ফ্যাক্টরি। সার্কাস দেখাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বললে বোধহয় আরও ভাল। ওভার।''

ফোন অফ করেই ফের চালু করলেন ভাদুড়িমশাই। ডায়াল করে যার সঙ্গে কথা বললেন, তার দিকের কথা শুনতে পাবার প্রশ্নই নেই। একতরফা কথা যা শুনলুম, তা এই:

''হ্যালো, আমি ফাইভ জিরো ডাবল এইট কথা বলছি... অত 'স্যার স্যার' কোরো না, যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও। উত্তরকাশীর এস. পি.-র সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে?....নেই? তা হলে তোমাদের মধ্যে যে তাঁকে চেনে, মিনিট দশেকের মধ্যে তাকে আমার মোবাইল নাম্বারে ফোন করতে বলো। দিস ইজ ভেরি ভেরি আর্জেন্ট। ওভার।''

ফোনটা আবার অফ করে দিলেন ভাদুড়িমশাই। আমি আমার হাতঘড়ির দিকে চোখ রেখেছিলুম। দেখলুম সেটা বেজে উঠল ঠিক সাত মিনিট বাদে। যন্ত্রটা তুলে ভাদুড়িমশাই বললেন :

'ইয়েস, দিস ইজ ফাইভ জিরো ডাবল এইট....তুমি ওঁকে চেনো তা হলে? ...ভেরি গুড। ওঁকে ফোন করে আমার পরিচয় দাও, তারপর বলো যে, বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আমার চিঠি নিয়ে একজন লোক আজ ওঁর কাছে যাবে, উনি যেন দু'জন কনস্টেবলকে তার সঙ্গে দিয়ে দেন। ....না, উর্দি-পরা কনস্টেবল নয়, প্লেন-ড্রেস পোলিসম্যান। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে যেন আইডেন্টিটি কার্ড থাকে। ....যদি রাজি না হন? ঠিক আছে, তা হলে ভয় দেখাবে; বলবে যে, আমি সেক্ষেত্রে ওঁর উপরওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে হ্যাঁ, একই সঙ্গে এটাও বোলো যে, সেরকম না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।...কী বলছ, তার দরকার হবে না? ভাল। তা হলে আর দেরি কোরো না, সাড়ে দশটা বাজে, এখুনি ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে নাও, তারপর আমাকে জানাও যে, কী হল। ওভার।''

সেলফোন অফ করে পকেটে পুরলেন ভাদুড়িমশাই। দরজায় টোকা মারার শব্দ হল। খুলে দেখি এ-বাড়ির একতলার কাজের লোক যোগীশ্বর দাঁড়িয়ে আছে। বলল, ''নাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা কি নীচে যাবেন? যদি বলেন তো উপরেও দিয়ে যেতে পারি।''

ভাদুড়িমশাইকে বললুম। ''উপরে দিয়ে যেতে বলব?''

''দরকার কী।'' ভাদুড়িমশাই বললেন, ''আধঘন্টার মধ্যে কেউ ফোন করবে বলে মনে হয় না। চলুন, নীচেই যাওয়া যাক।''

নীচে নেমে ডাইনিং রুমে ঢুকলুম। অর্জুন একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বলল,

“একটা মুশকিল হয়ে গেছে। দুকানে ডবল রুটি পাইনি।”

সদানন্দবাবু বললেন, “সেটা আবার কী?”

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “ব্রেড। পাউরুটি।” তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাতে মুশকিলটা কী হল?”

“টোস্ট হল না।” অর্জুন বলল, “তাই আজ পুরি করেছি।”

বললুম, “বেশ করেছ। রোজ-রোজ পাউরুটি চিবোতে কি ভাল লাগে? যে ক'টা দিন আছি, সকালে আমাদের জন্যে পুরিই কোরো।”

পুরির সঙ্গে আলুভাজা আর কুমড়োর ছোকা ছিল। আর ছিল রাজেশের পাঠানো কালাকাঁদ। চটপট ব্রেকফাস্ট করে আমরা উপরে উঠে এলুম। তার মিনিট খানেক বাদেই ভাদুড়িমশাইয়ের মোবাইল জানান দিল যে, মেসেজ আছে।

আবার সেই একতরফা কথা। ভাদুড়িমশাই যা বললেন, সেটা এই;

“ফাইভ জিরো ডাবল এইট।...হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলে যাও।....আমাকে উনি চিনতে পেরেছেন? ভাল।....আমার লোক গিয়ে দেখা করলেই তার সঙ্গে যাবার জন্য সাদা পোশাকের দু'জন কনস্টেবল দিয়ে দেবেন?...ভেরি গুড। তুমি আপাতত অফিসেই থাকো, মানে আবার হয়তো তোমার সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে। ওভার।”

ফোনটা আবার পকেটে ঢোকালেন ভাদুড়িমশাই। হাতঘড়ি দেখে মৃদু হেসে বললেন, “সো ফার সো গুড। কিন্তু সওয়া এগারোটা বাজে, মিনি তার ঘর থেকে বেরোচ্ছে না কেন? দরজাটা খুলে রাখুন তো।”

সদানন্দবাবু বললেন, “লিজা চলে না গেলে বেরোবেন কী করে?”

আমি বললুম, “কিন্তু তার তো এতক্ষণে চলে যাবার কথা।”

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কানে এল স্কুটার স্টার্ট করার শব্দ। সদানন্দবাবু বললেন, “ওই গেল বোধহয়। মিসেস রাসেলের রিকোয়েস্টে রাজি হল কি না, কে জানে!”

আমি বললুম, “রাজি না-হলে তো আপনিই আছেন। প্যাকেটটা ক্যারি করে আপনিই যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন।

“তা তো দেবই। রাত আটটাতেই দেব। কতা যখন একবার দিইছি, তখন সেটা রাকতেই হবে। তাতে মরি তো মরব। শুধু একটা কতা। যদি মরি তো আমার উইডোকে দয়া করে দেকবেন।”

সদানন্দবাবুর গলাটা কি শেষের দিকে একটু কেঁপে গেল? সম্ভবত এতক্ষণে ভদ্রলোক বুঝেছেন যে, দায়িত্বটা কঠিন, ঘাড় পেতে সেটা নেওয়াটা খুব সুবুদ্ধির কাজ হয়নি।

ভাদুড়িমশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি মুখ খোলার আগেই কামিনী এসে ঘরে ঢুকল। বলল, “তোমরা ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছ তো?”

“তা করেছি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু ও-সব কথা ছেড়ে এখন কাজের

কথায় আয়। লিজাকে রিকোয়েস্ট করেছিলি?"

"করেছি।" কামিনী বলল, "ও রাজিও হয়েছে। কিন্তু প্যাকেটটা নিয়ে গেল না।"

"তার মানে? নিল না কেন?"

"প্রথমে তো প্যাকেটটা পৌঁছে দিতে রাজিই হচ্ছিল না। নাকি আজ দু'বেলাতেই ওকে দু'দুটো জায়গায় নেমন্তন্নে যেতে হবে, তাই আটটার সময় অন্য কোথাও যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। শেষে অনেক সাধ্যসাধনা করতে বলল, ঠিক আছে, রাত্তিরের নেমন্তন্নটায় নাহয় যাবে না, কিন্তু এ-বেলার নেমন্তন্নটা না রেখে উপায় নেই। ওর এক বন্ধুর মেয়ের জন্মদিন, লাঞ্চের নেমন্তন্ন, অথচ উপহার হিসেবে ও শুধু একটা পুতুল নিয়ে যাচ্ছে, এখন এই বইয়ের প্যাকেটটাও যদি সঙ্গে নিয়ে যায়, তা হলে এটাকেও ওরা হয়তো একটা উপহার বলে ভাববে, অথচ এটা তো ও দিতে পারবে না, সে ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। প্যাকেটটা তাই এখনই নিতে রাজি হল না।"

"তা হলে কখন নেবে?"

"সাতটার আগে নয়।" কামিনী বলল, "সাড়ে-সাতটাও হতে পারে। এখান থেকে যদি পশ্চিম দিকে যাও তা হলে ধরাসু বলে একটা জায়গা পড়বে, জানো তো?"

"তা জানি।"

"অত দূর না-হলেও ওরই কাছাকাছি ঠিক এই রকমেরই একটা বসতি গড়ে উঠেছে। জায়গাটার নাম ডুলুং ভ্যালি। সেখানেই নাকি ওর বন্ধুর বাড়ি। দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন, তাই এখান থেকে সরাসরি ও এখন সেখানেই যাবে। রাত্তিরের নেমন্তন্নটা তো স্কিপ করছে, তাই বিকেল অব্দি থাকবে ডুলুং ভ্যালিতেই। তারপর বাড়িতে ফেরার পথে সাতটা নাগাদ আমাদের বাড়ি থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে আটটার সময় যেখানে এটা পৌঁছে দেবার কথা সেখানে পৌঁছে দিয়ে হসপিটালে চলে যাবে নাইট ডিউটি দিতে।"

"বাব্বা, এরা পারেও বটে!" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "তা তুই এখন কী করবি?"

কামিনী বলল, "বারোটা বাজতে চলল, বার্টি একটু বাদেই ফিরবে, আমি স্নান করে নিচ্ছি, তোমরাও স্নান সেরে নাও, তারপর বার্টি এলে সবাই মিলে এক সঙ্গে খেতে বসব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কামিনী। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "একটা কথা বলা হয়নি। বার্টি এর মধ্যে ফোন করেছিল। বলল যে, খেয়ে একটু বিশ্রাম করে ফের বেরোতে হবে ওকে।...কী জানো আঙ্কল, কাল তো সারাদিন বেরোবে না, তাই কাল যেসব রুগিকে দেখার কথা ছিল আজই তাদের যতজনকে

পারে দেখে আসবে।"

শুনে লিজার ব্যাপারে একটু আগেই যা বলেছিলেন, বার্টির ব্যাপারেও সেই একই মন্তব্য করলেন ভাদুড়িমশাই। "বাব্বা, এরা পারেও বটে!"

সদানন্দবাবু বললেন, "যা শুনলুম, তাতে তো মনে হচ্চে লিজাই সাতটা নাগাদ এখেনে এসে প্যাকেটটা নিয়ে যাবে। তা হলে আর আমাকে ওটা নিয়ে যেতে হচ্চে না, কেমন?"

আমি বললুম, "তাতে তো আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মশাই! যা ভয় পেয়েছিলেন!"

"মোটেই ভয় পাইনি!" সদানন্দবাবু ফুঁসে উঠে বললেন, "আমি তো যাবার জন্যে তৈরিই ছিলুম।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "থাক থাক, আর বীরত্ব ফলাতে হবে না। আপনি খুব ভালই জানেন যে, আমিই আপনাকে যেতে দিতুম না। দরকার হলে আমি নিজেই যেতুম। আর তা ছাড়া, কেউই ওই প্যাকেট নিয়ে ওখানে যাবে কি না, তাতেও আমার সন্দেহ আছে।"

এই শেষের কথাটা কেন বললেন, তা আর ব্যাখ্যা করলেন না ভাদুড়িমশাই। পকেট থেকে সেলফোন বার করে ডায়াল করতে বসলেন। যাঁকে ডাকলেন, তার উত্তর পাওয়ার পর একতরফা তাকে যা বললেন, তা এই :

"আমি চারু ভাদুড়ি কথা বলছি। বাচ্চার মা এখন বাইরে। সম্ভবত সাড়ে-সাতটা আটটা পর্যন্ত বাইরেই থাকবে। বাচ্চাকে তুলে আনার কাজটা তার ফলে সহজ হয়ে গেল। এস. পি.-র সঙ্গে দেখা করলে তিনি দুজন প্লেন-ড্রেসের পুলিশ সঙ্গে দেবেন। বাচ্চাকে তুলে এনে নিজের কাছে রাখা উচিত হবে না, এস. পি.-র আপিসে জমা দিতে হবে। ক্লিয়ার?....গুড। তা যে রিপোর্টের কথা বলেছিলুম, সেটা কখন পাওয়া যাবে?...অ্যাঁ, পাওয়া গেছে? ...তা-ই? আমি ঠিক এই সন্দেহই করেছিলুম। ওভার।"

সেলফোন পকেটে পুরে ভাদুড়িমশাই বললেন, "এ কী, আপনারা বসে আছেন কেন? স্নান করে নিন। আমি আমার ঘরে চললুম।"

আর কোনও কথা না বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বার্টি বলেছিল বারোটা সাড়ে-বারোটায় ফিরবে, ফিরল একটারও খানিক পরে। কাঁচুমাচু মুখে বলল, "সরি আঙ্কল, এত রোগী দেখতে হবে ভাবিনি, একটু দেরি হয়ে গেল।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "সে আর কী করা যাবে, এখন পোশাক পালটে নীচে নেমে খাওয়ার পাট চুকিয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। বিকেলে তো ফের রুগি দেখতে যাবে শুনলুম।"

লাঞ্চের ঘণ্টা বাজল দেড়টায়। খাওয়ার পাট চুকতে-চুকতে আড়াইটে। তারপরে

আর গুজগুজব বিশেষ হল না। আমরা উপরে চলে এলুম। ভাদুড়িমশাই আর আমাদের ঘরে এলেন না, নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। খাওয়ার টেবিলে খুব একটা কথা বলেননি, উপরে এসেও আমাদের কিছু বললেন না। মনে হল, নিজের ঘরে গিয়ে এখন বোধহয় আরও গোটাকয়েক ফোন করবেন।

আমাদের ঘরে ঢুকে সদানন্দবাবু আর দেরি করলেন না, বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুমিয়েও পড়লেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। তার দুটো কারণ। এক, গুরুভোজন। দুই, প্যাকেটটা রাত আটটার সময়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। আমার ঘুম এল না। কলকাতা থেকে একটা থ্রিলার সঙ্গে করে এনেছিলুম, সেটা পড়তে শুরু করেছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

দরজা খুলে দেখি, ভাদুড়িমশাই। বললেন, "আমি একটা জরুরি কলের জন্যে অপেক্ষা করছি, নীচে নামা সম্ভব নয়। আপনি একতলায় গিয়ে ইন্দরলালকে বলে আসুন, সে যেন বিকেলে কোথাও না যায়, আর ট্যাক্সিটাও যেন তৈরি থাকে। সন্ধে নাগাদ আমরা বেরোব।"

কথা শেষ করে তিনি আর দাঁড়ালেন না, নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমি নীচে নেমে ইন্দরলালকে যা বলার বলে আবার দোতলায় উঠে এলুম। থ্রিলারটা আবার পড়তে শুরু করেছিলুম, কিন্তু মন বসল না। বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম। যে বাচ্চাটিকে তার বাড়ি থেকে তোলার কথা শুনেছি, সে কে? তাকে আদৌ তোলা হবে কেন? রিপোর্টই বা কীসের? কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। শুধু এইটুকু আন্দাজ করতে পারছি যে, কামিনীর ব্যাপারটা এখন ক্রমেই আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে।

বার্টির বাড়িটা চমৎকার, কিন্তু গাড়িটা লজঝড়। স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করার সময় বিকট শব্দ করে। শব্দটা আমি চিনে রেখেছি। কানে আসতে ঘড়ির দিকে তাকালুম। সাড়ে চারটে। বার্টি তার গাড়ি নিয়ে পাহাড়ি বস্তিতে চলে গেল। রোগী দেখার কাজ শেষ করে, তাদের ওষুধপত্তর দিয়ে কখন বাড়ি ফিরবে কে জানে।

একটু বাদেই ঘরে ঢুকলেন ভাদুড়িমশাই। বললেন, "একজনকে ফোন করা দরকার। ও ঘর থেকে করতে পারছি না। ঘর সাফাই হচ্ছে, বিছানা-বালিশের চাদর-ওয়াড় পালটানো হচ্ছে। তার মধ্যে ফোন করা যায়?"

হেসে বললুম, "বেশ তো, তা হলে এখান থেকেই করুন।"

পকেট থেকে সেলফোন বার করলেন ভাদুড়িমশাই। ডায়াল করলেন। তারপর প্রায় মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললেন :

"আমি ভাদুড়ি বলছি। ফোন ধরতে এত দেরি হয় কেন?...এস. পি.-র সঙ্গে দেখা হল? ...দুজন লোক দিয়েছে? ...ভাল। দুজনই সঙ্গে যাক, তবে ফেরার সময় দুজনের একজনকে ওখানে রেখে আসতে হবে। ...হ্যাঁ, আমার দরকার হতে পারে।

আর কিছু জানার আছে?...নেই? তা হলে আর দেরি না করে কাজে বেরিয়ে পড়া ভাল। ওভার।"

ফোন পকেটে পুরে বললেন, "পাঁচটা বাজে। সদানন্দবাবু ঘুমোচ্ছেন দেখছি। ঘুমোতে দিন। তবে হ্যাঁ, ছ'টার সময় তুলে দেবেন। সাড়ে ছ'টার মধ্যে আপনাদের রেডি হয়ে নেওয়া চাই। যদি অবশ্য আমার সঙ্গে যেতে চান।"

বললুম, "রেডি হয়ে থাকব অবশ্যই। আপনার সঙ্গে যাবও। কিন্তু আপনি যাবেনটা কোথায়?"

"সঙ্গে যখন যাচ্ছেন, তখন যথাসময়ে সেটা জানতে পারবেন।"

"রওনা হবেন ওই সাড়ে ছ'টাতেই?"

"সেটাই নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না।" ভাদুড়িমশাই রহস্যময় হেসে বললেন, "আপাতত শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, সম্ভবত সাড়ে ছ'টার আগে নয়, ওদিকে সাড়ে সাতটার পরে নয়।...ও হ্যাঁ, ইন্দরলালকে গাড়ি তৈরি রাখতে বলেছেন তো?"

"তখনই বলে এসেছি। গাড়ি তৈরি থাকবে।"

"তা হলে এখন যাই। ঘরে বসে চুপচাপ একটা প্ল্যান ছকে নিতে হবে। আশা করি, আমার ঘর গোছাবার কাজ এতক্ষণে শেষ হয়েছে।"

ভাদুড়িমশাই আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার আমার অর্ধসমাপ্ত থ্রিলারের পাতা ওলটাতে শুরু করলুম। কিন্তু এবারেও তাতে মন বসল না। বুঝতে পারছিলুম, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কিন্তু সেটা যে কী, তা বুঝে উঠতে পারছিলুম না। তার ফলে একটু অস্থির-অস্থির বোধ করছিলুম। ভাবছিলুম যে, ভাদুড়িমশাই যাবেন কোথায়? সেই শেষ-না-হওয়া বাড়িটাতে, যার একতলার সিঁড়ির প্রথম ধাপে প্যাকেটটা রেখে আসার কথা? যে লোকটা ফোন করে ভয় দেখাচ্ছে, হুকুম দিচ্ছে, প্যাকেটটা নেবার জন্যে সে কি সেখানে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করে থাকবে? ভাদুড়িমশাই যদি সেখানেই যান, একটা সংঘর্ষ তা হলে হবেই। বই পড়ব কী, এইসব ভাবনাই আমাকে অস্থির করে দিচ্ছিল।

ছ'টা বাজতেই সদানন্দবাবুকে তুলে দিলুম। সাড়ে ছ'টার মধ্যে আমরা রেডি। তার মিনিট কয়েক আগে ভাদুড়িমশাই তাঁর ঘর থেকে আমাদের ঘরে চলে এসেছিলেন। বললেন, "ভয় পাবেন না, ভয়ের কিছু নেই। কাজ শেষ হতে ঘণ্টা খানেকের বেশি লাগবে না।"

সদানন্দবাবু বললেন, "ভয় করলেই ভয়।"

।। ১০ ।।

স্কুটারের শব্দ হল ঠিক সাতটাতেই। তারপর একতলার সদর-দরজায় বেল বাজাবার শব্দ। তারও খানিক পরে জুতোর খটখট আওয়াজ শুনে বুঝলুম একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে কেউ দোতলায় উঠছে। মিনিট খানেক বাদে তার নেমে যাওয়ার শব্দও কানে এল।

কামিনী আমাদের ঘরে ঢুকে বলল, "লিজা এসেছিল। প্যাকেটটা ওকে দিয়ে দিয়েছি।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "বেশ করেছিস। এখন সাতটা পাঁচ। মিনিট দশেক বাদে আমরা একটু বেরোব। কখন ফিরব, বলতে পারছি না। রাত বেশি হতে পারে। ভাবিস না।"

আমরা নীচে নামলুম সওয়া সাতটায়। গাড়ি তৈরিই ছিল, আমরা ভিতরে ঢোকার পর ভাদুড়িমশাই ইন্দরলালকে বললেন, "গাড়ি স্পিডে চালাও, উত্তরকাশীর রাস্তা ধরো। খানিক বাদে যদি একটা স্কুটার দ্যাখো, সেটাকে ওভারটেক কোরো না, তবে একটু ডিসট্যান্স রেখে সেটার পিছনে লেগে থাকবে।"

ইন্দরলাল কোনও কথা বলল না। তবে, গাড়ির স্পিড যে হঠাৎ বেড়ে গেছে, সেটা বোঝা গেল।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলুম। আমি তো একেবারে খালি-হাতে নেমেছি, কিন্তু সদানন্দবাবু হুঁশিয়ার মানুষ, তিনি তাঁর খেটে-লাঠিটা সঙ্গে নিতে ভোলেননি। ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে সেই বিগ শপার। বললুম, "ঝোলাটা নিলেন কেন? ওতে আছে কী?"

ভাদুড়িমশাই সেই আগের মতোই ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছেন। ঘাড় না-ঘুরিয়েই বললেন, "আর-এক প্যাকেট কালাকাঁদ। কাজে লাগতে পারে। খাবেন একটা?"

বললুম, "না।"

গাড়ি বেশ জোরে ছুটছে। বাঁ দিকে চোখ রেখে বসে আছি। কোথায় যাচ্ছি আমরা ভাদুড়িমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলুম এর মধ্যে। তিনি সেই একই উত্তর দিয়েছেন, গেলেই দেখতে পাবেন। তারপরে আর কোনও কথা হয়নি। পথে কোনও স্কুটারও চোখে পড়েনি আমার।

হাতঘড়ির দিকে তাকালুম। রেডিয়াম লাগানো কাঁটা বলছে, এখন প্রায় সাড়ে সাতটা।

আর-একটু এগোলেই বাঁয়ে পড়বে সেই সরকারি হাউসিং এস্টেটের ফ্ল্যাটবাড়িগুলো। লিজা ওরই একটা ফ্ল্যাটে থাকে। এস্টেট ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগোলে সেই শেষ-না-হওয়া ভুতুড়ে বাড়িটা পাব। ভাদুড়িমশাই যে ওখানেই যাবেন, তাতে আর আমার কোনও সন্দেহ নেই এখন। ওখানে আমাদের পৌঁছতে-পৌঁছতে

প্রায় আটটাই বাজবে। কে যে ওখানে অপেক্ষা করছে, কে জানে। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, যেই অপেক্ষা করুক, ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে তার একটা সংঘর্ষ হবেই।

আশ্চর্য ব্যাপার, কোথায় সেই অন্ধকার ভুতুড়ে বাড়িতে যাব, তা নয়, হাউসিং এস্টেটের কম্পাউন্ড শুরু হওয়া মাত্র ভাদুড়িমশাই চাপা গলায় ইন্দরলালকে বললেন, "স্পিড কমিয়ে বাঁয়ে টার্ন নিয়ে এই হাউসিং এস্টেটের গেট দিয়ে গাড়ি ভিতরে ঢোকাও।"

ভিতরে ঢুকে প্রথমেই একটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা পার্ক। সম্ভবত চিলড্রেন'স পার্ক। দোলনা, সি-স, জন্তু-জানোয়ারের আদলে ছাঁটা পাছপালা ইত্যাদি দেখে তা-ই অন্তত মনে হল। তবে রাত হয়েছে বলেই বোধহয় অল্পবয়সী বাচ্চা কোনও ছেলেমেয়ে দেখলুম না। পার্কের চারদিক ঘিরে রাস্তা। রাস্তার ধারে পরপর ফ্ল্যাটবাড়ি। ফ্ল্যাটের আলো রাস্তায় এসে পড়েছে। অনেক ফ্ল্যাটেই যে টিভি চলছে, আওয়াজ শুনে সেটা বোঝা যায়।

পার্কের বাঁ দিকের রাস্তা ধরে প্রথম দুটো ফ্ল্যাটবাড়ি ছাড়িয়ে এল ইন্দরলাল। তারপর, ভাদুড়িমশাইয়ের নির্দেশমতো, তৃতীয় ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পার্কের ভিতরের গাছের আড়াল থেকে রেলিং টপকে একটি লোক এসে দাঁড়াল আমাদের গাড়ির পাশে। চাপা গলায় বলল, "ভাদুড়িসাবকো সাথ মিলনা হ্যায়।"

ভাদুড়িমশাই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন। লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সে বলল, "মেরা নাম ভীম সিং। আপকা যো কাম থা, হো চুকা। দুসরা কোই কাম হ্যায়?"

"এস. পি. সাবকা আদমি?"

"হাঁ, হুজুর।" লোকটি তার শার্টের পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে এগিয়ে ধরল। ভাদুড়িমশাই একবার চোখ বুলিয়েই সেটা তাকে ফেরত দিয়ে বললেন, "আমি এই বাড়ির দোতলায় যাব, তুমিও আমার সঙ্গে চলো।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিরণবাবু, আপনিও চলুন।"

"আর আমি?" সদানন্দবাবু প্রায় ডুকরে উঠে বললেন, "আমি একা এই গাড়ির মধ্যে বসে থাকব?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "একা কেন, ইন্দরলালই তো রয়েছে।" তারপর তাঁর বিগ শপারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা হুইসল বার করে সদানন্দবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা রাখুন। বাবরি চুলওয়ালা কোনও লোককে যদি এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেন, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে এটা বাজাবেন। মাত্র একবার বাজালেই চলবে।"

আমরা গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। সিঁড়িতে একটা কম পাওয়ারের

বাল্‌বের মিটমিটে আলো। তাতেও অবশ্য দেখা গেল যে, একতলার দু'দিকের দুটো ফ্ল্যাটেরই দরজার হুড়কোয় তালা ঝুলছে। অর্থাৎ হয় দু-দুটো ফ্ল্যাটে কেউ থাকে না, কিংবা থাকলেও এখন কেউ বাড়িতে নেই। দোতলাতেও দু'দিকের ফ্ল্যাটেরই দরজা বন্ধ, তবে তার একটাতেও তালা দেখলুম না। ডান দিকের দরজায় একটা পেতলের প্লেট আঁটা। প্লেটে পদবি খোদাই করা ওয়েভার্লি।

বাঁ হাতে বিগ শপার, ডান হাতের তর্জনী তুলে ভাদুড়িমশাই ডোর-বেলের বোতাম টিপলেন।

ভিতরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ বলল, "মাস্ট বি বালু!" পরক্ষণেই যে দরজা খুলল, তাকে দেখেই বোঝা যায় যে, সে হকচকিয়ে গেছে। চিনতে অসুবিধে হল না। লিজা।

আমরা লিজাকে চিনতে পারলেও লিজা আমাদের চিনতে পারেনি। বিভ্রান্তির ভাবটা একটু কেটে যেতেই অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কে? কী চাই?"

খোলা দরজার পাল্লার পাশ দিয়ে এরই মধ্যে ভিতরে একটা পা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ভাদুড়িমশাই। যাতে দরজাটা ফের বন্ধ করে দেওয়া না যায়। সেই অবস্থাতেই ভীম সিংয়ের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "এ লোকটি এসেছে থানা থেকে। আপনার বিশ্বাস না হলে আইডেন্টিটি কার্ড দেখাবে। আর আমরা দুজন সি. বি. আই.-এর লোক।" সি. বি. আই. মানে যে এক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনস নয়, চারু ভাদুড়ি ইনভেস্টিগেশনস, সেটা অবশ্য বললেন না।

লিজা ভয় পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কী চান আপনারা?"

ভাদুড়িমশাই তাঁর পা সরালেন না। বললেন, "কী চাই, তা আপনি খুব ভালই জানেন মিসেস এলিজাবেথ ওয়েভার্লি। ঘন্টাখানেক আগে ডুন্ডা ভ্যালির মিসেস কামিনী রাসেলের কাছ থেকে যে প্যাকেটটা নিয়ে এসেছেন, আপাতত সেটা চাই। ...ওহো, সেটা তো আপনার হাতেই রয়েছে!"

দরজার খোলা পাল্লায় নিমেষে একটা ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকে গেলেন ভাদুড়িমশাই। লিজার হাত থেকে প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, "ঝোলার মধ্যে রেখে দিন!"

পাল্লার ধাক্কা লেগে মেঝের উপরে পড়ে যেতে-যেতে টাল সামলে নিয়ে আবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছিল লিজা। কাতর গলায় বলল, "ওটা নেবেন না! মিসেস রাসেলই ওটা এক জায়গায় রেখে আসার জন্যে আমাকে দিয়েছেন!"

"আপনি এটা কোথাওই রেখে আসতেন না।" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "বালু না কার জন্যে তো আপনি অপেক্ষা করছিলেন, তাকে দেখিয়ে আপনার আলমারির লকারে তুলে রাখতেন। ...নিন, এবারে আগের প্যাকেটটা বার করুন।

...কুইক!"

"আগের প্যাকেট? তার মানে?"

"অত অবাক হচ্ছেন কেন? আগের প্যাকেট মানে গতকাল তো শুক্রবার ছিল, তার আগের শুক্রবার, মানে ছাব্বিশে এপ্রিল তারিখে যে প্যাকেটটা মিসেস রাসেল দিয়েছিলেন। মনে পড়েছে?"

লিজা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল, সে খুব কঠিন পাল্লায় পড়েছে, এখন আর না বোঝার ভান করে কোনও লাভ নেই। বলল, "কিন্তু সেটা তো যেখানে রাখার কথা, সেখানেই আমি রেখে এসেছিলুম!"

"আবার মিথ্যে বলছেন?" প্রায় গর্জন করে উঠলেন ভাদুড়িমশাই। বললেন, "নো মিসেস ওয়েভার্লি, প্যাকেটটা আপনি কোথাও রেখে আসেননি। সেটা যে বিক্রি করতে পারেননি, তাও জানি। কেননা, প্যাকেটের মধ্যে যেমন বই ছিল না, তেমন সোনার গয়নাও ছিল না, ছিল একটা হিরের নেকলেস। তা হিরে, তাও অত বড় সাইজের হিরে কি অত সহজে বিক্রি করা যায় নাকি? তাও এই উত্তরকাশীতে? কিনবে কে? ওসব জিনিস বিক্রি করতে হলে দিল্লি-বোম্বাই যেতে হয়। তা এর মধ্যে তো আপনি উত্তরকাশী ছেড়ে কোথাও যাননি। পরে হয়তো যেতেন, কিন্তু এখনও যে যাননি, তা তো আমি জানি। তাই বলছি, ওটা দিয়ে দিন।"

"কী করে দেব, কোত্থেকে দেব?" লিজা বলল, "প্যাকেটটা কি আমার কাছে আছে যে আমি দেব? ওটা আমি খুলে দেখিনি, ওর মধ্যে কী ছিল তা আমি জানি না। প্যাকেটটা আমাকে যেখানে রাখতে বলা হয়েছিল, সেখানেই আমি রেখে এসেছি।"

একটু আগেই ধমক দিয়ে কথা বলছিলেন ভাদুড়িমশাই। তাঁর গলা হঠাৎই অনেক নিচু পর্দায় নেমে এল। খুব ধীরস্থিরভাবে তিনি বললেন, "ইউ আর ট্রায়িং টু সেল মি আ প্যাকেট অব লাইজ, হুইচ আই'ম নট বায়িং। কিন্তু সে-কথা থাক, আপনার একটি ছেলে আছে না?"

"আছে, আপনি কী করে জানলেন?"

"যেমন করেই হোক, জানি। তা ছেলেটি এখন কোথায়?"

লিজার মুখে একটা আশঙ্কার ছায়া পড়ল কি? এতক্ষণ মুখ নিচু করে কথা বলছিল সে। হঠাৎ মুখ তুলে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের এই হাউসিং এস্টেটে একটা চিলড্রেন'স ওয়েলফেয়ার কমিটি আছে। এখানকার বাচ্চাদের নিয়ে তারা মাঝে-মাঝেই বেড়াতে বেরোয়। শুনলুম তাদেরই একজন লোক এসে নাকি জনিকে একটা ম্যাজিক শো দেখাতে নিয়ে গেছে। তা আপনি হঠাৎ জনির কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

কথাটার উত্তর না দিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "জনি ফিরবে কখন?"

"পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ নিয়ে গেছে, আটটার মধ্যেই ফেরার কথা।"

"নাও ফিরতে পারে।"

লিজা আর্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "তার মানে?"

"মানেটা খুবই সহজ।" ভাদুড়িমশাই ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "কোনও ওয়েলফেয়ার কমিটির লোক নয়, আমারই লোক এসে ম্যাজিক-শোতে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়ে আপনার মায়ের হেফাজত থেকে জনিকে তুলে নিয়ে গেছে। আপনি যতক্ষণ না সেই প্রথম প্যাকেটটি তার ভিতরের নেকলেসটা সুদ্ধু আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন, জনিকেও ততক্ষণ ফেরত পাবেন না। ইট'স অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট।"

ফ্ল্যাটের ভিতরে আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা এদের লিভিং কাম ডাইনিং রুম। মাঝ-বরাবর একটা পর্দা। সেই পর্দার আড়াল থেকে এক ভদ্রমহিলা হঠাৎ বেরিয়ে এলেন। মুখের বলিরেখা দেখলে মাকড়সার জাল বলে ভ্রম হয়, মাথার চুল ধরধবে সাদা। পরনে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলের একটা লম্বা কোট।

ভদ্রমহিলাকে দেখবামাত্র লিজা চেঁচিয়ে উঠল, "মা, তুমি জনিকে কার হাতে ছেড়ে দিয়েছ?"

মেয়ের কথার কোনও উত্তর দিলেন না বৃদ্ধা। বোতাম খুলে কোটের ভিতরকার পকেট থেকে একটা কাগজে-মোড়া প্যাকেট বার করে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, "এই নিন আপনার সেই প্যাকেট। খুলে দেখে নিন, নেকলেসটা ওর মধ্যে আছে কি না।"

প্যাকেটটা খুললেন না ভাদুড়িমশাই, সেটাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে, বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি এতক্ষণ ওই পর্দার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিলেন?"

"হ্যাঁ।" বিষণ্ণ হেসে ভদ্রমহিলা বললেন, "ওখান থেকে আপনাদের সমস্ত কথাই আমি শুনেছি। আমার মেয়ে যা করেছে, তার ক্ষমা নেই। তবু বলি, ও এ-কাজ স্বেচ্ছায় করেনি, ওকে দিয়ে জোর করে খুন করার হুমকি দিয়ে বাল্লু এ-কাজ করিয়ে নিয়েছে।

"কে বাল্লু?"

"বাইরের লোক, খারাপ লোক, মাঝে-মাঝে এখানে আসে, আমার মেয়েকে ভয় দেখায়।"

"এর বেশি কিছু জানেন না?"

"না।" ভদ্রমহিলা হাত জোড় করে আর্ত গলায় বললেন, "যাই হোক, জিনিসটা যখন ফেরত পেয়েছেন, জনিকে এখন ফিরিয়ে দিন। ও আমার একমাত্র নাতি!"

ঠিক এই সময়েই হুইসলের শব্দ শোনা গেল। ভাদুড়িমশাইও তৎক্ষণাৎ "ভীম, তুমি এখানে থাকো" বলেই তাঁর ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা ভারী জিনিস তুলে নিয়ে দরজার বাইরে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগালেন। আমি তাঁর পিছু

নিতে-নিতে খেয়াল করলুম, ঝোলা থেকে যা তাঁর হাতে উঠে এসেছে, সেটা একটা রিভলভার!

যাকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেখে সদানন্দবাবু হুইসল বাজিয়েছেন, একতলায় নামার আগেই বাবরি চুলওয়ালা সেই লোকটির সঙ্গে সিঁড়ির মধ্যপথে আমাদের দেখা হয়ে গেল। ভাদুড়িমশাইকে দেখে যে সে হকচকিয়ে গেছে, তা বুঝতে কিছুমাত্র দেরি হল না আমার। সঙ্গে-সঙ্গেই সে পিছন ফিরে একতলায় নেমে যাবার উদ্যোগ করেছিল, কিন্তু সদানন্দবাবু ততক্ষণে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে রিভলভার দেখেই সদানন্দবাবু বুঝে গিয়েছিলেন যে, যাকে আমরা ধাওয়া করেছি, সে মোটেই সুবিধের লোক নয়, ফলে লোকটা যখন তাঁকে ধাক্কা মেরে তাঁর পাশ দিয়ে তড়বড় করে নীচে নেমে যাচ্ছে, তখন মাথায়-লোহার-বল-বসানো তাঁর সেই বিখ্যাত খেটে-লাঠি দিয়ে লোকটার কপালে এক ঘা বসিয়ে দিতে সদানন্দবাবুর একটুও ভুল হয়নি। তার ফল যা হবার তা-ই হল। সিঁড়ির উপরেই কপাল চেপে ধরে লোকটা বসে পড়ল।

ডান হাতে রিভলভার, সিঁড়ি দিয়ে দু'ধাপ নেমে বাঁ হাতে লোকটার শার্টের কলারের পিছন দিকটা মুঠো করে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে দাঁড় করালেন ভাদুড়িমশাই। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "বালুচন্দ্রন, এটা তো ফিল্মি ফাইটিং নয়, তাই তোমার কপাল ফেটে যা গড়াচ্ছে, তাও টোমাটো সস নয়, রক্ত। আর আমার হাতের এটাও নকল নয়, আসল রিভলভার। তোমার ভাগ্য ভাল যে, লাঠির বাড়ি খেয়েছ, আমাকে রিভলভার চালাতে হয়নি। নাও, এখন উপরে চলো।"

নার্সের বাড়ি, ফার্স্ট এডের জিনিসপত্র সবই মজুত, ভাদুড়িমশাইয়ের নির্দেশে লিজা চটপট বালুর কপালে একটা অ্যান্টিসেপটিক লোশন লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

বালুচন্দ্রনের শার্টে রক্তের ছোপ। ব্রাউন রঙের ময়লা প্যান্টটাও হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। সদানন্দবাবু তাঁর নিজস্ব হিন্দিতে বললেন, "এই, তুম প্যান্ট নামাকে বৈঠো। দেখতা নেই যে, এখানে দুজন লেডি রয়েচেন?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "নামাবে কী করে? প্যান্টটা ছেঁড়া যে! কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না। ভীম সিং, এই লোকটিকে নিয়ে আমরা এখন এস. পি. সাহেবের কাছে যাব। হাতকড়ি লাগিয়ে একে এখন নীচে নামিয়ে ট্যাক্সিতে তোলো।"

লিজার মা বললেন, "আমরা এখন কী করব?"

"আপনারা এখন এখানেই থাকুন।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "পরে যদি দরকার হয় তো আপনাদের ডেকে পাঠানো হবে।...ও হ্যাঁ, জনির জন্যে চিন্তা করবেন না, একটু বাদেই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

॥ ১১ ॥

কামিনীদের বাড়ি থেকে যখন লিজাদের ফ্ল্যাটে আসি, ট্যাক্সিতে তখন ভাদুড়িমশাই ছিলেন ড্রাইভারের পাশের আসনে। পিছনের আসনে জায়গা পেয়েছিলুম আমি আর সদানন্দবাবু। লিজাদের বাড়ি থেকে উত্তরকাশীতে যাবার পথে জায়গা পালটা-পালটি হয়েছে। বিগ শপারটাকে পায়ের কাছে নিয়ে আমি আর সদানন্দবাবু এখন সামনের সিটে ড্রাইভার ইন্দরলালের পাশে একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছি, আর পিছনের সিটে বালুচন্দ্রনকে মাঝখানে নিয়ে তার দু'পাশে বসেছেন ভাদুড়িমশাই আর ভীম সিং। বালুকে হাতকড়ি পরানো হয়নি। তার কারণ, উত্তরকাশী পুলিশের এ. এস. আই. ভীম সিংয়ের হাতেও একটা ঝোলা ছিল বটে, তবে তার মধ্যে হুইস্‌ল, আইডেন্টিটি কার্ড, ব্যাটন, খইনির কৌটো ইত্যাদি অনেক কিছু থাকলেও একজোড়া হাতকড়ি ছিল না। তাতে অবশ্য কোনও ক্ষতি হয়নি। দু'দিকে শক্ত পাহারা, মধ্যিখানে বালু একেবারে ঝিম মেরে বসে আছে।

ট্যাক্সিতে উঠেই তাঁর মোবাইল বার করে ভাদুড়িমশাই কাউকে ফোন করেছিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁকে বলেছিলেন যে, কাজ শেষ, আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা এস. পি. সাহেবের দফতরে পৌঁছে যাব।

পৌঁছলুম সাড়ে ন'টায়। পুলিশ সুপারের নাম দেওনন্দন ঠাকুর। আমরা তাঁর দফতরে পৌঁছবামাত্র খবর পেয়ে তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাদুড়িমশাইকে নমস্কার করে বললেন, "আসুন, আসুন, উপর থেকে আমাকে আপনার কথা বলা হয়েছে। দয়া করে আমার ঘরে এসে বসুন, তারপর আপনার সমস্ত কথা আমি শুনব, অ্যান্ড অফ কোর্স আই শ্যাল ডু দ্য নিডফুল।"

ভদ্রলোক আই. পি. এস. অফিসার। বয়স বছর চল্লিশেক। আমরা তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি রাজেশ কুলকার্নি একটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সেখানে বসে আছে। বাচ্চাটির এক হাতে একটা বিশাল সাইজের চকোলেট বার, অন্য হাতে একটা ফুঁ-দিয়ে-ফোলানো মস্ত বড় পেঙ্গুইন। ভাদুড়িমশাই বললেন, "রাজেশ, আর দেরি কোরো না, ওকে এবারে ওর মা'র কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো। দরকার হয় তো আমাদের ট্যাক্সিটা নিয়েই চলে যাও।"

দেওনন্দন ঠাকুর বললেন, "না না, আপনাদের গাড়ির দরকার হবে না, গাড়ির ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি!" বলেই, ঘরের আর-এক দিকে বসে যে-লোকটি কিছু টাইপ করছিল, তাকে বললেন, "রমেশ, তোমাকে যে-চিঠিখানা টাইপ করতে দিয়েছি, ওটা খুব জরুরি নয়, কাল টাইপ করলেও চলবে, প্রোফেসর কুলকার্নির জন্যে তুমি আর্দালিকে বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দাও। ওদের সঙ্গে একজন সিকিওরিটিও যেন দিয়ে দেওয়া হয়।.... প্রোফেসর কুলকার্নি, আপনি ওর সঙ্গে যান।"

বাচ্চাটিকে নিয়ে রাজেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেওনন্দন ঠাকুর কলিং

বেল টিপে তাঁর আর্দালিকে ডেকে বললেন, "আমাদের জন্যে কফি আর কিছু কাজুবাদাম দিয়ে যাও।...আর হ্যাঁ, এখন কিছুক্ষণ যেন কেউ আমাদের ঘরে না ঢোকে।" তারপর ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি।"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "ইউ হ্যাভ অলরেডি ডান আ লট ফর আস। অ্যান্ড আই থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। এখন আর-একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"বলুন।"

"যে-লোকটিকে আমি ধরে এনেছি, আপাতত আমাদের ট্যাক্সিতে আপনাদের এ. এস. আই. ভীম সিং তার পাহারায় আছে। লোকটিকে অন্তত দু'দিন, আজ আর কাল, আপনাদের লক-আপে আটকে রাখা দরকার। অথচ তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আমি লিখিতভাবে এখনই আপনার কাছে করতে পারছি না। শুধু এইটুকু আপনাকে বলতে পারি যে, এ অতি ভয়ঙ্কর লোক, একে আটকে না-রাখলে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের খুবই ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে।"

কথাটা শুনে পুলিশ সুপার যে একটু বিস্মিত হয়েছেন, সে তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। বললেন, "মিঃ ভাদুড়ি, তা-ই যদি হয়, তবে সে-কথা আপনি লিখিতভাবে আমাদের জানাচ্ছেন না কেন?"

"অসুবিধে আছে। প্রধান অসুবিধে, ওই যে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কথা বলেছি, তাঁদের মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। তাঁদেরই স্বার্থরক্ষার জন্যে আমি কাজ করছি, অথচ কী কাজ করছি, তাঁদেরও সেটা জানতে দিইনি। কেন জানতে দিইনি? না কোন পথে আমি কাজটাকে গুছিয়ে তুলছি, তা জানলে হয়তো তাঁরাই আমাকে বাধা দিয়ে বসবেন। অথচ, আমাকে বাধা দিলে তাঁদের ভরাডুবি কেউ আটকাতে পারবে না, পরিবারটির সর্বনাশ হবে।"

"বুঝলুম," দেওনন্দন ঠাকুর বললেন, "কিন্তু লোকটি কী অপরাধ করেছে, লিখিতভাবে তা যদি আপনি না জানান, তা হলে আমি ওকে হাজতে পুরে আটকে রাখব কী করে? সেটা তো ঘোর বে-আইনি কাজ হবে।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তা কি আমি জানি না মিস্টার ঠাকুর? জানি। কিন্তু মাঝে-মাঝে কি দু'চারটে বে-আইনি কাজ আমরা করি না? আমি অন্তত করি। যদ্দুর জানি, আপনারাও করেন। না-করে যখন উপায় থাকে না, তখন করতেই হয়। এ-ক্ষেত্রে উপায় নেই। তবু যদি আইনের উদ্দেশ্যের কথা না-ভেবে স্রেফ অক্ষরটাকে আপনি গুরুত্ব দেন তা হলে কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে আইনটা করা হয়েছিল, সেটাই সিদ্ধ হবে না।"

দেওনন্দন তবু চুপ করে আছেন দেখে ভাদুড়িমশাই বললেন, "আমার অনুরোধটা আমি পরিষ্কারভাবে ফের আপনাকে জানাতে চাই, মিস্টার ঠাকুর। আজ আর কাল, জাস্ট দুটো দিন আপনি ওকে আটকে রাখুন। লিখিতভাবে যদি

কোনও অভিযোগ জানাতেই হয়, তো পরশু সোমবার ফার্স্ট আওয়ারেই আমরা সেটা জানাব। তখন আপনি যে ডিসিশান নিতে হয়, নেবেন। তবে তার আগে ওকে ছাড়বেন না। এই সামান্য অনুরোধ রাখাটাও কি সম্ভব নয়?"

দরজা ঠেলে একটি লোক ঘরে ঢুকল। হাতের ট্রে থেকে চার পেয়ালা কফি আর এক প্লেট কাজুবাদাম টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়েও গেল তৎক্ষণাৎ। দেওনন্দন বললেন, "রাখতে যদি না-ই পারি?"

"তা হলে যে-কাজ আমি সাধারণত করি না, করতে চাইও না, সেটা আমাকেই করতে হবে। লোকটাকে একেবারে চিরকালের মতো চুপ করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকেই। নিতে হবে, কেন না যে-পরিবারটিকে আমি বলতে গেলে আমার নিজেরই পরিবার বলে মনে করি, তার কোনও অসম্মান আমি ঘটতে দেব না।"

দেওনন্দন প্রায় মিনিট খানেক একেবারে নিশ্চুপ বসে রইলেন। তারপর বললেন, "এরই মধ্যে অন্তত বার-তিনেক একটি পরিবারের মান-মর্যাদার কথা আপনি বলেছেন। প্রোফেসর কুলকার্নির কাছে শুনলুম, এখানে এসে আপনি আছেন ডক্টর রাসেলের বাড়িতে। তাই জানতে কৌতূহল হচ্ছে যে, ডক্টর রাসেলের পরিবারের কথাই আপনি বলছেন কি না।"

কথাটার সরাসরি জবাব না-দিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "তাকে চেনেন আপনি?"

পুলিশ সুপারের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। বললেন, "শুধু আমি বলে কথা কী, এই তল্লাটে, রাইট ফ্রম ধরাসু টু উত্তরকাশী, সবাই তাঁকে চেনে। সবাই চেনে, সবাই শ্রদ্ধা করে, সবাই ভালবাসে। পাহাড়ি বস্তির লোকেরা কী বলে জানেন? বলে, উনি মানুষ নন, ভগবান।"

"শুনেছি, খুবই নামজাদা ডাক্তার।"

"ঠিকই শুনেছেন। আর তা ছাড়া ডক্টর রাসেলের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব ঋণীও। আমার সাত বছরের মেয়েটা তো হেপাটাইটিস হয়ে মরতে বসেছিল। এখানকার ডাক্তাররা জবাব দেবার পরে আমি নিজে গিয়ে একটা পাহাড়ি বস্তি থেকে ওঁকে ধরে আনি। শেষ পর্যন্ত উনিই মেয়েটাকে বাঁচিয়ে তোলেন। তা আপনি যাকে নিয়ে এসেছেন, সে-লোকটা কি ডক্টর রাসেলের কোনও ক্ষতি করেছে নাকি?"

"করেছে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "এখনও করছে। এমন সব কাজ করছে, যাতে ডক্টর রাসেলের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তাই বলছিলুম যে, আপনি যদি একান্তই না পারেন, তো লোকটাকে চুপ করিয়ে রাখার দায়িত্ব নাহয় আমিই নেব।"

মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল দেওনন্দন ঠাকুরের চেহারা। টেবিলের উপরে দমাস

করে একটা কিল মেরে বললেন, "না না, আপনি কেন দায়িত্ব নেবেন? তা হলে আমরা রয়েছি কী করতে?....ঠিক বলেছেন, সব সময় অত আইন মানলে চলে না!"

কথা শেষ করেই বেল বাজিয়ে আর্দালিকে ডেকে বললেন, "এ. এস. আই. ভীম সিং একটা গুণ্ডাকে এখানকার রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। তাকে তোমাদের হেফাজতে নিয়ে এখানকার হাজতে পুরে দাও। আজ আর কাল হাজতে থাকুক, তারপর যা করার, সোমবার এসে করা যাবে।"

আর্দালিটি বুটে বুট ঠুকে সেলাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমরাও 'ধন্যবাদ' বলে ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ট্যাক্সিতে ফের পিছনের সিটে উঠে পড়লুম। সদানন্দবাবু অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করছিলেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলছিলেন না। এখন শহরের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা হাইওয়েতে পড়ামাত্র বললেন, "এই লোকটাকেই গতকাল বিকেলে আমি বাঁদর-কাঁধে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম।"

"ঠিক, ঠিক!" আমি বললুম, "সে তো আমিও দেখেছি।"

সামনের সিট থেকে ভাদুড়িমশাই বললেন, "তা হলে এতক্ষণ সে-কথা বলেননি কেন?"

সদানন্দবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, "ভয়ে। একে তো ডেঞ্জারাস লোক, তায় আবার আমাদের গাড়ির মধ্যেই বসে ছিল কিনা, তাই বড্ড নার্ভাস লাগছিল।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তা তো বুঝলুম, কিন্তু সদানন্দবাবু, যার কপালে লাঠির বাড়ি কষাতে আপনার হাত কাঁপেনি, হঠাৎ আবার তাকে অত ভয় পাবার মতো কী ঘটল?"

"লাঠিটা তো অত ভেবেচিন্তে মারিনি," সদানন্দবাবু লজ্জিত গলায় বললেন, "ওই মানে ঝোঁকের মাথায় মেরে দিয়েছিলুম।"

"বেশ করেছিলেন। তবে কিনা লোকটার বাবরি চুলের কথাটা কাল আপনারা কেউই আমাকে বলেননি। আইডেন্টিফিকেশনের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি কিন্তু সেটার কথাও মনে রেখেছিলুম। যেজন্যে আজ সদানন্দবাবুকে বলে রেখেছিলুম যে, লিজাদের বাড়িতে বাবরি চুলওয়ালা কোনও লোককে ঢুকতে দেখলেই যেন তিনি হুইসল বাজান।"

ভাদুড়িমশাই চুপ করে যাবার পর বাকি পথে আর কোনও কথা হল না। বেশ রাত হয়েছে, পথ ফাঁকা, ইন্দরলাল স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে, ডুগুা ভ্যালিতে পৌঁছতে-পৌঁছতে তবু বারোটা বেজে গেল।

বেল বাজাবামাত্র দরজা খুলল কামিনী। বলল, "এত রাত হল যে?"

তার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে বিগ শপারের ভিতর থেকে প্যাকেট

দুটো বার করে আনলেন ভাদুড়িমশাই, সে-দুটো কামিনীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই নে তোর হিরের নেকলেস আর মুক্তোর মালা।....বাস বাস, এখন আর এ নিয়ে কোনও কথা নয়, যা বলার কাল বলব।.....বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, খেতে দে।....বার্টি কখন ফিরল?"

"সাড়ে দশটায়।" কামিনী বলল, "ভীষণ টায়ার্ড ছিল। খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা আর এখন উপরে উঠো না, এখানেই হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে যাও, আমি সব গরম করে রেখেছি।"

খাওয়া শেষ হবার পর ভাদুড়িমশাই বললেন, "মিনি, তোর হয়তো খেয়াল নেই, কিন্তু আমি জানি যে, কাল তোর জন্মদিন। জন্মদিনে সত্যকথা গোপন করতে নেই, সব কথা খুলে বলতে হয়। কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে বার্টিকে সব খুলে বলবি, কিচ্ছু গোপন করবি না। তা নইলে তোর উদ্ধার নেই।"

আমরা উপরে উঠে এলুম। ঘরে ঢুকে সদানন্দবাবু বললেন, "পুলিশ-সাহেবের ওখেনে কফি খাওয়াটা উচিত হয়নি। ভয়ে-ভয়ে খেলুম। রাত্তিরে এখন ঘুম হবে কি না, কে জানে।"

শুয়ে পড়ার মিনিট খানেক বাদেই কিন্তু তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল।

।। ১২ ।।

আজ পাঁচুই মে, রবিবার। কাল ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ কিন্তু সকাল সাতটার মধ্যেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। সদানন্দবাবু উঠেছেন তার আগে। ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যথারীতি তিনি মাইল তিনেক প্রাতঃভ্রমণও করে এসেছেন। ব্রেকফাস্ট করেছি ন'টায়। রাজেশও তার খানিক বাদেই এসে পড়ল। কামিনী তাকে কালই ফোন করে বলে রেখেছিল যে, আজ দুপুরে সে এখানে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে, তবে দুপুর অব্দি অপেক্ষা না করে সে যেন ব্রেকফাস্ট করেই উত্তরকাশী থেকে বেরিয়ে পড়ে। সে এল দশটা নাগাদ। এসেই একটু লজ্জিত গলায় বলল যে, দেরিতে ঘুম থেকে উঠেছিল বলে তাড়াহুড়োর মধ্যে ব্রেকফাস্ট করে আসতে পারেনি। "ভালই হল রাজু, আমিও এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু দাঁতে কাটার সময় পাইনি, এখন চল্, দু'জনে মিলে ডাইনিং রুমে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।"— বলে মিনিদিদি তার রাজুভাইকে নিয়ে খাওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

এখন সাড়ে দশটা বাজে। দোতলার বারান্দার মাঝখানে একটা গোল টেবিল রেখে সেটাকে ঘিরে খান কয়েক চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে। আমরা—মানে বার্টি, ভাদুড়িমশাই, সদানন্দবাবু আর আমি একটু আগেই সেখানে এসে জমায়েত হয়েছিলুম, এখন ব্রেকফাস্ট করে কামিনী আর রাজেশও এসে পড়ায় আসর

একেবারে জমজমাট! কামিনীর আজ জন্মদিন। সবাই মিলে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হল। কামনা করা হল তার সুস্থ নীরোগ দীর্ঘজীবন। হাস্য-পরিহাস ঠাট্টা-তামাশাও চলল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর, সকলের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস যখন একটু থিতিয়ে এসেছে, তখন ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বার্টি রাসেল বলল, "আঙ্কল, আজ সকালে মিনি আমাকে সমস্ত কথাই খুলে বলেছে। আমি তো এর কিছুই জানতুম না।"

ভাদুড়িমশাই হাসলেন। তারপর হাসিটাকে তাঁর দু'চোখে ধরে রেখে বললেন, "তা জেনে এখন কী মনে হচ্ছে?"

"কী আবার মনে হবে?" বার্টিও হেসে বলল, "ভুল তো সবাই করে, মিনিও করেছিল, আবার সময়মতো সেটা শুধরেও নিয়েছে। বাস, মিটে গেল।...তা ও-সব কথা থাক, আপনি যদি অনুমতি দেন তো দু-একটা প্রশ্ন করি।"

"বেশ তো, করো।"

"আঙ্কল, মিনিকে কীভাবে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল, মিনির কাছেই সেটা শুনেছি। অবনকশাস ফোটোগ্রাফগুলোও মিনি আমাকে দেখিয়েছে। আবার, যে সংকটে ও পড়েছিল, আপনিই যে মাত্র দু'দিনের মধ্যে তা থেকে ওকে উদ্ধার করেছেন, এমনকী ব্ল্যাকমেলড হয়ে যে-দুটো ফ্যামিলি এয়ারলুম ও হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়েছিল তাও যে আপনি ফিরিয়ে এনেছেন, এই সবই আমি আজ সকালে শুনলুম। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"কী বুঝতে পারছ না?"

বার্টি বলল, "যে লোকটা ওই ফোটোগ্রাফগুলো পাঠিয়েছিল, তারপর ফোনে হুমকি দিয়ে, অ্যাজ আ প্রাইস ফর হিজ সাইলেন্স, প্রথম দফায় চেয়ে পাঠিয়েছিল ওই হিরের নেকলেস আর দ্বিতীয় দফায় ওই মুক্তোর মালা, লিজাই যে তার অ্যাকমপ্লিস বা অনুচর হিসেবে কাজ করছিল... আই মিন স্বেচ্ছায় না-করলেও করতে বাধ্য হচ্ছিল, এমন সন্দেহ আপনার হল কেন?

ভাদুড়িমশাই আবার একটু হেসে বললেন, "সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?"

"কই, আমার তো তা মনে হয় না।" বার্টি বলল, "ছবির সঙ্গে যে চিঠি আসে, তাতে 'উপযুক্ত' দামের উল্লেখ ছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত দামটা যে কী, তার কোনও উল্লেখ ছিল না। দামটা কাকে দিয়ে কোথায় পাঠাতে হবে, চিঠিতে তাও বলা হয়নি। লোকটা পরে ফোন করে জানায় যে, দাম হিসেবে হিরের নেকলেসটা চাই। সেটা কখন কোথায় পাঠাতে হবে? না ছাব্বিশে এপ্রিল শুক্রবার রাত আটটায় হাইওয়ের ধারে পাহাড়ের গায়ে একটা হাফ-বিল্ট অ্যাবানডন্ড বাড়িতে। কিন্তু সেটা কার হাত দিয়ে পাঠাতে হবে, ফোনে তা বলা হয়নি।"

একটুক্ষণের জন্য চুপ করে রইল বার্টি। ভাদুড়িমশাই বললেন, "থামলে কেন, গো অ্যাহেড।"

বার্টি বলল, "হিরের নেকলেসটা লিজার হাত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে দিয়েই যে পাঠাতে হবে, লোকটা তো এমন কথা বলেনি।....কী মিনি, বলেছিল?"

"না, তা সে বলেনি।" কামিনী বলল, "হিরের নেকলেসটার সময়েও বলেনি, আবার তারপরে যখন মুক্তোর মালা পাঠাবার হুকুম দেয়, তখনও বলেনি। শুধু বলেছিল, যাকে দিয়েই পাঠাই না কেন, সে যেন কোনও চালাকি করার চেষ্টা না করে।...আর হ্যাঁ, পুলিশকে যেন কিছু না জানাই। মোট কথা, লিজার কোনও উল্লেখই সে করেনি।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "করেনি, তার কারণ আর কিছুই নয়, করার কোনও দরকারই তার হয়নি। লোকটা খুব ভালই জানত যে, জিনিস দুটো তুই লিজার হাত দিয়েই পাঠাবি।"

সদানন্দবাবু বললেন, "এ-কতা বলচেন কেন?"

বার্টি বলল, "রাইট। জিনিস দুটো মিনি যে লিজার হাত দিয়ে পাঠাবে, তা তো তার জানার কথা নয়। ইন ফ্যাক্ট মিনি তো ক্যারিয়ার হিসেবে আর-কাউকে বেছে নিতে পারত!"

"আর-কাউকে মানে কাকে?"

"ধরুন আমাকে।"

শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন ভাদুড়িমশাই। বললেন, "তোমাকে? অব অল পার্সনস? বার্টি, লোকটা বজ্জাত, কিন্তু বোকা নয়। তুমি কি ধরেই নিচ্ছ যে, তোমাকে সে চেনে না? আরে বাপু, খুব ভালই চেনে। সে জানে যে, তুমি আপরাইট লোক, তুমি কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবে না, ঘুঁষ দিয়ে কারও মুখ বন্ধ করতে তুমি রাজি হবে না, উলটে হয়তো রাইফেল নিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে ছুটবে। আর তা ছাড়া...."

বললুম, "আর তা ছাড়া কী?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "লোকটা এটাও জানত যে, মিনি তার স্বামীকে কিছুতেই এর মধ্যে টানবে না, কেন না স্বামীর কাছ থেকে ব্যাপারটাকে সে লুকিয়ে রাখতেই চায়।"

রাজেশ এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবারে বলল, "আমি তো এত সব কথা জানতুম না। আঙ্কল আমাকে যা করতে বলেছিলেন, সেইটুকু করেছি মাত্র। একটু আগে ব্রেকফাস্ট করতে বসে মিনিদিদির কাছে সব শুনলুম। তো আমিও একটা কথা বুঝতে পারছি না, আঙ্কল।"

"কী বুঝতে পারছিস না?"

"হোয়াই ডিড মিনিদিদি হ্যাভ টু চুজ লিজা? ডক্টর রাসেলকে না-ই পাঠাক, ক্যারিয়ার হিসেবে বাড়ির কাজের লোকদেরও কাউকে তো পাঠাতেই পারত।"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "তাও যে মিনি পাঠাবে না, লোকটা সে-কথাও ভালই জানত। ওরে মিনি, কাজের লোকদের যে কেন ক্যারিয়ার হিসেবে পাঠাসনি তুই, আমি তো তা জানি। এবারে রাজেশকে বুঝিয়ে দে।"

মিনি বলল, "রাজু, তুই দেখছি সেই ছেলেবেলার মতোই গাধা রয়ে গেলি, তোর বুদ্ধি একটুও পাকেনি। ওরে হাঁদারাম, কাজের লোকদের যদি এর মধ্যে টানতুম, কথাটা তা হলে পাঁচকান হতই, এক সময়ে বার্টির কানেও পৌঁছে যেত। সেই জন্যেই ওদের কাউকে কিচ্ছু বলিনি। আর তা ছাড়া, বললেও রাজি হত না। ওদের যা ভূতের ভয়! অন্ধকারে অত দূরে ওই ভুতুড়ে বাড়িতে যেতে হবে শুনলেই হাতজোড় করে বলত, মাফ কর দিজিয়ে ম্যাডাম!"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তো এই হচ্ছে ব্যাপার। মিনি যে তার স্বামীকেও পাঠাবে না, বাড়ির কাজের লোকদেরও পাঠাবে না, লোকটা তা জানত। তা হলে বাকি রইল কে?"

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন, "রইল বাকি এক। অর্থাৎ কিনা একমাত্র লিজাই বাকি রইল! লোকটা যে ক্যারিয়ার হিসেবে কারও নাম করেনি, তার কারণ, সে খুব ভালই জানত যে, তার অ্যাকমপ্লিস লিজার হাত দিয়েই ওই হিরের নেকলেস আর ওই মুক্তোর মালা পাঠানো হবে।"

"কিন্তু আঙ্কল, লিজা তো আমার কাছ থেকে প্যাকেট নিতে রাজিই হচ্ছিল না।" কামিনী বলল, "প্রথম বারেও না, দ্বিতীয় বারেও না।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওই রাজি না-হওয়াটা ওর ভান। অনুরোধ করামাত্র রাজি হলে পাছে তোর খটকা লাগে, সন্দেহ জাগে, তাই সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হত না। গড়িমসি করত, বলত ওর অন্য কাজ আছে, তাই রাত আটটায় যেখানে তুই প্যাকেটটা পৌঁছে দিতে বলছিস, ওই সময়ে সেখানে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে রাজি হয়ে যেত, সেটাই আসল ব্যাপার। প্রথমবারে যেমন প্রথমটায় রাজি না হয়ে পরে রাজি হয়, দ্বিতীয়বারেও তা-ই।"

"কিন্তু আঙ্কল," কামিনী বলল, "এখন তো তোমার কাছে শুনছি যে, দু'বারের কোনওবারেই প্যাকেটটা সে ওই ভুতুড়ে বাড়িতে পৌঁছে দেয়নি, দু'বারেই ও প্যাকেট দুটো সরাসরি নিজের বাড়িতে নিয়ে তুলেছিল। এটা কেন করেছিল লিজা?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কারণ সেই লোকটা তাকে সেইরকমই করতে বলেছিল। সে তোকে যা করতে বলেছিল, লিজাকে তা করতে বলেনি।"

"তার মানে লিজাকে সে প্যাকেট দুটো সেই অ্যাবানডন্ড ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেনি?"

"কেন বলবে? নির্জন ফাঁকা বাড়ি কি সত্যিই ফাঁকাই থেকে যায় নাকি!

দু'চারদিন ফাঁকা থাকার পরেই সেটা চোর-ডাকাত আর গুণ্ডা-বদমাসের আস্তানা হয়ে দাঁড়ায়। হিরের নেকলেস আর মুক্তোর মালা নিয়ে লিজা সেখানে যাক, লোকটা কি তা চাইতে পারে নাকি? চোরের উপরে বাটপাড়ি হবার ভয় নেই তার? ভয় অবশ্য তার আরও একটা ছিল।"

"কীসের ভয়?"

"পুলিশের ভয়।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "লোকটা তোকে ফোনে বলেছিল যে, পুলিশকে জানালে পরিণাম খারাপ হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুই পুলিশকে জানাতে পারিস, এই ভয় তার ছিলই। সত্যিই যদি জানাতি আর সত্যিই যদি লিজা এই প্যাকেট নিয়ে সেই ফাঁকা বাড়িতে যেত, ব্যাপারটা কী দাঁড়াত তা হলে? পুলিশের হাতে লিজা বমাল ধরা পড়ত, আর পুলিশের জেরার ঠেলায় লিজা ফাঁস করে দিত সেই লোকটার নামধাম। লোকটা তাই কোনও ঝুঁকি নেয়নি। তোকে বলেছে সেই ফাঁকা বাড়িতে লোক পাঠাতে, আর লিজাকে বলেছে, মাল নিয়ে সে যেন সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে যায়।"

বার্টি বলল, "কিন্তু লিজা যে প্যাকেট নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে যাবে, তা তো আপনার জানার কথা নয়, আঙ্কল। জানলেন কী করে?"

"জানতুম না তো। জাস্ট অনুমান করেছিলুম। তবে কিনা আমি যা অনুমান করি, তা বড়-একটা ভুল হয় না।"

মিনি বলল, "কিন্তু লিজা যার অ্যাকমপ্লিস, সে তো ইতিমধ্যে ওটা বেচে দিতেও পারত। মানে মুক্তোর মালা বেচার সময় না পাক, হিরের নেকলেসটা বেচে দেবার মতো সময় যথেষ্টই পেয়েছিল। ওটা তো বেহাত হয়েছিল পুরো এক হপ্তা আগে।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওরে মিনি, অত দামি হিরে বিক্রি করা কি চাট্টিখানি কথা? তাও এই উত্তরকাশীর মতো জায়গায়? ভাল দামে বিক্রি করতে হলে দিল্লি, মুম্বাই, বাঙ্গালোর, কলকাতা কি চেন্নাই যেতে হয়। তা ও-সব জায়গায় কি আমাদের আপিস নেই, এজেন্ট নেই? নাকি সেখানকার জুয়েলারদের মধ্যে কারা চোরাই মালের খরিদ্দার, সে-খবর আমরা রাখি না? না রে, ও-সব জায়গার আপিসে আমি ফোন করেছি, কিন্তু কেউই তেমন কোনও খবর আমাকে দেয়নি। তার থেকেও আমি অনুমান করে নিই যে, তোর হিরের নেকলেস এখনও পাচার হয়নি, এখানেই আছে।"

"কিন্তু লিজা তো সেটা অত সহজে ফেরত দিতে নাও পারত।"

"দেবে না, এমন আশঙ্কা ছিল বলেই তো উলটো-চাপের ব্যবস্থা করেছিলুম। লিজাকে সাফ বলেছিলুম, নেকলেসটা যদি ফেরত না দেয় তো তার ছেলেকেও সে ফেরত পাবে না।"

শুনে শিউরে উঠল কামিনী। লিজার ছেলেকে যে তুলে নেওয়া হয়েছিল, রাজেশ

সে-কথা তার মিনিদিদিকে ইতিমধ্যে জানিয়ে থাকবে। কামিনী তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাচ্চাটার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করিসনি তো রাজু?"

রাজেশ হেসে বলল, "এমন খারাপ ব্যবহার করেছি যে, আমাকে ছেড়ে জনি তার মায়ের কাছে ফিরতেই চাইছিল না। ওকে এক বাক্স চকোলেট, তিনটে পুতুল, এক প্যাকেট রং-পেনসিল আর একটা ছবির বই কিনে দিয়েছি। তা ছাড়া খাইয়েছি দুটো প্যাঁড়া আর একটা আইসক্রিম। একে তুমি খারাপ ব্যবহার বলবে?"

দোতলার কাজের লোকটি ইতিমধ্যে আর-এক রাউন্ড চায়ের ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। ভাদুড়িমশাই টি-পট থেকে তাঁর পেয়ালায় লিকার ঢেলে নিয়ে দুধ আর চিনি মেশালেন, তারপর পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "এবারে তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি মিনি। বার্টিকে তুই সমস্ত কথা সত্যিই খুলে বলেছিস তো?"

উত্তরটা বার্টির কাছ থেকে এল। "ও, ইয়েস। শি মেড আ ক্লিন ব্রেস্ট অব ইট।"

ভাদুড়িমশাইয়ের চোখ হঠাৎ সরু হয়ে গেল। বললেন, "নেকলেসটা যেদিন বেহাত হয়, সে-দিন তারিখটা ছিল ছাব্বিশে এপ্রিল। আমার ধারণা তার ক'দিন আগে এক সন্ধেবেলায় এমন একটা লোক এসে মিনির সঙ্গে দেখা করেছিল, যে এখানকার স্থানীয় লোক নয়। মিনি কি তাও তোমাকে জানিয়েছে?"

মিনি বলল, "অফ কোর্স আমি তাও বার্টিকে জানিয়েছি। কিন্তু আঙ্কল, তুমি সে-কথা জানলে কী করে? তোমাকে তো জানাইনি।"

"জানালে ভাল করতি, তা হলে আর আমাকে কষ্ট করে মাথা খাটিয়ে সেটা অনুমান করে নিতে হত না।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "যা-ই হোক, এবারে আমার অনুমানের কথাটা বলি। আমার অনুমান, বার্টি যে সে-দিন সন্ধেবেলায় বাড়িতে থাকবে না, লোকটা তা জানত। এটাও সে জানত যে, ওই সময়ে মিনি ছাড়া আর কেউ এ-বাড়িতে থাকে না, কাজের লোকেরা বিকেল-বিকেলই যে যার পাহাড়ি বস্তিতে ফিরে যায়। এ-সব জেনেই সে মিনির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। প্রথমে চেষ্টা করেছিল এই হাউসিং কমপ্লেক্সের সামনের গেট দিয়ে ঢুকতে। সেন্ট্রি তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোন বাড়িতে কার কাছে সে যেতে চায়। লোকটা নিজের নাম জানিয়ে বলে, মিসেস রাসেলের সঙ্গে দেখা করতে চায় সে। তা এখানকার যা নিয়ম, সেন্ট্রি বক্স থেকে মিনিকে ফোন করে লোকটার নাম বলে জানতে চাওয়া হয় যে, মিনি তার সঙ্গে দেখা করবে কি না। মিনি জানিয়ে দেয়, না, সে কাজে ব্যস্ত, এখন কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। ফলে সেন্ট্রি-বক্স থেকে লোকটাকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়।....কী রে, মিনি, ঠিক বলছি তো?"

"ঠিকই বলছ," কামিনী বলল, "আই জাস্ট রিফিউজড টু সি হিম।"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "সেন্ট্রি-বক্স থেকে ভাগিয়ে দিলে কী হয়, সে

কি সহজে ফিরে যাবার পাত্র? তার তো টাকা চাই। তাই সামনের গেট থেকে তাড়া খেয়ে সে এই হাউসিং কমপ্লেক্সের পিছন দিকে চলে যায়, তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পাঁচিল টপকে এই কমপ্লেক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে।....কী মিনি, আমার অনুমান কি ভুল?"

মিনি বলল, "আমি বলতে পারব না। ইন ফ্যাক্ট, সে কী করে এই কমপ্লেক্সের মধ্যে ঢুকেছিল, পাঁচিল ডিঙিয়ে, না পাহারাদারকে ঘুষ দিয়ে, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার নেই। আর ইউ সিয়োর যে, সে ওই উঁচু পাঁচিল টপকেছিল?"

"অফ কোর্স আই অ্যাম।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "এ-কথা কেন বলছি, সেটা পরে জানাব। তার আগে বলি, তুই তো সাফ জানিয়ে দিয়েছিলি যে, লোকটার সঙ্গে তুই দেখা করবি না, অথচ তার খানিক বাদেই তোদের সদর-দরজার কলিং বেল বেজে ওঠে, আর নীচে নেমে দরজা খুলে তুই অবাক হয়ে যাস।"

"অবাক হব না?" মিনি বলল, "আমি ভেবেছিলুম, নিশ্চয় বার্টি। আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছে। অথচ দরজা খুলে দেখি, যার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না, দরজার সামনে সেই লোকটাই দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। কিন্তু আমি চেঁচিয়ে ওঠার আগে সে-ই আমার বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে বলে, চেঁচালেই গুলি করব, ভিতরে চলো, কথা আছে।"

"তুইও তাকে ভিতরে ঢুকতে দিলি, কেমন?"

"তা নইলে তো গুলি খেয়ে মরতে হত।"

"ঠিক কথা।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "গুলি খেয়ে মরাটা কোনও কাজের কথা নয়। কিন্তু মিনি, সে তো আর 'হাউ ডু ইউ ডু' বলতে ভিতরে ঢোকেনি, নিশ্চয় টাকা চাইতে এসেছিল। তা-ই না?"

"সবই তো জানো দেখছি।"

"কত টাকা?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "নিশ্চয় বেশ মোটা অ্যামাউন্ট?"

"হ্যাঁ, পাঁচ লাখ।"

"তাতে তুই কী বললি?"

"অত টাকা বাড়িতে নেই, বাড়িতে বড়জোর শ-পাঁচেক থাকতে পারে। তাতে বলল, ঠিক আছে, আপাতত তা-ই দাও, তবে পরে কিন্তু আবার আমি আসব। আমি আর কথা না-বাড়িয়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিই।"

শুনে ভাদুড়িমশাই একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ওকে বসিয়েছিলি কোথায়, আর ছিলই বা কতক্ষণ?"

মিনি বলল, "এত ময়লা জামাকাপড় পরে এসেছিল যে, আমি চাইনি বাইরের কেউ ওকে দেখে ফেলে। একতলার ড্রয়িংরুম আর লাইব্রেরি-রুমটা তো বাইরের দিকে, তাই সেখানে না বসিয়ে ওকে ডাইনিং রুমে নিয়ে আসি। সেখানেই তা প্রায় আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মতন ছিল।"

"যতক্ষণ ছিল, তুই ওকে চোখে-চোখে রেখেছিলি?"

"তা তো রেখেছিলুমই।"

"তার মধ্যে দু-চার মিনিটের জন্যেও কি ও তোর চোখের আড়াল হয়নি?'

"মনে তো হয় না..." বলে মিনি এক মুহূর্ত একটু ভেবে নিয়ে বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওকে ডাইনিং রুমে বসিয়ে রেখে একটুক্ষণের জন্যে আমাকে একবার পাশের লাইব্রেরি-ঘরে যেতে হয়েছিল।"

ভাদুড়িমশাইয়ের চোখ দেখলুম আবার সরু হয়ে এসেছে। বললেন, "কেন গিয়েছিলি?"

"আমাদের খুচরো খরচপত্তরের জন্যে কিছু টাকা আমি ওখানেই একটা ড্রয়ারের মধ্যে রাখি। সেখান থেকে ওই পাঁচশো টাকা নিয়ে আসতে গেসলুম। টাকাটা নিয়ে আসতে তা ধরো মিনিট খানেক লেগেছিল।"

"সেই একটা মিনিট ও একা ছিল তোদের ডাইনিং রুমে।"

"হ্যাঁ।"

উত্তরটা শুনে একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই ভাদুড়িমশাই প্রশ্ন করলেন, "হ্যাঁ রে মিনি, ওই যে এনার্জি-প্লাস বলে একটা টনিক তুই খাস, ওর বোতলটা তুই রাখিস কোথায়?"

হঠাৎ এমন প্রশ্ন করা হবে, কামিনী তা ভাবতে পারেনি। বলল, "এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"কোথায় রাখিস, তা-ই বল। কেন জিজ্ঞেস করছি, পরে বলব। আগে আমার কথার জবাব দে।"

'টনিকটা তো খাই লাঞ্চ আর ডিনারের আগে। বোতলটা তাই ডাইনিং রুমের টেবিলের উপরেই থাকে। আজও তা-ই আছে। আজকেরটা অবশ্য নতুন বোতল। মানে পরশু দিন তুমি যে নতুন বোতলটা আমার জন্যে কিনে এনেছ।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওটার কথা হচ্ছে না, আমি বলছি এনার্জি-প্লাস টনিকের পুরনো বোতলটার কথা। লোকটা যে-দিন তোর কাছে আসে, টনিকের পুরনো বোতলটা সে-দিন তা হলে তোদের ডাইনিং টেবিলে ছিল, আর লোকটাকেও তুই বসিয়েছিলি তোদের ডাইনিং রুমেই। তা-ই না?"

"হ্যাঁ।"

"আর মাঝখানে তুই মিনিট খানেকের জন্য ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলি, এই তো?"

"হ্যাঁ, মাত্তর মিনিট খানেকের জন্যে।" মিনি বলল, "পাশের ঘর থেকে টাকাটা নিয়ে আসতে তার বেশি সময় লাগেনি।"

"ওরে মিনি," ভাদুড়িমশাই বললেন, "তুই বলছিস মাত্তর এক মিনিট। আর আমি ভাবছি যে বিষ মেশাবার পক্ষে সে তো যথেষ্ট সময়।"

শুনে শুধু মিনি কেন, আমরা সবাই চমকে উঠলুম।

বার্টি বলল, "বিষ! কী বলছেন আপনি? কে বিষ মেশাল? কীসের সঙ্গে মেশাল?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "যে-লোকটা সে-দিন পাঁচিল ডিঙিয়ে তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, টনিকের পুরনো বোতলে সে-ই বিষ মেশায়। তার জন্যে সে পুরো একটা মিনিট সময় পেয়েছিল।"

রাজেশ হাসছিল। বলল, "বিষটা যে আর্সেনিক, ল্যাবরেটরি-টেস্টের রিপোর্ট পেয়ে কালই তা আমি আঙ্কলকে জানিয়ে দিই।....কিন্তু আঙ্কল, টনিকে যে বিষ মেশানো হয়েছে, এমন সন্দেহ আপনার হল কী করে?"

"সন্দেহ হল স্রেফ মিনির একটা কথা শুনে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "মিনি বলেছিল, টনিকটার স্বাদ অতি বিচ্ছিরি। শুনে আমার খটকা লাগে। তার কারণ, এনার্জি-প্লাস একটা বিখ্যাত কোম্পানির বিখ্যাত টনিক, চটপট এনার্জি বাড়াবার জন্য অনেকেই খায়। আমার বোন মালতীর কিছুদিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল, সেরে ওঠার পরে তাকেও ওটা খেতে দেখেছি, কিন্তু কই, কাউকে তো কক্ষনো বলতে শুনিনি যে, ওটার স্বাদ খারাপ। মিনির তা হলে স্বাদটা খারাপ লাগছে কেন?.... না রাজেশ, প্রথমেই যে বিষের কথা ভেবেছিলুম, তা নয়। শুধু সন্দেহ হয়েছিল যে, হয় ওটা স্পুরিয়াস, অর্থাৎ জাল, আর নয়তো ওতে কিছু মেশানো হয়েছে।"

"কিন্তু মিনিদিদিকে প্রথমেই সে-কথা আপনি বলেননি?"

"কেন বলব? তবে হ্যাঁ, মিনি ওটা খেয়ে যাক, তাও আমি চাইনি। তাই, আমারও এনার্জি বাড়ানো দরকার বলে ভুজুং দিয়ে বোতলটা আমি মিনির কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে উত্তরকাশী যাই, গিয়ে এক ফাঁকে বোতলটা তোকে দিয়ে বলি যে, এর কনটেন্টটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তা পরীক্ষার ফল তো জানাই গেল।"

আমি বললুম, "কিন্তু টনিকটা তো লিজা এনে দিয়েছিল। কামিনীকে ওটা নিয়মিত খেতেও বলেছিল সে-ই। বিষ মেশাবার ব্যাপারে আপনার সন্দেহও তাই লিজার উপরেই পড়া উচিত ছিল, তা-ই না?"

"আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "ইন ফ্যাক্ট, এ-ব্যাপারে আমি প্রথম সন্দেহ করেছিলুম লিজাকেই। কিন্তু কাল রাত্তিরে হঠাৎ আমার খটকা লাগে।"

"কেন?" সদানন্দবাবু বললেন, "কেউ কি এমন কিছু বলেছিল, সন্দেহটা যাতে লিজার ওপর থেকে ওই লোকটার ওপরে গিয়ে পড়ে?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "না না, এটা কারও কিছু বলার ব্যাপার নয়, কোথাও কিছু দেখার ব্যাপার। দুটো জিনিস আমি দেখেছি। একটা পরশু দেখেছি, একটা

কাল। একা আমিই যে দেখেছি, তা নয়। যেমন আমি দেখেছি, তেমন সদানন্দবাবু আর কিরণবাবুও দেখেছেন। কিন্তু তার তাৎপর্য ওঁরা ধরতে পারেননি। আগে বলি, পরশু-দেখা জিনিসটার কথা। জিনিসটা আর কিছুই নয়, ব্রাউন রঙের এক ফালি ছেঁড়া কাপড়। ফালিটা এই কমপ্লেক্সের কম্পাউন্ড-ওয়ালের উপরের কাঁটাতারে আটকে ছিল।....কী কিরণবাবু, মনে পড়েছে?"

বললুম, "তা কেন পড়বে না? তা ওটারও কি কোনও তাৎপর্য আছে নাকি?"

"আছে বই কী।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওই ফালি-কাপড় দেখে আমি বুঝে নিই যে, এখানকার কম্পাউন্ড-ওয়াল টপকে কেউ ভিতরে ঢুকেছিল। কিন্তু ওই পথে ঢোকার সময় কিংবা ওই পথে বেরিয়ে যাবার সময় কাঁটাতারে তার প্যান্ট আটকে গিয়ে ছিঁড়ে যায়, আর ছেঁড়া অংশটা ওখানেই ঝুলতে থাকে। তারপর কাল রাতে যে-লোকটার সঙ্গে একেবারে হঠাৎই আমাদের পরিচয় হল, দেখলুম যে, তার প্যান্টের পায়ের দিকটা হাঁটু অব্দি গোটানো। সদানন্দবাবুর সেটাকে ইনডিসেন্ট ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল, তবে আমি ঠিকই বুঝে গিয়েছিলুম যে, প্যান্টটার পায়ের অংশ ছেঁড়া বলেই সেটা ঢাকা দেবার জন্যে লোকটা তার প্যান্টের পায়ের দিকটা ওইভাবে গুটিয়ে রেখেছে। সদানন্দবাবুকে আমি সে-কথা বলেছিলুমও।"

সদানন্দবাবু বললেন, "ওরেব্বাবা! তারপর?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তারপর আর কী, বুঝে গেলুম যে, এ-লোকটাই পাঁচিল টপকে এই হাউসিং কমপ্লেক্সে ঢুকেছিল। আর সে-ই যে ভয় দেখিয়ে হিরের নেকলেস আর মুক্তোর মালা আদায় করার পাণ্ডা, তাও তো ততক্ষণে আমরা বুঝে গেছি। তাই এতেও আর আমার সন্দেহ রইল না যে, এই হাউসিং কমপ্লেক্সে সে মিনির কাছেই এসেছিল। তখন ভাবতে লাগলুম, কেন এসেছিল। তার কাজ তো ভয় দেখিয়ে যতটা পারে আদায় করে নেওয়া। তা ভয় দেখাবার কাজটা তো নোংরা কিছু ছবি পাঠিয়ে, চিঠি লিখে আর ফোনে হুমকি দিয়েও করা যায়। তা হলে সে-সব করার আগে সে দেখা করতে এসেছিল কেন? এমন কী কাজ ছিল তার, যার জন্যে এখানে আসতেই হয়েছিল তাকে?"

একটুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "একই সঙ্গে ভাবছিলুম বিষ মেশাবার কথাটাও। ওটা কি সত্যিই লিজা মিশিয়েছে? সে কেন এই বোকামি করবে? সে তো জানে যে, সে-ই যে মিনিকে টনিকটা এনে দিয়েছে আর মিনিকে সেটা নিয়মিত খেতেও বলেছে সে-ই, মিনির ডাক্তার-স্বামীর পক্ষে সেটা জানাই স্বাভাবিক। তা হলে লিজা জেনেশুনে এই ঝুঁকি নেবে কেন? আর তখনই একেবারে বিদ্যুচ্চমকের মতন আমার মনে হল, পাঁচিল টপকে যে-লোকটা এসে মিনির সঙ্গে দেখা করেছিল, বিষটা সে-ই মিশিয়ে দিয়ে যায়নি তো? তা মিনির কথা শুনে এখন বুঝতে পারছি

যে, এটাও আমার ভুল অনুমান নয়।"

রাজেশ বলল, "আপনার কোনও অনুমানই ভুল নয়, আঙ্কল।" তারপর মিনির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "ভয় পেয়ো না, মিনিদিদি, ল্যাবরেটরি-টেস্টের রিপোর্ট আমি দেখেছি, যে-পরিমাণ আর্সেনিক তোমার পেটে গেছে, তাতে তুমি মরবে না।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "এবারে আসল কথায় আসি। পুলিশকে আমি লিখিতভাবে কিছুই জানাইনি। লিখিত অভিযোগ জানালে মামলা হবে। তা যদি হয়, তা হলে বালুর অন্তত বছর কয়েকের জেল তো হবেই, লিজাও বেকসুর খালাস পাবে না। অথচ আমার ধারণা, লিজা যা-ই করুক, সেটা স্বেচ্ছায় করেনি, প্রাণের ভয়ে করেছে। কিন্তু আদালত সে-কথা বিশ্বাস করলেই বা কী, জেল না হোক, হাসপাতালে তার চাকরিটা আর থাকবে না। সে-ক্ষেত্রে তো আসল শাস্তি হবে তার ওই তিন বছরের বাচ্চা ছেলেটির। মায়ের চাকরি গেলে সে তো না-খেয়ে মরবে।"

বার্টি বলল, ঠিক কথা।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "আর-একটা কথাও আমি ভাবছি। মামলা হলে তার খবর চাপা থাকবে না। কাগজে-কাগজে এমন হেডলাইন দিয়ে খবর বেরুবে যে, তোমাদের পারিবারিক মানমর্যাদা নষ্ট হবে। সেটাও ভাবো।"

"ভাবার কিছু নেই।" বার্টি বলল, "পুলিশের কাছে আমরা কোনও অভিযোগ জানাব না।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, বার্টি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, 'য়ু হ্যাভ টেক্‌ন দ্য রাইট ডিসিশান। তবে হ্যাঁ, এস. পি.-কে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানাব লোকটাকে ছেড়ে দেবার সময় যেন তাকে শাসিয়ে দেওয়া হয় যে, ফের যদি সে এই তল্লাটে ঢোকে, তো পুলিশ তার হাড়গোড় ভেঙে দেবে।"

বার্টি বলল, "ঠিক আছে, সত্যিই আমি চাই না যে, মামলা হোক। কিন্তু আঙ্কল, ছবিগুলোর কী হবে? ওগুলোর নেগেটিভ তো লোকটার কাছেই রয়ে গেল। ইচ্ছেমতো প্রিন্ট করবে আর এখানে-ওখানে পাঠাবে! সে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "ছবিগুলো তুমি দেখেছ?"

"মিনিই দেখিয়েছে!"

"অথচ তুমি বুঝতে পারোনি যে, ওগুলো জাল ছবি? তাও অত্যন্ত কাঁচা হাতের জাল? আশ্চর্য! ওহে বার্টি, আমি তো দেখেছি মাত্র একটা ছবি, তাতেই বুঝেছি যে, ওতে শুধু মুখটাই মিনির, বাদবাকি শরীরটা অন্য কোনও মেয়ের!"

আমি বললুম, "তার মানে হাঁসজারু?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ঠিক তা-ই। ব্ল্যাকমেল করার এই কায়দাটা আজকাল খুব চলছে।"

কামিনী বলল, "বাদবাকি শরীরটা আমার নয়, তুমি সেটা বুঝলে কী করে?"

"ওরে বোকা মেয়ে, তুই নিজের শরীরটাও চিনিস না?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তোর বাঁ হাতের কনুইয়ের এক ইঞ্চিটাক উপরে, হাতের সামনের দিকে, কোনও জড়ুল আছে?"

কামিনী তাড়াতাড়ি তার বাঁ হাতটা দেখে নিয়ে বলল, "কই, নেই তো!"

"অথচ, ছবিতে যে-মেয়েটার শরীরকে তোর মুখের নীচে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তার বাঁ হাতের ওই জায়গায় রয়েছে একটা মস্ত জড়ুল! তাই বলছিলুম যে, এটা নেহাতই কাঁচা হাতের কাজ!"

শুনে কামিনী বলল, "যাক বাবা, বাঁচলুম! কী যে দুর্ভাবনা হচ্ছিল, সে আর বলবার নয়!"

নীচ থেকে অর্জুন খবর পাঠাল, লাঞ্চ রেডি, ইচ্ছে হলে আমরা এবারে খেতে বসতে পারি।

খাওয়ার টেবিলেই বার্টি ঘোষণা করল যে, রোগীদের কাছ থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে কালই সে সবাইকে নিয়ে গঙ্গোত্রী যাবার প্ল্যান এঁটেছে। কামিনীর জন্মদিন উপলক্ষে এটাই তার উপহার।

ল্যাঞ্চের পরে বিকেল অব্দি জোর আড্ডা হল। রাজেশ বিদায় নিল বিকেলবেলায়। বলল, তার ছুটি পেতে কোনও অসুবিধে হবে না, গঙ্গোত্রী যাবার পথে উত্তরকাশী থেকে তাকে যেন আমরা তুলে নিই।

সন্ধে নাগাদ ভাদুড়িমশাই, সদানন্দবাবু আর আমি গিয়ে নদীর ধারে বসলুম। সদানন্দবাবু বললেন, "আচ্ছা মশাই, পাজি লোকটা মনে হল আপনার চেনা। কে ও?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "বালুচন্দ্রন। মিনির সেকেন্ড হাজব্যান্ড। ফিল্মি ফাইটার। এককালে মারপিটের ছবিতে ওর চাহিদা ছিল, এখন আর কেউ পোঁছে না।"

শুনে সদানন্দবাবু বললেন, "ছ্যা ছ্যা!"

রচনাকাল : জুন, ২০০২

জা ল-ভে জা ল

"রাত বারোটা। খিল-আঁটা ঘরের মধ্যে অন্য কোনও আলো নেই। শুধু একটা জিরো-পাওয়ারের নীল বাল্‌ব জ্বলছে, আর সেই বাল্‌বের দিকে চোখ রেখে একেবারে চুপ করে আমি বসে আছি। এমন সময়ে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চেহারাটা তো আমার মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে আছে, তাই কোনও ভুলভাল হল না, হওয়ার কথাও নয়, দেখবামাত্র চিনতে পারলুম যে, এ সেই লোক। আবলুশ কাঠের মতো মিশমিশে কালো শরীর, যেমন রোগা তেমনি ঢ্যাঙা, গায়ে একটা সাদা আলখাল্লা আর মাথায় সেই চকরা-বকরা টুপি। আর চোখ! দেখলে মনে হয় যেন চোখ নয়, চোখের কোটরের মধ্যে কেউ জ্বলন্ত দু'টুকরো কয়লা বসিয়ে রেখেছে। মামাবাবু, অমন চেহারা একবার দেখলে আর ভোলা যায় না, সারা জীবন মনে থাকে। আমিও দেখবামাত্র বুঝতে পারলুম যে, এ আর কেউ নয়, মোম্বাসার সেই....."

কথাটা শেষ হল না। গল্পের সূচনাতেই সদানন্দবাবু সেই যে তাঁর দোদুল্যমান পা দুটিকে সোফার উপরে টেনে নিয়ে জোড়াসন হয়ে বসেছিলেন, তারপরে আর নীচে পা নামাননি। সেই অবস্থাতেই মাথাটাকে যতটা সম্ভব সামনে ঝুঁকিয়ে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, "কালীচরণ?"

অমু বলল, "তা ছাড়া আর কে! সেই যে আফ্রিকায় আমার পিছু নিয়েছিল, এখনও আমাকে ছাড়েনি।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু অমু, তুমিই তো বললে যে, ঘরে খিল আঁটা ছিল। তা হলে সে ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?"

"সে তো আমিও বুঝতে পারছি না," অমু বলল, "অথচ ঢুকে যে ছিল, তাও তো মিথ্যে নয়। আবার ঘর থেকে যখন বেরিয়ে গেল, তখনও যে সে দরজার খিল খোলেনি, তাও আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

সদানন্দবাবু বললেন, "বাবা রে! তারা ব্রহ্মময়ী মা গো! যা বলচ, তাতে তো গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় হে!"

অরুণ সান্যাল বললেন, "চোখের ভুল! ওই যাকে দৃষ্টিবিভ্রম বলে আর কী। জাস্ট গো টু অ্যান আই-স্পেশ্যালিস্ট অ্যান্ড গেট ইয়োর আইজ থরোলি এগজামিন্‌ড। ভাল কোনও স্পেশ্যালিস্টের সঙ্গে জানাশোনা আছে? না থাকে তো বলো, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

কৌশিক এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বাবার কথা শুনে বলল, "কী যে বলো, বাবা! অমু যে একজন চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার, তার ওপরে একটা মাল্টিন্যাশনাল

কনস্ট্রাকশন কোম্পানির পুরো একটা ডিভিশনের কর্তা, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? ওর কাজ তো পুরো চোখেরই কাজ। গাদা-গাদা প্ল্যানের মাইনিউটেস্ট ডিটেল পর্যন্ত যাকে দেখে দিতে হচ্ছে, যে-সব প্ল্যানের যে-কোনও একটা ছোট্ট ভুলও নজর এড়িয়ে গেলে একটা ডিজাস্টার হয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়, তার চোখের দোষ থাকলে চলে?''

অমু বলল, ''কৌশিক ঠিক বলেছে মেসোমশাই। ডক্টর পট্টনায়কের নাম শুনেছেন নিশ্চয়?''

''তা কেন শুনব না?'' অরুণ সান্যাল বললেন, ''দিল্লির নামজাদা আই-স্পেশ্যালিস্ট। কিন্তু তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া তো শুনেছি ভীষণ শক্ত, সারাক্ষণ নাকি ভিড় লেগে আছে।''

''তা লেগে আছে ঠিকই, কিন্তু আমার খুব-একটা অসুবিধে হয়নি। আমাদের কোম্পানি থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেওয়া হয়েছিল। তো তিনি খুব যত্ন করে পরীক্ষা করে বললেন, নাথিং রং, কোথাও কিছু গণ্ডগোল নেই।''

মালতী ইতিমধ্যে আর-এক রাউন্ড চা পাঠিয়ে দিয়েছিল। পিরিচ থেকে পেয়ালা তুলে তাতে ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর পেয়ালাটাকে নামিয়ে রেখে সেন্টার টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে অরুণ সান্যালের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''এটা চোখের ব্যাপার নয়, অরুণ।''

অরুণ সান্যাল বললেন, ''তা হলে?''

''মনের ব্যাপার। হ্যালুসিনেশন।''

সদানন্দবাবু বললেন, ''সেটা আবার কী?''

''ধরুন,'' ভাদুড়িমশাই বললেন, ''কাউকে নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছেন। এমন অনেক সময়ই করেন তো?''

''তা করি বই কী।''

''তখন মনের মধ্যে তার একটা ছবিও ফোটে নিশ্চয়?''

''তা তো ফোটেই।''

''হ্যালুসিনেশন হচ্ছে তারই একটা প্রোজেকশানের ব্যাপার।'' ভাদুড়িমশাই মৃদু হেসে বললেন, ''মনের ছবিটা বাইরে প্রোজেক্টেড হল, এই আর কী। কিন্তু আপনি সেটা বুঝলেন না ; আপনি ভাবলেন, যার কথা চিন্তা করছিলেন, সত্যি বুঝি তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। আসলে এটা কিন্তু চর্মচক্ষে দেখা নয়, পুরোপুরি মনশ্চক্ষে তাকে দেখছেন আপনি। ইট্‌স আ ট্রিক ইয়োর মাইন্ড হ্যাজ প্লেড অন ইউ।''

অরুণ সান্যাল বললেন, ''দ্যাট্‌স ইট্। বুঝলে হে অমু, দাদা ঠিকই বলেছেন।

তা মোম্বাসার সেই কালীচরণকে নিয়ে ইদানীং খুব ভাবছিলে বুঝি?"

অমু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "মোটেই না। ভাবছিলুম ঠিকই, তবে কালীচরণকে নিয়ে নয়।"

কৌশিক বলল, "তা হলে কী নিয়ে ভাবছিলি?"

"সে তো গোড়াতেই বলেছি।" অমু বলল, "আমাদের কোম্পানির কাজের যে এরিয়া, হালে তার একটা বড় রকমের এক্সটেনশান হচ্ছিল, আর তাই নিয়ে দেখা দিচ্ছিল এমন কয়েকটা সমস্যা, যা তক্ষুনি-তক্ষুনি সর্ট আউট না করলেই নয়। দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। কিন্তু সর্ট আউট করব কী, নিজেরই কয়েকটা পারিবারিক ঝঞ্ঝাটে আমি তখন এমন ব্যতিব্যস্ত যে, আপিসের কাজে মনই বসাতে পারছিলুম না। তা কৌশিক, আমাদের আপিসে যে একটা মেডিটেশান-সেন্টার আছে, সেটা জানিস তো?"

প্রশ্নটা কৌশিককে করা হয়েছিল, কিন্তু উত্তরটা এল কৌশিকের বাবার কাছ থেকে। অরুণ সান্যাল হেসে বললেন, "তোমাদের আপিসে আছে কি না জানি না, তবে আজকালকার অনেক আপিসেই আছে। কাজের টেবিলে বসার আগে কি কারখানার ফ্লোরে ঢোকার আগে যোগের কয়েকটা আসন করা, আর অন্তত মিনিট পাঁচ-সাত মেডিটেশান করা সেখানে একেবারে কম্পালসারি। ওতে নাকি কাজে মন বসাবার ব্যাপারে খুব সুবিধে হয়।"

সদানন্দবাবু বললেন, "যাব্বাবা, কাজে বসার আগে মেডিটেশান? মানে ধ্যান? ধ্যান তো সন্নিসিরা করে! ও মশাই, আপনি এ-সবে বিশ্বেস করেন নাকি?"

অরুণ স্যানাল বললেন, "ধুস্, যত্ত সব ফ্যাড্!"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "না হে অরুণ, সত্যিই নাকি ওতে কাজ হয়।"

অমু বলল, "সত্যিই হয়, মামাবাবু। তো যা বলছিলুম। ঘাড়ে একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে, অথচ অনেক চেষ্টা করেও কাজে মন বসাতে পারছি না, ফলে আর উপায় না দেখে শেষপর্যন্ত আমি আমাদের মেডিটেশান-সেন্টারে চলে যাই। গিয়ে, সেখানে যিনি চার্জে আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার সমস্যার কথা খুলে বলি।"

"তিনি তাতে কী বললেন?"

"বললেন যে, আপিস থেকে বাড়ি ফিরে আমাকে আরও গোটা দুই আসন করতে হবে। আর হ্যাঁ, আমার আসল সমস্যা তো কনসেনট্রেশনের, তো সেটা যাতে হয়, তার জন্যে আমাকে কোনও কিছু নিয়ে ডিপলি কিছু চিন্তা করার আগে অন্য তাবৎ চিন্তা থেকে মনকে একেবারে পুরোপুরি মুক্ত করে ফেলতে হবে।"

কৌশিক বলল, "তার মানে?"

"তার মানে মনটাকে একেবারে ফাঁকা, ব্ল্যাঙ্ক করে ফেলা চাই।" অমু বলল,

"আমাদের মেডিটেশান সেন্টারের ট্রেনার প্রোফেসর যোগলেকর বললেন, ঘুমুতে যাবার আগে রোজ এই ধরুন হাফ অ্যান আওয়ার চেষ্টা করে দেখুন। হয়ে যাবে।"

সদানন্দবাবু বললেন, "হল?"

"প্রথম দু'দিন হয়নি, হল থার্ড নাইটে। সুলেখা আর বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমার লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে, দরজায় খিল এঁটে রাত সাড়ে এগারোটায় মেডিটেশানে বসি, আর বারোটার মধ্যেই মন্ একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে অমু বলল, "তার পরেই ঘটে এক তাজ্জব কাণ্ড। আমাদের কাজকর্মের এরিয়ার এক্সটেনশান নিয়ে ওই যে কতগুলো অলমোস্ট ইনসারমাউন্টেব্‌ল সমস্যার কথা বলছিলুম, বললে বিশ্বাস করবেন না, মামাবাবু, তার সলিউশনগুলো একেবারে টকাটক আমার মাথায় এসে যেতে থাকে। ওয়ান আফটার অ্যানাদার। ওরই মধ্যে এমন জটিল একটা ক্যালকুলেশানের অঙ্ক ছিল, যার উত্তর কিছুতেই মেলানো যাচ্ছিল না। কিন্তু সেটাও মিলিয়ে ফেলি, ইন আ ফ্ল্যাশ!"

অমু চুপ করার পর মিনিট খানেক কেউ কোনও কথা বলল না। সবাই চুপচাপ বসে আছি। সেই নীরবতাকে ভাদুড়িমশাই-ই প্রথম ভাঙলেন। প্রশ্ন করলেন, "তার পরে আর মেডিটেশানে বসোনি?"

হঠাৎই কেমন যেন নিষ্প্রভ ঠেকল অমুকে। নিচু গলায়, প্রায় আত্মগতভাবে বলল, "তার পরেও দিন তিন-চার বসেছিলুম, কিন্তু কী জানি কেন, তারপরে আর দরকারই হত না। বিনা মেডিটেশানে, বিনা চেষ্টায় মনটা মাঝে-মাঝে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যেতে লাগল। দিনের মধ্যে যে-কোনও সময়ে, যে-কোনও জায়গায়। আর তখনই ঘটত একটা অদ্ভুত ব্যাপার।"

কী ব্যাপার, সেটা বলার আগে বোধহয় জানানো দরকার যে, অমু কে। অবশ্য ভাদুড়িমশাইয়ের হরেক কাহিনী যাঁরা পড়েছেন, অমু অর্থাৎ অমিতাভকে তাঁদের না-চেনার কথা নয়। অমিতাভ ঘোষ আমাদের কৌশিকের বাল্যবন্ধু। অরুণ সান্যালরা যখন যতীন বাগচি রোডে থাকতেন, কৌশিক আর অমিতাভ তখন তীর্থপতি ইনস্টিটিউশানে একই ক্লাসে পড়ত। অমিতাভ পরে শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোয়। চাকরির সূত্রে প্রথম দিকে তাকে আফ্রিকার কিনিয়ায় যেতে হয়েছিল। সেই সময়ে মোম্বাসা বন্দরে কালীচরণ নামে একটি রহস্যময় লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। লোকটিকে রহস্যময় বলছি এই কারণে যে, বিস্তর চেষ্টা করেও তার সম্পর্কে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানা যায়নি। এদিকে অমিতাভর ধারণা, কালীচরণ তার পিছু নিয়েছে আর আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে তার গোটা জীবন। 'আড়ালে আছে কালীচরণ' বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা

নিশ্চয় এ-সব কথা জানেন। এখানে যা বলতে চাইছি, তা এই যে, সেই ঘটনার পরে তো বেশ কিছুকাল কেটে গেছে, তা অমিতাভর ইতিমধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে শুরু হয়েছিল, কালীচরণ আর তাকে অনুসরণ করছে না। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়, কালীচরণ তাকে ছাড়েনি। অমিতাভর জীবনে কীভাবে সে ফের দেখা দিয়েছে, তা তো গোড়াতেই বলেছি। এবারে আবার এই কাহিনীর খেই ধরা যাক।

ভাদুড়িমশাই বললেন, "এতক্ষণ যা বলেছ, সেটাই তো যথেষ্ট অদ্ভুত ব্যাপার। তারপরেও আবার কী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল?"

অমুর সোফার পাশের সাইড-টেবিলে একটা কাচের জারে জল রাখা রয়েছে। জার থেকে গেলাশে জল ঢেলে নিয়ে পুরো এক গেলাশ জল ঢকঢক করে খেয়ে নিল অমু। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছে বলল, "যখন-তখন যেখানে-সেখানে আমার মন একদম ফাঁকা হয়ে যায়। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্তিরে। বাড়িতে, আপিসে, বাজারে, রাস্তায়। আপিসে কনফারেন্স রুমে আমার কলিগদের সঙ্গে কথা বলছি, তখন। রাস্তায় গাড়ি চালাতে-চালাতে সিগন্যাল দেখে ব্রেক কষেছি, তখন। বাড়িতে ডাইনিং টেবিলে বসে আপনাদের বউমা'র সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তা সেরে নিচ্ছি, তখন। বাচ্চাটাকে তার কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নামিয়ে দিয়ে গাড়িতে ফিরে ফের স্টার্ট দিচ্ছি, তখন। একেবারে হঠাৎ-হঠাৎ মন একদম ব্ল্যাঙ্ক। কোথায় আছি, কী করছি, কিচ্ছু তখন আমার মনে নেই। উঃ, সে যে কী বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড, তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না।"

সদানন্দবাবুর চোয়াল ঝুলে পড়েছিল। হাঁ বুজিয়ে ঢোক গিলে বললেন, "বলো কী হে, এ তো অতি বিচ্ছিরি ব্যাপার!"

"বিচ্ছিরি বলে বিচ্ছিরি!" অমু বলল, "কনফারেন্স রুমে কোনও কলিগকে কিছু বলতে-বলতে মাঝপথে চুপ করে যাই। সে তাজ্জব হয়ে বলে, তারপর? অথচ আমার মুখে কোনও কথা জোগায় না। বাড়িতে আপনাদের বউমা বলে, কী হল, অমন হাঁ করে কী দেখছ? অথচ আমি চুপ করে থাকি। রাস্তায় গ্রিন সিগন্যাল পাবার পরেও গাড়িতে স্টার্ট দেবার কথা ভুলে যাই, পিছনের গাড়িগুলো অধৈর্য হয়ে ক্রমাগত হর্ন বাজাতে থাকে, ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এসে বলে, কেয়া হুয়া সাব, গাড়ি কেয়া স্টার্ট নেহি লেতি? তখন আমার চমক ভাঙে। অবস্থাটা একবার ভাবুন।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "এ তো একটা ঘোরের অবস্থা। এটা কতক্ষণ থাকত?"

"খুব বেশিক্ষণ নয়। সে ফর আ মিনিট অর টু।" অমু বলল, "তবে যখনই এটা হত, তখনই আমার কানের কাছে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেতুম। ঘরের মধ্যে একটা গুব্‌রে পোকা উড়ে বেড়ালে যে-রকম শব্দ হয়, সেই রকমের একটা

বাজিং সাউণ্ড। যেন কেউ আমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু শব্দগুলো ঠিকমতো ফর্মড হচ্ছে না।"

অরুণ সান্যাল বললেন, "কোনও ই.এন.টি.কে কনসাল্ট করেছ?"

"করেছি। কিন্তু তিনি বললেন, নাথিং রং ইন মাই হিয়ারিং ফ্যাকাল্টি।"

কৌশিক বলল, "এখনও এটা হয়?"

"আগের মতো ঘন-ঘন হয় না। আগে তো প্রায়ই হত, আর এখন এই ধর্ মাসে এক-আধ বার।"

"তা হলে হয়তো আস্তে-আস্তে এটা একেবারেই কেটে যাবে।"

"সুলেখার ধারণাও সেইরকমই।" অমুর গলা হঠাৎই ভীষণ ক্লান্ত শোনাল। "কিন্তু আমি ভাবছি কালীচরণকে নিয়ে। সে আবার হঠাৎ আমার জীবনে এসে ঢুকে পড়ল কেন?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওই একবারই তো তাকে দেখেছ। ও নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই। ওটা হ্যালুসিনেশন। হয়তো মনে-মনে তার কথা খুব ভাবছিলে, সেই ভাবনাটাই সেদিন তোমার চোখের সামনে প্রোজেক্টেড হয়েছে।"

অমু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না মামাবাবু, আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, সেদিন আমি মোটেই কালীচরণের কথা ভাবছিলুম না। ভাবছিলুম আমারই লেখা একটা ওয়ার্ক-রিপোর্ট নিয়ে। ডিরেক্টর্স' বোর্ডের মিটিংয়ে পরদিনই যেটা আমার সাবমিট করার কথা। একা ঘরে বসে রিপোর্টটা সদ্য লিখে শেষ করেছি, তারপর শুধু একটা জিরো-পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বালিয়ে রেখে অন্য সব আলোর সুইচ অফ করে দিয়ে চুপচাপ ভাবছি যে, রিপোর্টের দু-একটা জায়গার দু-একটা কথা পরদিন সকালে একটু পালটে দেব কি না, ঠিক এমন সময় কালীচরণ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। কী বলব, তাকে দেখে......"

কথাটা শেষ হবার আগেই মালতী এসে ঘরে ঢুকে বলল, "আর নয়, ঢের গপ্পো হয়েছে, এবারে উঠে পড়ো দিকি। তোমাদের খেতে দিয়েছি।"

ঠিক এই সময়েই অমুর সেল-ফোন হঠাৎ বেজে উঠল। পকেট থেকে সেল-ফোন বার করে মিনিট খানেক কানে লাগিয়ে রেখে অমু যখন সেটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল, তখন দেখলুম, তার মুখচোখ হঠাৎই যেন কেমন ফ্যাকাশে লাগছে।

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কে ফোন করেছিল?"

অস্ফুট গলায় অমু বলল, "কালীচরণ। স্রেফ একটা খবর দিল। বলল যে, সদানন্দবাবুর পকেটে যে একটা পাঁচশো টাকার নোট রয়েছে, সেটা জাল।"

সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, ভদ্রলোকের চোয়াল আবার ঝুলে পড়েছে।

।। ২ ।।

আজ ৬ মার্চ, সোমবার ২০০০ সাল। রাত দশটা বাজে। আপিস থেকে পাঁচটায় বেরিয়ে পাবলিশারের কাছে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে সাতটায় বাড়ি ফিরে, একটা লেখার খানিকটা অংশ বাকি ছিল, সেটা শেষ করি। তারপর কয়েকটা চিঠির জবাব লিখতে বসে যাই। সে-সব মিটিয়ে, রাত্তিরের খাওয়া চুকিয়ে ফের ড্রয়িং রুমে এসে বসেছি। ভাবছি গতকালের কথা।

ভাদুড়িমশাই এ-যাত্রায় মাত্র তিন দিনের জন্যে বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। শুক্র, শনি আর রবি, এই তিনটে দিন এখানে কাটিয়ে আজ রাত্তির সাতটা পঁয়তাল্লিশের ফ্লাইটে আবার বাঙ্গালোরে ফিরে গেলেন। এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে বললেন, দিন কয়েক পরে হয়তো আবার তাঁকে কলকাতায় আসতে হবে। কেন আসতে হবে, তা অবশ্য জানালেন না। মনে হচ্ছে, সি. বি. আই. অর্থাৎ চারু ভাদুড়ি ইনভেস্টিগেশানসের কলকাতা আপিসের কোনও কাজে।

অমুও আজ সকালের ফ্লাইটে দিল্লি চলে গেল। অমু কাজ করে তাদের কোম্পানির হেড-আপিসে। দিল্লির কনট সার্কাস থেকে বারাখাম্বা রোড ধরে বেঙ্গলি মার্কেটের দিকে বেশ খানিকটা এগোলে দেখা যাবে যে, সাপ্রু হাউসের কাছে মোটামুটি চওড়া একটা রাস্তা বাঁ দিকে বেরিয়ে গেছে। এই রাস্তার উপরেই অমুদের ম্যাক্রো কন্‌স্ট্রাকশান ইন্টারন্যাশনালের হেড-আপিস। মস্ত লন আর বিশাল কম্পাউণ্ড-ওয়ালা হাল-ফ্যাশানের তিনতলা বাড়ি। হঠাৎ দেখলে ধনী ব্যবসায়ীর বসতবাড়ি বলে ভ্রম হয়, আপিস-বাড়ি বলে বোঝা যায় না।

মাঝেমধ্যে আমাকে দিল্লি যেতে হয়। গেলে সাধারণত হেলি রোডের বঙ্গভবনে উঠি। সেখান থেকে অমুদের আপিস খুব কাছেই। হাতে সময় থাকায় গত জানুয়ারি মাসে একবার সেখানে গিয়ে অমুর সঙ্গে দেখাও করে এসেছিলুম। কোম্পানি থেকে ওর থাকার জন্যে যে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে, গ্রেটার কৈলাসের সেই ফ্ল্যাটে অবশ্য এখনও আমার যাওয়া হয়নি।

কালকের আড্ডার কথা যতই ভাবছি, ততই মনে পড়ছে অমুর কথা, আর ততই আমার ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। এমন যে হয়, এমন যে হতে পারে, এ তো ভাবাই যায় না। কালীচরণকে একটা খিল-আঁটা ঘরের মধ্যে রাত বারোটায় দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটাকে না হয় হ্যালুসিনেশন বলে মেনে নেওয়া গেল, আর ওই মেডিটেশানের সাহায্যে মননশক্তি বাড়িয়ে নেওয়ারও একটা ব্যাখ্যা হয়তো থাকাই সম্ভব, কিন্তু আমরা খেতে বসার ঠিক আগের মুহূর্তে অমুর সেল-ফোনে ওই যে একটা খবর এল, ওর কী ব্যাখ্যা? যে-ই খবর দিক, সে জানল কী করে যে, সদানন্দবাবুর পাঞ্জাবির পকেটে সত্যিই একটা পাঁচশো টাকার নোট রয়েছে, আর সেই নোটটা জাল?

কালীচরণ আবার এইভাবে অমুর জীবনে ফিরেই বা এল কেন? অমুর কথা যতটুকু যা জানি, তাতে অবশ্য এটা মানতে হবে যে, ছেলেটার কোনও অনিষ্ট সে আজ পর্যন্ত করেনি। বরং অমুই তার ক্ষতি করেছিল। মোম্বাসার একটা রেস্তোরাঁয় জনাকয় বন্ধুর সঙ্গে বসে অমু যখন কফি খাচ্ছিল, তখনই সে কালীচরণকে প্রথম দেখতে পায়। মিশকালো, রোগা ঢ্যাঙা লোকটা তখন সেই রেস্তোরাঁর আর-এক দিকে বসে জনাকয় শ্বেতাঙ্গ টেলি-ফিল্মওয়ালার হাত দেখে তাদের ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছিল। অমুর মনে হয়েছিল, লোকটা ঠগ, ফরচুন টেলিংয়ের ভাঁওতা মেরে বিদেশিদের ঠকাচ্ছে। নিচু গলায় কথাটা সে বলেওছিল। কিন্তু অনেক দূরে বসেও লোকটা সে-কথা শুনতে পেয়ে যায়। অমুদের টেবিলের সামনে এসে সে বলে, অমু তার ক্ষতি করছে বটে, কিন্তু তাই বলে অমুর কোনও ক্ষতি করার ইচ্ছে তার নেই। তবে হ্যাঁ, অমুকে সে আর মোম্বাসায় থাকতে দেবে না। আশ্চর্য ব্যাপার, তার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই অমুর আপিস তাকে মোম্বাসা থেকে ভারতে ফিরিয়ে নেয়।

না, সে অমুর কোনও ক্ষতি করেনি। অমু তো সত্যিই দেশে ফিরতে চাইছিল। কিন্তু একইসঙ্গে একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে থাকে তার মনে। তার ধারণা হয়, এই লোকটা, কালীচরণ, যেন আড়ালে বসে রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করছে তার জীবন। পরে এমন আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটে, যাতে তার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

কিন্তু সে তো আজকের কথা নয়, বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা। মাঝখানে চার-চারটে বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে অমু বিয়ে করেছে, একটি ছেলেও হয়েছে তার। সেই ছেলের বয়স এখন তিন বছর। ছেলের নাম শুনলুম অরুণাভ, ডাকনাম রুনু। গত জানুয়ারি মাসে যখন দিল্লিতে যাই, তখন গ্রেটার কৈলাসে যাওয়া হয়নি বলে রুনুকে আমার দেখাও হয়নি। তাকে নাকি এরই মধ্যে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। তিন বছরের একটা বাচ্চা কিনা ইস্কুলে যায়! এ তো আমরা ভাবতেও পারতুম না। পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগে তো হাতেখড়িই হত না আমাদের। তার আগেই ইস্কুল? বাবা রে, ভাগ্যিস, এ-কালে জন্মাইনি।

তো যা বলছিলুম। বউ-বাচ্চা নিয়ে অমিতাভ বেশ ভালই আছে। ভাল কোম্পানি, ভাল চাকরি, ভাল ফ্ল্যাট, তার উপর দিল্লি জায়গাটাও যা বুঝলুম তার ভালই লেগে গেছে। অমুর কথায় "দিল্লি আমাদের বেশ স্যুট করে গেছে, কিরণমামা।"

তার মানে এ-ছেলে আর কলকাতায় ফিরবে না, আস্তে-আস্তে বাংলার বাইরেই শিকড় গেড়ে বসে যাবে। তা বসুক, ওর দাদা সিদ্ধার্থ তো কানাডার মন্ট্রিয়লে চাকরি করতে গিয়ে সেইখানেই সংসার পেতেছে, অমুও সেইরকম মরিশাস কি মেক্সিকোতে পাড়ি জমাতেই পারত, তার বদলে দেশেই যে থেকে গেছে, এই রক্ষে।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল যে, বাংলায় কথা বলার লোক ছিল না বলে মোম্বাসায় অমুর মন টেকেনি। কিন্তু দিল্লিতে সেই সমস্যা থাকার কথা নয়। ওর আপিসে কি আর দু'চার জন বাঙালি সহকর্মী নেই। তা ছাড়া, যে-এলাকায় ফ্ল্যাট পেয়েছে, সেই গ্রেটার কৈলাসে বাঙালি নেহাত কম থাকে না। তার উপরে আবার পাশেই চিত্তরঞ্জন পার্ক, সে তো বলতে গেলে বাঙালি-পাড়া। অমু অতএব সুখেই আছে।

এর মধ্যে একমাত্র অস্বস্তির কাঁটা ওই কালীচরণ। কী চায় সে? পঁচানব্বইয়ের অক্টোবরের পর থেকে তো আর তার দেখা মেলেনি। হঠাৎ সে আবার অমুর জীবনে এসে দেখা দিল কেন? সদানন্দবাবুর পকেটে যে একটা পাঁচশো টাকার জাল নোট রয়েছে, তা তো আমরা কেউই জানতুম না। সে কী করে জানল? আর যদি জানল, অমুকেই বা জানাতে গেল কেন? সে যে আশ্চর্য রকমের শক্তি ধরে, স্রেফ অমুকে এই কথাটা আবার নতুন করে টের পাইয়ে দেবার জন্যে? নাকি, অমুকে দিয়ে সে এমন কোনও কাজ করিয়ে নিতে চায়, এত শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও যা সে নিজে করে উঠতে পারছে না?

জাল-নোটের ব্যাপারটা বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে। কাগজে তো এ নিয়ে ইতিমধ্যে খবর কিছু কম বেরোয়নি। তা থেকে বুঝতে পারি, জাল-নোটের জালটা মোটেই ছোট নয়, দেশের নানান জায়গায় এটা ছড়িয়ে পড়েছে। আজ যদি এখান থেকে জাল পাঁচশো টাকার নোটের খবর আসছে তো কাল আসছে ওখান থেকে। ফলে পাঁচশো টাকার নোট সম্পর্কেই জন্মে গেছে একটা ভয়। পারতপক্ষে কেউ পাঁচশো টাকার নোট নিতে চাইছে না। আমি নিজেই তো আজ ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলুম। পেট্রোল কিনে দাম মেটাতে গিয়ে একটা পাঁচশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছি, পাম্পের লোকটি বলল, "পাঁচশো টাকা ছাড়া নেই স্যার?" বললুম, "কেন, তুমি ভাঙিয়ে দিতে পারবে না?" তাতে সে একটু ইতস্তত করে বলল, "আজকের মতো পারব, কিন্তু কাল থেকে হয়তো নাও পারতে পারি, মালিকের নিষেধ আছে।"

জাল শুধু পাঁচশো টাকার নোটের কেন, পাঁচ দশ কুড়ি পঞ্চাশ আর একশো টাকার নোটেরও হয়, কিন্তু তা নিয়ে কখনও এত আতঙ্ক ছড়াতে দেখিনি। অঙ্ক বড় বলেই আতঙ্কও বেশি। আতঙ্ক কাটাবার জন্যে টিভিতে বারবার বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হচ্ছে, কোন্‌টা খাঁটি আর কোন্‌টা জাল, সেটা কীভাবে বুঝতে হবে। সদানন্দবাবু কি সেই বিজ্ঞাপন দেখেননি? যদি দেখে থাকেন তো কে তাঁকে এইভাবে একটা জাল নোট গছিয়ে দিয়ে যেতে পারল?

সদানন্দবাবুকে কালই এই প্রশ্নটা করেছিলুম। উত্তরে তিনি যা বললেন, সেও কিছু কম রহস্যজনক নয়। ঘটনাটা এই রকম।

পরশু অর্থাৎ গত শনিবার চৌঠা মার্চ তাঁকে একবার ধর্মতলার চাঁদনি মার্কেটে যেতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বাথরুমের দরজার জন্য তিনটে পেতলের কব্জা,

দেড় ডজন স্ক্রু, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, একটা মর্টিস লক, দুটো ছিটকিনি ও কিছু ছিট-কাপড় কিনবেন। মধ্য-কলকাতার যে গলিতে আমরা থাকি, সেই পীতাম্বর চৌধুরি লেনের পশ্চিম দিকে মহাত্মা গান্ধী রোড, আর পুব দিকের মুখটা মিশেছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে। এই দুটো বড় রাস্তার যে-কোনও একটা থেকে বাসে উঠে খুব সহজেই সদানন্দবাবু ধর্মতলায় চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মোড় পর্যন্ত চলে যান। তারপর ডাইনে বেঁকে দু'পা এগিয়ে মেট্রো স্টেশনে ঢুকে পাতাল রেলে ওঠেন। চাঁদনি স্টেশনে পৌঁছন দশটা নাগাদ। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ম্যাডান স্ট্রিট ধরে খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরে ঢোকেন মার্কেটে। দরদাম করে কেনাকাটা সারতে-সারতে বারোটা বেজে যায়। মার্কেট থেকে ফের চাঁদনি স্টেশনে ফিরতে-ফিরতে সওয়া বারোটা। টিকিট-কাউন্টারের সামনে কিউয়ে দাঁড়িয়ে পিছনের লোকটিকে বলতে শোনেন যে, উত্তর দিকে যাবার ট্রেন আসতে আর দেরি নেই, মিনিট খানেকের মধ্যেই এসে পড়বে। টিকিট কেটে সদানন্দবাবু তাই আর কোনও দিকে দৃক্‌পাত করেননি, তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে নামতে যান। আর তাতেই ঘটে বিপদ।

"সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত ঠিকই নেমেছিলুম। কিন্তু শেষরক্ষে হল না মশাই। কোঁচার খুটে পা জড়িয়ে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপরে একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে আছাড় খেয়ে পড়লুম।"

অরুণ সান্যালদের বাড়িতে খাবার টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল। ভাদুড়িমশাই বললেন, "তারপর?"

"তারপর যা হয় আর কী। সবাই ছুটে এল। হাতের ব্যাগের জিনিসপত্তর আর পকেটের টাকাপয়সা তো ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারাই সেগুলো ফের গোছগাছ করে তুলে দেয়।"

"ট্রেনও তক্ষুনি এসে পড়ে?"

সদানন্দবাবু বললেন, "কোতায়! গাড়ি এল আরও মিনিট দশেক বাদে।"

"অথচ কাউন্টারের কিউয়ে আপনার পিছনের লোকটি বলেছিল মিনিট খানেকের মধ্যেই এসে পড়বে, তা-ই না?"

"বিলক্ষণ। তা নইলে আর অত তাড়াহুড়ো করতে যাব কেন। ঘোর ইরেস্‌পন্‌সিব্‌ল লোক, মশাই!.....তবে হ্যাঁ, ইরেস্‌পন্‌সিব্‌ল হলেও নট এ ব্যাড ম্যান।"

"কী করে জানলেন?"

"বাঃ, জানব না? সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়েও আমার ঠিক পিছনেই ছিল তো, পড়ে যেতে ও-ই ছুটে এসে আমার হাত ধরে ফের দাঁড় করিয়ে দেয়।

জিনিসপত্তর আর পয়সাকড়িও তো ও-ই কুড়িয়ে এনে তুলে দেয় আমার ব্যাগে আর পকেটে।"

"ফের যদি লোকটাকে কোথাও দেখেন তো, চিনতে পারবেন?"

"তা কেন পারব না?" সদানন্দবাবু বললেন, "মাঝারি হাইট, শ্যামলা রং, চোখে চশমা, রোগাও নয়, মোটাও নয়, দোহারা চেহারা, আজকালকার ছেলেরা যেমন রাখে, সেই রকমের গোঁফ-দাড়ি, পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা, পায়ে চপ্পল.....ও মশাই ঠিক চিনতে পারব।"

ভাদুড়িমশাইয়ের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। দইয়ের বাটিটা টেনে নিয়ে বললেন, "আপনি বলছেন বটে চিনতে পারবেন, কিন্তু আমার ধারণা, মোটেই চিনতে পারবেন না।"

"কেন, কেন?"

"বলছি। হাইট আর গায়ের রং অবশ্য পালটাতে পারবে না। তবে এর পরে যেদিন ওকে দেখবেন, সেদিন ওর চোখে সম্ভবত চশমা থাকবে না, পায়জামা পাঞ্জাবি আর চপ্পলের বদলে পরনে থাকবে প্যান্ট শার্ট আর শ্যু, আর হ্যাঁ, গোঁফদাড়ি যদি নকল হয় তো কথাই নেই, আর যদি জেনুইন হয় তো কামিয়ে ফেলবে। তা হলে আর চিনবেন কী করে?"

সদানন্দবাবু ধাঁধায় পড়ে গেলেন। পাশ থেকে জলের গেলাশটা তুলে নিয়ে এক ঢোক জল খেয়ে বললেন, "তাই তো, কী করে চিনব?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কোনও ডিস্টিংগুইশিং মার্ক নেই?"

"সেটা আবার কী?"

"এমন কোনও চিহ্ন, যা মুছে ফেলা যায় না।"

একটুক্ষণ চিন্তা করে নিলেন সদানন্দবাবু। তারপর বললেন, "মনে পড়েছে। কপালে একটা কাটা দাগ।"

কাল দুপুরে খাওয়ার পর্ব শেষ হবার পরে আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক আমরা ও-বাড়িতে কাটাই। তারপর সদানন্দবাবুকে নিয়ে আমি চলে আসি। চলে আসার সময়ে চাঁদনি স্টেশনের লোকটা সম্পর্কে আরও দু-একটা কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আসার আগে বরং সদানন্দবাবুর সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা জানিয়ে রাখি।

সদানন্দবাবু হাসিখুশি মানুষ। উপকারী প্রতিবেশী। তাঁর মুখে প্রায় সব সময়েই একটু হাসির ছোঁয়া লেগে থাকে। তিনি নিয়ম করে রোজ ভোরবেলায় হাঁটতে-হাঁটতে গোলদিঘিতে যান ও দিঘিটিকে ঘিরে গুনে-গুনে ন'টি পাক মেরে বাড়ি ফেরেন। ছেলেবেলায় কেউ তাঁকে বলেছিল যে, গোলদিঘিতে তিনটে পাক মারলে এক মাইল হাঁটা হয়। সদানন্দবাবুর বিশ্বাস, ভোরবেলায় রোজ তিন মাইল হাঁটাই

হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা উপায়। ফলে তিনি ন'টি পাক মারেন। সদানন্দবাবুর সন্তানাদি হয়নি। বাড়ির লোক বলতে তিনি, তাঁর স্ত্রী কুসুমবালা ও পালিত কন্যা কমলি। জেঙ্কিন্‌স অ্যাণ্ড জেঙ্কিন্‌স কোম্পানির শিপিং ডিপার্টমেন্টের চাকরি থেকে যথাসময়ে রিটায়ার করেছেন। পেনশনের টাকা মাসে-মাসে তাঁর ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে ও তাতেই তাঁর সংসার-খর্চা দিব্যি চলে যায়। উপরন্তু বাড়িটি নিজের, পৈতৃক সম্পত্তিও কম পাননি, ফলে তাঁকে বেশ সচ্ছল ও সুখী মানুষই বলা যায়।

ইদানীং অবশ্য সচ্ছল বললেও সুখী বলা যাচ্ছে না। গত কয়েক দিন ধরেই দেখছি যে, ভদ্রলোকের ভুরু প্রায় সব সময়েই একটু কুঁচকে থাকে। মুখের হাসি উধাও। মনে হচ্ছিল, কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে ভদ্রলোক একটু চিন্তায় পড়ে গেছেন। আমার স্ত্রী বাসন্তী মাঝে-মাঝেই ও-বাড়ি যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, ব্যাপার নেহাত একটা নয়, তিনটে। প্রথম ব্যাপার, কুসুমবালার বাতব্যাধির প্রকোপ হালে হঠাৎ বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় ব্যাপার, দিন তিনেক আগে জানলা দিয়ে হঠাৎ কুসুমবালার ঘরে একটা ঢিল এসে পড়ে। ঢিলের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা একটা চিঠিও ছিল। চিঠিতে লেখা : 'প্রানেস্বরি, তোমাকে না পেলে বিস খাইব। ইতি জগো।' চিঠিখানি যার উদ্দেশে লেখা, সেই প্রাণেশ্বরী যে কে, কুসুমবালা তা বুঝতে পারেননি। ব্যাপারটা তিনি সদানন্দবাবুকে জানান। চিঠি পড়ে সদানন্দবাবু বলেন, 'ইয়ে, তুমিই প্রাণেশ্বরী নও তো?' কুসুমবালা তাতে খেপে গিয়ে তাঁর স্বামীকে প্রথম দফায় 'ইতর' ও 'ছোটলোক' বলেছেন, অতঃপর দ্বিতীয় দফায় স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ একদম বন্ধ করে দিয়েছেন।

শুনে, বাসন্তীকে আমি বলি যে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও চিঠি যে কুসুম-বউঠানকে লেখা হয়নি, তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু যাকে লেখা হয়েছে, সে কে?"

"তাও বুঝতে পারছ না?" বাসন্তী বলে, "কমলির ঘরের জানলা টিপ করে ঢিল ছুড়েছিল। কিন্তু হাতের টিপ খুব সুবিধের নয়, তাই ঢিলটা গিয়ে কুসুমদির ঘরে পড়েছে।"

"অ্যাঁ? কম্‌লি? তার বয়েস তো মাত্র বারো কি তেরো।"

"বুঝতে পারছ না? এ-কালের ছেলে-মেয়ে, এঁচোড়ে পেকে গেছে।"

"আর ওই জগো? সেটা আবার কে?"

"পাড়ার ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বৈকুণ্ঠের অ্যাসিস্ট্যান্ট জগদীশ। তার বয়েসও ওই বারো-চোদ্দোর বেশি হবে না।" বাসন্তী হাসতে-হাসতে বলে, "বোঝো।"

তারপর, হাসি থামিয়ে, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, "দ্যাখো, এগুলো কোনও ব্যাপার নয়, ওই বয়েসে এমন এক-আধটা ঘটনা ঘটেই থাকে। কম্‌লি বলছে, সে কিছু জানেই না, আর জগদীশকেও বৈকুণ্ঠ খুব ধমকে দিয়েছে। ব্যাস্‌, মামলা খতম। কুসুমদি অবশ্য বোসমশাইকে এখনও ক্ষমা করে দেননি, তবে আজ দুপুরেও

তো ও-বাড়িতে একবার গেসলুম, মনে হল মেজাজ অনেকটাই পড়ে গেছে, রাত্তির নাগাদই হয়তো কথাবার্তা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু ও-সব তো কিছু না, আসল ব্যাপারটার খোঁজ রাখো?"

"সেটা আবার কী?"

"কুসুমদির ব্লাড শুগার তো খুব হাই। দু'বেলা ওষুধ খেতে হয়, তা ছাড়া ফি মাসে অন্তত একবার পিপি টেস্ট করান। তা পিপির জন্যে যে লোকটা ব্লাড টানতে আসে, তার ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জ নাকি মোটেই নতুন নয়। গত হপ্তায় যখন ব্লাড টানতে এসেছিল, তখনই ধরা পড়ে যায়। মোড়ক খুলতে দেখা যায় যে, ছুঁচের ডগায় রক্ত লেগে আছে।"

"ওরে বাবা," আঁতকে উঠে আমি বলি, "এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! তার মানে, ওই সিরিঞ্জ দিয়ে একটু আগেই আর-কারও রক্ত টেনেছে কিংবা আর-কাউকে ইঞ্জেকশন দিয়েছে। লোকটাকে চেপে ধরা হয়নি?"

"হয়েছিল। তাতে সে বলে যে, তার কোনও দোষ নেই। সে তো দোকান থেকে পয়সা দিয়ে সিরিঞ্জ কিনেছে। সিরিঞ্জ যদি মর্চে-পড়া হয়, কি তাতে যদি রক্ত লেগে থাকে তো তার কিছু করার নেই।"

"দোকানের ক্যাশমেমো দেখিয়েছিল?"

"বলেছিল, ক্যাশমেমো সঙ্গে করে আনেনি, পরদিন এসে দেখিয়ে যাবে। কিন্তু তারপরে তো পুরো এক হপ্তা কেটে গেল, লোকটা আর আসেনি।"

সদানন্দবাবুর ভুরু যে ইদানীং কেন কুঁচকে থাকছে, সেটা অতএব বোঝা গেল। তারপরে আবার জুটে গেছে একটা জাল-নোটের ঝামেলা। কাল যখন অরুণ সান্যালদের ফ্ল্যাট থেকে বিদায় নিই তখন আবার ওই নোটের প্রসঙ্গটা উঠেছিল। মেট্রো-স্টেশনের সেই লোকটির কপালে যে একটা কাটা দাগ আছে, এটা শুনে ভাদুড়িমশাই বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ওটা একটা ডিস্টিংগুইশিং মার্ক্। তা ওটা দেখলে তো লোকটাকে চিনতে পারবেন?"

"তা পারব বই কী।"

"চেনার পরে কী বলবেন তাকে?"

"কেন, লোকটা আমাকে প্ল্যাটফর্ম থেকে টেনে তুলল, প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে যাওয়া আমার জিনিসপত্তর আর টাকাকড়ি গুছিয়ে দিল, তা উপকারী লোককে যা বলতে হয়, তা-ই বলব। হাত দু'খানা আঁকড়ে ধরে বলব, থ্যাঙ্ক ইউ।"

"না, তা বলবেন না।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "লোকটা আপনার বন্ধু নয়, শত্রু। প্রথমত, ট্রেন আসার টাইম নিয়ে লোকটা আপনাকে একটা ভুল খবর খাইয়েছিল, যাতে

আপনি সিঁড়ি দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নামতে যান আর পিছন থেকে ছোট্ট একটা ধাক্কা মেরে আপনাকে ফেলে দেওয়া যায়। তারপর জিনিসপত্রগুলো আর টাকাকড়ি গুছিয়ে তুলে দেবার অছিলায় যাতে ওই জাল নোটখানা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় আপনার পকেটে।''

সদানন্দবাবুর মুখে কথা সরছিল না। খানিকক্ষণ একেবারে ফ্যালফ্যাল করে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বিভ্রান্ত গলায় বললেন, ''কিন্তু তাতে তার লাভ কী?''

ভাদুড়িমশাই বললেন, ''সেটাই তো বুঝতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, অনুমান করতে পারি যে, আপনাদের সম্পর্কটা শেষ হয়ে যায়নি, খুব শিগগিরই লোকটি আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।''

শুনে সেই যে তিনি গুম মেরে গেলেন, বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত গোটা রাস্তায় তিনি একবারও আর মুখ খুললেন না।

॥ ৩ ॥

আজ ৮ মার্চ, বুধবার। সেই যে গত রবিবার দুপুরে অরুণ সান্যালের কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে খাওয়া-দাওয়া সেরে সদানন্দবাবুকে নিয়ে আমাদের শেয়ালদা-পাড়ার বাড়িতে ফিরে আসি, তার পর থেকেই ভদ্রলোক কেমন যেন পালটে গেছেন। আগে তো রোজ অন্তত একবার আমাদের বাড়িতে আসতেনই। আসতেন সাধারণত সকাল আটটা নাগাদ। থাকতেনও কম করে তা প্রায় ঘণ্টাখানেক। কাগজ পড়তেন, গল্প করতেন, চা খেতেন, কলকাতা শহরের গোল্লায় যাওয়া নিয়ে নিত্য কিছু আক্ষেপ করতেন, সাধারণভাবে গার্হস্থ্যধর্ম ও বিশেষভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে কিছু-না-কিছু পরামর্শ দিতেন, তারপর 'আজ তবে চলি মশাই, আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলুম' বলে দরজার আড়ালে রাখা তাঁর গাঁটওয়ালা ও মাথায়-লোহার-বল-বসানো লাঠিখানি নিয়ে রাস্তার ও-পারে তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে যেতেন। বলতে গেলে এটাই ছিল তাঁর বাঁধা রুটিন। এতে যে সত্যি আমার সময় নষ্ট হত, তা অস্বীকার করব না, কাজকর্মের যে ক্ষতি হত, তাও ঠিক, কিন্তু একইসঙ্গে এটাও স্বীকার করব যে, ভদ্রলোক না-আসা পর্যন্ত সকালটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগত। কথাটা সদানন্দবাবুকে একদিন বলেছিলুমও। তাতে তিনি একগাল হেসে বললেন, ''আমিও সেটা খুব ফিল করি, মশাই।''

তা সেই সদানন্দবাবু পরপর দু'দিন আমাদের বাড়িতে আসেননি। একই গলির মধ্যে একেবারে সামনাসামনি দুটো বাড়িতে থাকি আমরা, তাও আসেননি। রোববারের কথা আলাদা। সকাল থেকে শুরু করে দুপুরটা গড়িয়ে যাওয়া অব্দি

সেদিন কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে আড্ডা মেরেছি, সুতরাং বিকেলে যে তিনি আসবেন না, তা জানাই ছিল। কিন্তু সোমবার এলেন না কেন? মঙ্গলবার না-আসারই বা কারণ কী? আজ বুধবারও এলেন না। ভদ্রলোকের হল কী। গিন্নির গেঁটেবাত ফের বেড়েছে, তা জানি। কিন্তু তাই বলে তিনি এইভাবে ডুব দেবেন? এ তো ভাবাই যায় না। ভদ্রলোক নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো? বাসন্তীকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "আজ দুপুরেও তো ও বাড়িতে গেসলুম। কিন্তু কই, বোসমশাই যে অসুস্থ, তা তো মনে হল না। বাথরুমের দরজার লোহার কব্জায় নাকি জং ধরে গেস্‌ল, গিয়ে দেখলুম সেগুলো ফেলে দিয়ে পেতলের কব্জা বসাচ্ছেন।"

"আর বউঠান?"

"কুসুমদির বাতের ব্যথা কালকের চেয়ে আজ নাকি একটু কম।.....ও হ্যাঁ, সেই যে লোকটা পুরনো একটা ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টানতে এসেছিল, তাকে নাকি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই বলছে, লোকটা নাকি সিরিঞ্জ পালটাত না। সব বাড়ি থেকেই নতুন সিরিঞ্জের দাম নিত, কিন্তু রক্তই নিক আর ইঞ্জেকশনই দিক, কাজ চালাত পুরনো সিরিঞ্জ দিয়ে।"

শুনে আমি আঁতকে উঠলুম। তার কারণ, মাঝে-মাঝে ব্লাড টেস্ট করাতে হয় আমাকেও, আর ওই লোকটাই এসে রক্ত নিয়ে যায়। অন্তত এতদিন নিয়েছে। সেই সঙ্গে কার শরীরের কী বিষ আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে কে জানে। বললুম, "এ তো মহা বিপদ হল দেখছি।"

বাসন্তী আমার মনের কথাটা ঠিকই ধরতে পেরেছিল। বলল, "তুমি তো নিজের বিপদের কথা ভাবছ। কিন্তু তোমার শরীরে যে বিষ নেই আর সেই বিষ যে ও-লোকটা অন্যের শরীরে ঢোকায়নি, তা-ই কি বলা যায়?"

ঠিক কথা। কিছুদিন আগেই তো আমার হেপাটাইটিস-বি হয়েছিল। এই একই লোক তো তখন আমার রক্ত টেনে ল্যাবরেটরিতে দিয়ে আসত। কিন্তু আমার রক্ত নেবার পরে সেই একই সিরিঞ্জ দিয়ে যদি আর-কারও রক্ত ও নিয়ে থাকে, তা হলে সে তো ভয়ংকর কথা।

বললুম, "বোঝাই যাচ্ছে, ও-লোক আর ফিরবে না। কিন্তু কুসুম-বউঠানের কী হবে? তাঁকে তো শুনেছি ফি মাসে ব্লাড টেস্ট করাতে হয়।"

"ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।" বাসন্তী বলল, "বোসমশাই শুনলুম নতুন একটা ল্যাবরেটরির সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। তারাই লোক পাঠিয়ে ব্লাড কালেক্ট করে নেবে। এক ডজন সিরিঞ্জও কিনে রেখেছেন তিনি। নাকি যখন যেটা দিয়ে রক্ত টানা হবে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙে ফেলবেন। কিছু বুঝলে?"

"বুঝলুম। এও বুঝলুম যে, উনি যা করেছেন, আমাকেও তা-ই করতে হবে। উনি কোন্ ল্যাবরেটরির সঙ্গে ব্যবস্থা করেছেন, জানো?"

“তা জানি না। শুনলুম লেবুতলার ওদিককার একটা নতুন ল্যাবরেটরি। বাস্।”

“দাঁড়াও, ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু উনি তো এদিকে আসছেনই না। কী যে হল ভদ্রলোকের!”

“নিশ্চয় ব্যস্ত আছেন।” বাসন্তী বলল, “তা তুমিও তো ওঁদের বাড়িতে একবার যেতে পারো।....ঠিক আছে, যাবারও দরকার নেই, একটা ফোন করে খবর নিলেই তো হয়।”

সবে ফোনটা তুলেছি, এমন সময় ডোর-বেল বাজল। দরজা খুলে দেখি, সদানন্দবাবু। বললুম, “আরে আসুন, আসুন। কী ব্যাপার, একেবারে ভ্যানিশ করে গেলেন কেন?”

ভদ্রলোক ধীরেসুস্থে ঘরে ঢুকলেন। হাতের লাঠিখানা দরজার পাল্লার পিছনে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর আমার লেখার টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে বললেন, “আপনিও তো একটা খবর নিতে পারতেন। নিয়েছিলেন?”

বললুম, “আরে মশাই, আপনার কথাই হচ্ছিল, আপনি অনেক দিন বাঁচবেন।”

“আর বাঁচা!” সদানন্দবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “বাঁচার শখ মিটে গেছে, এখন ভালয়-ভালয় যেতে পারলে হয়।”

“সে কী, এখুনি যাবার কথা উঠছে কেন? কী হল আবার?”

“যা হবে বলে ভয়ে-ভয়ে ছিলুম, তা-ই হয়েচে।”

“তার মানে?”

“বলচি।” ভদ্রলোক একটু দম নিলেন। তারপর বললেন, “গত রোববার যখন অরুণ সান্যাল মশাইয়ের বাড়ি থেকে রওনা হই, তখন ভাদুড়িমশাই কী বলেছিলেন, মনে আচে?”

“কী বলেছিলেন?”

“আপনার দেখচি কিছুই মনে থাকে না।” সদানন্দবাবু বিরক্ত গলায় বললেন, “বলেছিলেন যে, চাঁদনি স্টেশনের সেই লোকটা আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।”

“করেছে?”

ঘরে শুধু আমি আর সদানন্দবাবু। এতক্ষণ বাসন্তী ছিল, এখন সেও নেই। রাত আটটা বাজে। গলির শব্দ ঝিমিয়ে পড়েছে। শুধু বড়রাস্তার দিক থেকে মাঝে-মধ্যে গাড়ির আওয়াজ শোনা যায়। এ-ঘরে আমাদের দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হচ্ছে, কেউ যে তা শুনে ফেলবে, এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু, সদানন্দবাবু তো খুবই সাবধানী মানুষ, সম্ভবত সেই কারণেই গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে

বললেন, "সে করেচে কি না জানি না। তবে হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে একটা ফোন এসেছিল।"

"কে ফোন করেছিল?"

"নাম বলল না। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল যে, মাল পাচার করা হয়েচে কি না।"

"কী মাল? কার মাল?"

"আরে মশাই, তা কি আমিই জানি। প্রথমে ভেবেছিলুম, রং নাম্বার। পরে ভাবলুম, কেউ বোধহয় ফিচলেমি করচে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে ফোন নামিয়ে রাখি। কিন্তু নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই ফোন আবার বেজে ওঠে। এবারে যা বলে, সে তো আরও সাংঘাতিক।"

"কী বলে?"

"ধম্‌কে বলে যে, লাইন কেটে দিয়ে লাভ নেই। চালাকি করলে লাশ ফেলে দেবে। তারপরেই জিজ্ঞেস করল যে, মাল পাচার হয়েচে কি না।"

"আপনি তা-ই শুনে কী বললেন? কোন্ মালের কথা বলা হচ্ছে, জিজ্ঞেস করেননি?"

"করেছিলুম।" সদানন্দবাবু বললেন, "তাতে বলল, চাঁদনি স্টেশনে আমার পকেটে যে মাল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েচে, সেই মাল। এও বলল যে, ওই রকমের মাল আমাকে আরও দেওয়া হবে। সব পাচার করা চাই।"

বললুম, "ওই রকমের মাল মানে যে আরও কিছু জাল-নোট, সেটা বুঝতে পেরেছেন তো?"

"তা কেন পারব না? কিন্তু পাচার করার মানে কী?"

"মানে তো খুবই সোজা। নোটগুলো আপনাকে চালাতে হবে।"

"ওরেব্বাবা," সদানন্দবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "চালাতে গেলে তো পুলিশে ধরবে।"

সদানন্দবাবুর কথা শুনে মনে হল, ধরা পড়ার ভয় না-থাকলে জাল-নোট চালাতে, কিংবা চালাবার একটা চেষ্টা অন্তত করতে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। বললুম, "ছিছি, শুধু পুলিশের কথা ভাবছেন? এতে যে দেশের সর্বনাশ, সেটা ভাবছেন না? এইসব জাল-নোট কারা বানাচ্ছে আর ছড়াচ্ছে সেটা অন্তত ভাবুন।"

"কারা বানাচ্চে?"

এ-লোককে কী বোঝাব? বললুম, "কারা বানাচ্ছে বুঝতে পারছেন না? এ-দেশের টাকাপয়সা সম্পর্কে এ-দেশেরই লোকের মধ্যে যারা সন্দেহ ছড়াতে চায়। জাগাতে চায় দেশ জুড়ে একটা আতঙ্ক। আতঙ্ক যে এরই মধ্যে এখানে-ওখানে

জাগেনি, তাও তো নয়। জাল-নোট যত ছড়াবে, আতঙ্কও ততই বাড়বে। সেকেন্ড ওঅর্লড ওয়রের সময় কী হয়েছিল মনে নেই?"

"কী হয়েছিল?"

"জার্মনরা তাদের প্লেন থেকে গোটা ব্রিটেন জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল কোটি-কোটি জাল পাউন্ড। ব্রিটেনের মনিটরি সিস্টেমটা যাতে ভেঙে পড়ে, আর সেইসঙ্গে ভেঙে পড়ে সেখানকার লোকের মনোবল।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ। আমাদের দেশেও হঠাৎ এই যে জাল নোট ছড়াবার একটা হিড়িক দেখা যাচ্ছে, এরও সেই একই লক্ষ্য। এ-কাজ যারা করছে, আসলে তারাও চাইছে আমাদের দেশের কারেন্সি নোট সম্পর্কে একটা সন্দেহ ছড়িয়ে এখানকার মনিটরি সিস্টেমটাকে দুর্বল করে দিতে।"

"এ-কাজ কারা করচে?"

"যারা আমাদের ভাল চায় না, তারা।"

সদানন্দবাবু বললেন, "কিন্তু মশাই, কেউ আমাদের ভাল না-চাইবেই বা কেন। হিটলার যে ইংল্যান্ডে এরোপ্লেন পাঠিয়ে জাল নোট ছড়িয়েছিল, তার তো একটা স্পষ্ট কারণ রয়েচে। হিটলারের সঙ্গে ইংরেজদের তখন লড়াই হচ্চিল।"

"সে তো ঠিকই।"

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো কারও লড়াই হচ্চে না।"

"তা হচ্ছে না, কিন্তু শত্রুর তো তাই বলে অভাব নেই। শত্রু যেমন বাইরে আছে, তেমনি ভিতরেও আছে। দেশটা তো একবার ভেঙেছে, এখন তারা আবার এটাকে ভাঙতে চায়। ভেঙে টুকরো-টুকরো করতে চায়। বাইরের শত্রুর কথা ছেড়েই দিচ্ছি, দেশের মধ্যেই এই যে এত টেররিস্ট অর্গানাইজেশন গজিয়ে উঠেছে, যারা এখানে-ওখানে হানা দিয়ে লোকজনদের তুলে নিয়ে গিয়ে নির্বিচারে খুন করছে, কী বলবেন এদের! এরা কি দেশের বন্ধু?"

সদানন্দবাবুর মুখ দেখে মনে হল, তিনি একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছেন। কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না। মিনিট কয়েক নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। সেই নৈঃশব্দ্য শেষ পর্যন্ত আমিই ভাঙলুম। বললুম, "সদানন্দবাবু, জাল-নোটের এই কারবারের পিছনে কাদের মাথা কাজ করছে, তা আন্দাজ করা খুব শক্ত নয়। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"কী বুঝতে পারচেন না?"

"বুঝতে পারছি না যে, আপনাকে ধরে তারা টানাটানি করছে কেন।"

সদানন্দবাবুকে এতক্ষণ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল, এবারে তাঁর কথা শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ভদ্রলোক ভয় পেয়ে গেছেন। ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, "তাই তো,

আমাকে কেন?... ও মশাই, আপনার কী মনে হয়? কী করব, বলুন তো?"

"কী করবেন, তা জানি না," সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে আমি বললুম, "তবে কী করবেন না, সেটা বলতে পারি।"

"বেশ তো, কী করব না, সেটাই তা হলে বলুন।"

"ফোন করে কি অন্য কোনও ভাবে আপনাকে যতই ভয় দেখানো হোক, জাল-নোটটা চালাবার কি ওটা আর-কাউকে গছাবার কোনও চেষ্টা করবেন না।...আর হ্যাঁ, গত রোববার আমরা যারা অরুণ সান্যালদের বাড়িতে ছিলুম, তাদের মধ্যে একমাত্র মালতী আর ও-বাড়ির কাজের মেয়েটি ছাড়া বাদবাকি সব্বাই ওটা দেখেছি। তার আগে কি পরে কি আপনি আর-কাউকে ওটা দেখিয়েছেন?"

সদানন্দবাবু এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না।"

"তা হলে জানলেন কী করে যে, ওটা জাল-নোট?"

"জানতুম না তো।" সদানন্দবাবু বললেন, "অরুণ সান্যালদের বাড়িতে সেদিন অমিতাভর সেল-ফোনে ওই খবরটা আসার পর ভাদুড়িমশাই আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, সত্যিই আমার পকেটে একটা পাঁচশো টাকার নোট আচে কি না।"

"হ্যাঁ, আমার মনে আছে।" আমি বললুম, "উত্তরে আপনি কী বলেছিলেন, তাও আমি ভুলিনি।"

"আমি বলেছিলুম যে, পাঁচশো টাকার নোট একটা আচে ঠিকই, তবে সেটা জাল না খাঁটি, তা আমি জানি না। বলে পকেট থেকে নোটটা বার করে আমি ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে তুলে দিই।"

"রাইট। আপনার হাত থেকে নোটটা নিয়ে ভাদুড়িমশাই তাঁর সোফা থেকে উঠে পুব দিকের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর নোটটাকে এগেন্স্ট সানলাইট ধরে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এসে বলেন, 'জাল।' কী করে সেটা বোঝা গেল, জিজ্ঞেস করতে যা বলেছিলেন, তাও আমি ভুলিনি। আপনার মনে আছে?"

"আচে।" সদানন্দবাবু বললেন, "বলেছিলেন যে জলছাপে গণ্ডগোল আচে। তবে জলছাপ মেলাবারও নাকি দরকার নেই, স্রেফ সারফেসের উপরে আলতো করে হাত বোলালেই নাকি বোঝা যায় যে, এটা জেনুইন নয়, জাল, তাও খুব ক্রুড অ্যাণ্ড ক্লামজি ধরনের জাল।"

বললুম, "রাইট। সবই মনে রেখেছেন দেখছি। এখন বলুন দেখি, নোটটা যে জাল, ভাদুড়িমশাই বলবার আগে কি সত্যি তা আপনি জানতেন না?"

জবাব দেবার আগে আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন সদানন্দবাবু। তারপর বললেন, "সে তো আমি বলেইচি। তবু আবার সেই একই কথা জিজ্ঞেস করচেন কেন? আমাকে বিশ্বাস করচেন না?"

হেসে বললুম, "আরে ছিছি, আপনি তা-ই ভাবলেন? আরে মশাই, এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি শিওর অ্যাবাউট ইট। তার কারণ, আমার ধারণা, পরে একটা সময়ে হয়তো বারবার এই প্রশ্নটা আপনাকে করা হবে, অ্যান্ড মাচ উইল ডিপেন্ড অন হোঅট ইউ সে।"

সদানন্দবাবুর বেজার ভাবটা তবু কাটল না। বললেন, "ঠিক আচে, ভাদুড়িমশাই বলার আগে পর্যন্ত সত্যিই আমি জানতুম না যে, ওটা জাল-নোট। আবার বলচি, এটাই সত্যি কথা, যতবার আমাকে জিজ্ঞেস করা হোক, ততবার এই একই কথা আমি বলব।"

"ভেরি গুড। এখন আর-একটা কথা বলি। নোটটা কোথাও চালাবার কি কাউকে গছাবার চেষ্টা তো করবেন না-ই, কথাটা কাউকে জানাবেনও না। দিন কয়েক বাদেই তো ভাদুড়িমশাই আবার কলকাতায় আসবেন, এ-ব্যাপারে ডিসিশান যা নেবার, তখনই বরং নেবেন, তার আগে নয়।...এখন বাড়ি যান, এ নিয়ে আর এখন কিছু ভাববেন না।"

"এর মধ্যে যদি কেউ ফোন করে এই নিয়ে?"

"করলে বলে দেবেন, চালাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পেরে উঠছেন না।"

সদানন্দবাবু উঠে পড়লেন। দরজার পাল্লার পিছন থেকে লাঠিখানি নিয়ে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ফোনটা এল তার ঠিক পনেরো মিনিট বাদে। সদানন্দবাবু। উত্তেজিত গলায় ভদ্রলোক বললেন, "সর্বনাশ হয়েচে।"

"কী হয়েছে?"

"বাড়ি ফিরে দেখি, কুরিয়ার সার্ভিসে আমার নামে একটা প্যাকেট এসেচে। প্যাকেটের মধ্যে দশ-দশ খানা পাঁচশো টাকার নোট। এ কী সর্বনাশ হল মশাই!"

॥ ৪ ॥

আজ ১২ মার্চ, রবিবার। রাত এখন আটটা। আজই সকালের ফ্লাইটে সদানন্দবাবুকে নিয়ে কলকাতা থেকে আমি দিল্লিতে এসেছি। উঠেছি ম্যাক্রো কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনালের সফদরজঙ্গের এই গেস্ট হাউসে। ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে অমিতাভই এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আমাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থাও সে-ই করেছে। ভাদুড়িমশাই এখানে এসেছেন গতকাল। তিনিও এই গেস্ট হাউসেই আছেন। যেমন থাকা, তেমন খাওয়ার ব্যবস্থাও এখানেই। এক টুকরো লন ও ছোট্ট একফালি বাগান-সহ ছিমছাম গেস্ট হাউস। থাকার ব্যবস্থা পরিপাটি। ও বেলা এখানেই খেয়েছি। তাতে মনে হল, খাওয়ার ব্যবস্থাও খারাপ হবে না। কুকটি গোয়ানিজ।

কেন যে হঠাৎ দিল্লি আসতে হল, এবারে সেই কথাটা বলি। কথা ছিল, বাঙ্গালোর থেকে ভাদুড়িমশাই খুব শিগগিরই আবার কলকাতায় আসবেন। কিন্তু, কুরিয়ার সার্ভিসে ফের যে তাঁকে পাঁচশো টাকার দশখানা জাল-নোট পাঠানো হয়েছে, সদানন্দবাবুর কাছে এই খবর পাবার পর আমার মনে হয়, আর দেরি করা ঠিক হবে না, ব্যাপারটা যেরকম দ্রুত গড়াচ্ছে, তাতে একটা বিপদ ঘটে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়, তাই ভাদুড়িমশাইকে এক্ষুনি সব জানানো দরকার। বুধবার রাত্তিরেই তাই বাঙ্গালোরে ফোন করি।

ফোনে ভাদুড়িমশাইকে সব জানাবার পর তিনি বলেন, দু'চার দিনের মধ্যে ফের তাঁর কলকাতায় আসার কথা ছিল ঠিকই, কিন্তু আপাতত সেটা সম্ভব হচ্ছে না, একটা ফোর্জারি কেসে সাক্ষ্য দেবার জন্যে পরদিনই তাঁকে মুম্বই যেতে হচ্ছে। 'আদালতের সমন মশাই, না গিয়ে উপায় নেই।' বলেছিলুম, বেশ তো, তা হলে মুম্বই থেকে কলকাতায় আসুন। কিন্তু তাও নাকি সম্ভব নয়। কেন নয়, জিজ্ঞেস করে জানা গেল, মুম্বই থেকে তাঁকে দিল্লি যেতে হবে। 'অমিতাভ ডেকে পাঠিয়েছে। ফোন করেছিল, ডিটেল্‌স বলল না, তবে মনে হল, ছেলেটা বিপদে পড়েছে। তো এক কাজ করুন মশাই, আপনারাই দিন কয়েকের জন্য দিল্লি চলে আসুন।'

এমনভাবে কথাটা বললেন, যেন দিল্লি যাওয়া কতই সোজা। নিজে সারাক্ষণ হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু আমরা তো তাঁর মতো মুক্তপুরুষ নই, সংসারী জীব, হাজার ঝামেলায় জড়িয়ে রয়েছি, হুট বললেই কি আমরা নোঙর তুলে ভেসে পড়তে পারি?

আশ্চর্য ব্যাপার, ভাদুড়িমশাইয়ের কথাটা সদানন্দবাবুকে বলতে তিনি দেখলুম তৎক্ষণাৎ রাজি। টেলিফোনে হুমকি আর ফের অতগুলো জাল নোট পাবার পরে বোধহয় কলকাতায় থাকতেই ভদ্রলোক ভয় পাচ্ছিলেন। তবে মুখে সে-কথা স্বীকার করলেন না। বললেন, "ভাদুড়িমশাই তো খারাপ কতা বলেননি। দরকার যখন আমার, তখন যেতে হবে বই কী। আর তা ছাড়া, মার্চ মাসের দিল্লি তো শুনিচি চমৎকার জায়গা, মশাই। ঠাণ্ডাও কেটে গেচে, আবার গরমও পড়েনি...চলুন, চলুন, দিন কয়েকের জন্যে ঘুরেই আসা যাক।"

ভাদুড়িমশাই পরদিন অর্থাৎ বেস্পতিবার রাত্তিরে মুম্বই থেকে ফোন করেছিলেন। তখনই তাঁকে জানিয়ে দিই যে, আমরা দিল্লি যাচ্ছি। রোববার সকালের ফ্লাইটে যাব, তবে কোথায় থাকব তা এখনও ঠিক করিনি। তাতে তিনি বলেন যে, থাকার জায়গা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে না, অমুকে ফোন করে তিনি জানিয়ে দেবেন যে, সে-ই যেন সব ব্যবস্থা করে রাখে। রোববার তো ছুটির দিন, তাই এয়ারপোর্টে আমাদের জন্যে গাড়ি নিয়ে যেতেও অমুর কোনও অসুবিধে হবে না।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের টিকিট পেতেও কোনও অসুবিধে হয়নি। ফ্লাইটও লেট

ছিল না। আজ সকালে রাইট টাইমেই আমরা দিল্লি পৌঁছেছি।

কলকাতা ছাড়ার ব্যাপারে সদানন্দবাবুর একটা ছোট্ট অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। পদ্ম নামের যে মেয়েটি তাঁদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত, সদানন্দবাবু প্রায়ই বলতেন যে, গত জন্মে অনেক পুণ্য করেছিলেন বলেই এ-জন্মে অমন কাজের মেয়ে পেয়েছেন। বাসন্তীকেও বলতে শুনেছি, অমন কাজের মেয়ে নাকি ভাগ্যে মেলে। তা সেই পদ্ম গত বেস্পতিবার থেকে আর কাজে আসেনি। এদিকে অন্য-কোনও কাজের লোক না পাওয়ার ফলে সদানন্দবাবু বুঝতে পারছিলেন না যে, অসুস্থ স্ত্রীকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে কীভাবে তিনি দিল্লি যাবেন। শেষ পর্যন্ত বাসন্তী আশ্বাস দেয় যে, আমাদের বাড়ির কাজের মেয়েটিই আপাতত দু'বাড়ির কাজের সামাল দেবে।

গেস্ট হাউসের দোতলার দুটো ঘর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একটায় ভাদুড়িমশাই আছেন। অন্যটায় থাকব আমি আর সদানন্দবাবু। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের দুজনকে এখানে ছেড়ে দিয়ে অমু তার গ্রেটার কৈলাসের ফ্ল্যাটে চলে যায়। যাবার আগে আমাদের বলে যায় যে, একটার মধ্যে আমরা যেন লাঞ্চ খেয়ে নিই, সে তার বাড়িতে দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে মোটামুটি দুটোর মধ্যে আবার এখানে চলে আসবে। তা-ই এসেছিল। তখন অমু ও ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে আমাদের একটা ছোট্ট বৈঠকও হয়েছিল। অমুর আবার নতুন কী সমস্যা হল, তখনও তা আমরা জানি না। অমুকে তা-ই নিয়ে প্রশ্ন করতে সে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকায়। ভাদুড়িমশাই বলেন, "ওর কথা পরে হবে, আগে সদানন্দবাবুর কথাটা শুনি।" সদানন্দবাবু নিজে কিছু না-বলে আমার দিকে তাকান। তখন, গত রোববারে অরুণ সান্যালের কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে আমাদের সেই বৈঠকের পর থেকে যা-যা ঘটেছে, তার সবই আমি ভাদুড়িমশাইকে জানাই। পদ্মদাসীর কথাটাও বাদ দিই না। সেটা বলি ভাদুড়িমশাইকে এই কথাটা বোঝাতে যে, সদানন্দবাবুকে সত্যি খুব অসুবিধের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে দিল্লি আসতে হয়েছে।

ভাদুড়িমশাইকে কিন্তু টেলিফোনে হুমকি আর কুরিয়ার সার্ভিসে ফের জাল-নোট আসার ব্যাপারটা নিয়ে ততটা ভাবিত হতে দেখলুম না, যতটা ভাবিত মনে হল পদ্মদাসীকে নিয়ে। 'লাশ ফেলে' দেবার হুমকির কথাটা আমি ফের তুলতে গিয়েছিলুম, কিন্তু ভাদুড়িমশাই তাঁর হাতের ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান মশাই, আগে এই কাজের মেয়েটির ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই। ও কি এর মধ্যে আর কাজে ফেরেনি?"

"না।" সদানন্দবাবু বললেন, "ও আমাদের বাড়িতে শেষ বারের মতো কাজে এসেছিল গত বুধবার। কাজ সেরে সন্ধের সময় বাড়ি ফিরে যায়। বেস্পতিবার সকাল থেকে অ্যাবসেন্ট। বেস্পতি, শুক্কুর, শনি, পরপর তিন দিন আসেনি।

রোববার, মানে আজকের কথা বলতে পারব না। তার কারণ, সকালের ফ্লাইট ধরব বলে আজ একেবারে ভোরবেলায় আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েচি।"

ভাদুড়িমশাই তার পকেট থেকে সেল-ফোনটা বার করলেন। সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিরণবাবুর বাড়িতে ফোন করে আপনাদের পৌঁছ-সংবাদটা দিয়ে দিচ্ছি। সেইসঙ্গে আপনাদের কাজের মেয়েটি আজ এসেছে কি না, তাও জেনে নেওয়া যাবে।"

ফোনের একতরফা কথাবার্তা যা শোনা গেল, তা এইরকম :

".....কে, বাসন্তী?......আমি ভাদুড়িদা।.....হ্যাঁ, ওঁরা ঠিক সময়েই পৌঁছে গেছেন, প্লেন লেট করেনি। এখন একটা খবর দাও তো, সদানন্দবাবুদের বাড়িতে যে-মেয়েটি কাজ করে, সে কি আজও আসেনি?....ঠিক আছে। ওঁদের জন্যে ভেবো না, ওঁরা ভালই আছেন, কাজ মিটলেই ফিরে যাবেন। তোমরা ভাল থেকো।"

কথা শেষ করে সেল-ফোনটা আবার পকেটে পুরলেন ভাদুড়িমশাই। তারপরে ফের সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের কাজের মেয়েটির নাম যেন কী?...ও হ্যাঁ, পদ্ম। ইয়ে, পদ্ম আজও কাজে আসেনি।"

এই পর্যন্ত বলে একটুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। একটা সিগারেট ধরালেন। নিঃশব্দে সেটা টানলেন কিছুক্ষণ। তারপর আধ-খাওয়া সিগারেটটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে দিয়ে বললেন, "আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সদানন্দবাবু। চাঁদনি স্টেশনে আপনার পকেটে যে পাঁচশো টাকার নোটটা গুঁজে দেওয়া হয়েছিল, সেটা যে জাল নোট, তা আপনি প্রথম কখন জানলেন?"

"প্রথম তো আপনার কাছেই জানলুম।" সদানন্দবাবু বললেন, "ওই মানে গত রবিবার অরুণবাবুদের বাড়িতে অমুর কাছে সেই ফোনটা আসার পরে যখন নোটটা আপনাকে দেখতে দিলুম আর আপনি সেটা দেখে বললেন যে, জাল, সেই তখন।"

"ঠিক আছে। কিন্তু এটা তো মানবেন যে, বড়-রকমের কোনও কেনাকাটার দরকার না-থাকলে সব সময়ে... আই মিন নর্মালি আমরা পকেটে পাঁচশো টাকার নোট নিয়ে ঘুরে বেড়াই না।....কী, ভুল বললুম?"

"না, না, ভুল বলবেন কেন," সদানন্দবাবু বললেন, "আপনি ঠিক কথাই বলেচেন। তবে কিনা সত্যি সেদিন পকেটে পাঁচশো টাকার নোট নিয়েই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম।"

"সেদিন মানে কবে?"

"অরুণবাবুদের বাড়িতে যেদিন যাই, তার আগের দিন। সেদিন তো শনিবার ছিল, তা-ই না?"

"হ্যাঁ, শনিবার। চৌঠা মার্চ।"

"গোটা কয়েক জিনিস কেনার দরকার ছিল বলে সেদিন আমি চাঁদনি মার্কেটে

যাই। তার আগের দিন ব্যাঙ্কে গিয়ে আমার পেনশনের টাকা তুলি। ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা বাণ্ডিল দিয়েছিল, সেইসঙ্গে খানকয় পাঁচশো টাকার নোট। চাঁদনিতে যাবার সময় খুচরো কিছু টাকাপয়সার সঙ্গে খানকয় পঞ্চাশ টাকার নোট আর একটা পাঁচশো টাকার নোটও আমি পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, জিনিসপত্তরের দাম মেটাবার সময় ওই বড় নোটখানা ভাঙিয়ে নেব।"

এই পর্যন্ত শুনে ভাদুড়িমশাই বললেন, "তা তো হল, কিন্তু সদানন্দবাবু, আপনি শেয়ালদা-পাড়ায় থাকেন, সেখান থেকে চাঁদনি মার্কেটের ডিসট্যান্স তো তেমন কিছু নয়, বাসে-ট্রামে কি ট্যাক্সিতে গেলে চটপট পৌঁছে যেতে পারতেন। তা হলে অতটা পথ উজিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে গিয়ে আপনার পাতাল-রেলে উঠবার দরকার হল কেন?"

সদানন্দবাবু বললেন, "পকেটে টাকা রয়েছে বলে ভিড়ভাট্টার সময়ে আমি বাসে-ট্রামে উঠিনি। আর ট্যাক্সিতে আমি পারতপক্ষে উঠি না। ভাড়া নিয়ে বড্ড গোলমাল হয়। মিটারে যে ভাড়া ওঠে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া চায়। তারও অবিশ্যি একটা হিসেব আছে। কিন্তু সেই হিসেবটা আমার মাথায় ঢোকে না। তাই ট্যাক্সি আমি সব সময়ে অ্যাভয়েড করি।"

"সো ফার সো গুড।" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "মাইলখানেক হেঁটে গিয়ে মেট্রো ধরার কারণটা বোঝা গেল। এখন বলুন, চাঁদনিতে জিনিসপত্র কিনে আপনার পাঁচশো টাকার নোটখানা ভাঙাতে পেরেছিলেন?"

"না মশাই, পারিনি।" সদানন্দবাবু বললেন, "জিনিসপত্তর কিনেছিলুম মোট সাড়ে তিনশো টাকার। শুধু এক ছিট-কাপড় ছাড়া বাদবাকি সবকিছু একই দোকান থেকে কিনেছিলুম। কিন্তু পাঁচশো টাকার নোটখানা এগিয়ে দিতে দোকানি লোকটি বেজার হয়ে বলে, সবে দোকান খুলেছে, ক্যাশবাক্স ফাঁকা, ব্যালান্স ফেরত দেবার উপায় নেই। অগত্যা কী আর করি, পকেট থেকে সাতখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে তার পাওনা মেটাই।"

"আর ওই পাঁচশো টাকার নোটখানা আপনার পকেটেই থেকে যায়।"

"হ্যাঁ, থেকে যায়।"

ভাদুড়িমশাই আবার হাসলেন। বললেন, "পেনশনের টাকা তুলতে গিয়ে ওটা আপনি ব্যাঙ্ক থেকে পেয়েছিলেন। সুতরাং ধরেই নিতে পারেন যে, ওটা জেনুইন নোট। তা হলে তো একখানা নয়, দুখানা পাঁচশো টাকার নোট নিয়ে আপনার বাড়ি ফেরার কথা।"

"তার মানে?"

"তার মানে তো অতি সহজ। জেনুইন একখানা পাঁচশো টাকার নোট আপনার পকেটেই ছিল। প্লাস, ফিরতি পথে চাঁদনি স্টেশনে আছাড় খাওয়ার ফলে আপনার জিনিসপত্র আর টাকাপয়সা যখন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে যায়, তখন সেগুলো গুছিয়ে

তুলে দেবার সময় পাঁচশো টাকার আর-একখানা নোট—জাল নোট—ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আপনার পকেটে। কী, দুখানা নোট হল না?"

"তা হল। কিন্তু বাড়ি ফিরে পাঞ্জাবি খুলে তার পকেট থেকে টাকাকড়ি বার করতে গিয়ে তো দেখলুম যে...দেখলুম যে..."

"দুখানা নয়, পাঁচশো টাকার মাত্তর একখানা নোটই আপনার পকেটে রয়েছে, কেমন?"

সদানন্দবাবুর মুখ দেখে মনে হল, তিনি একটা জটিল ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছেন। বললেন, "ঠিক তা-ই। এটা কী করে হল?"

"খুব সহজেই হল।" মুখের হাসিটা ধরে রেখে ভাদুড়িমশাই বললেন, "আপনি ভাবছেন পাঁচশো টাকার একখানা নোট নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, আবার ফিরেও এসেছেন একখানা নোট নিয়ে, তা হলে এর মধ্যে গণ্ডগোলটা কোথায়। গণ্ডগোলটা এইখানে যে, যে-নোট নিয়ে বেরিয়েছিলেন, সে-নোট নিয়ে ফেরেননি।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ। আপনার সেই চাঁদনি স্টেশনের বন্ধুটি যা করেছে, সে অতি পাকা হাতের কাজ, মশাই। সে একই সঙ্গে দু'দুটি কাজ করেছে। যেমন সে আপনার পকেটে একটি জাল নোট ঢুকিয়েছে, তেমনি আবার প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে যাওয়া পয়সাকড়ির ভিতর থেকে চোখের পলকে সরিয়েছে আপনার পাঁচশো টাকার জেনুইন নোটখানা।"

"আর আমি কিনা সেই জাল নোটখানাকেই আমার আসল নোট ভেবে পকেটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম! আরে ছিছি, আপনি সেদিন বলে না-দিলে তো ওটাকে জাল বলে চিনতেই পারতুম না।"

এতক্ষণ তো হাসতে-হাসতে কথা বলছিলেন ভাদুড়িমশাই। এবারে, একেবারে হঠাৎই, হাসিটা তাঁর মুখ থেকে মিলিয়ে গেল। সরু চোখে সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি বলে দেবার আগে পর্যন্ত আপনি জানতেন না যে, ওটা জাল? সদানন্দবাবু, প্লিজ ডোন্ট সাপ্রেস দ্য ট্রুথ। সত্যি কথাটা বলে ফেলুন। আপনার কোনও ধারণাই নেই যে, কারা আপনাকে নিয়ে খেলছে! মিথ্যে বললে বিপদ আরও বেড়েই যাবে, কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না!"

ভাদুড়িমশাইয়ের চাউনিতে কী ছিল জানি না, কিন্তু সদানন্দবাবু যেন নিমেষে কুঁকড়ে গেলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, "আপনি বলে দেবার আগে, শনিবার বিকেলেই জানতে পেরেছিলুম।"

"কী করে জানলেন? কোথাও চালাতে গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে আমি যাইনি।"

"তা হলে?"

"আমার ওয়াইফের গোটাকয় ওষুধ কেনবার ছিল। প্রেসক্রিপশান আর ওই

পাঁচশো টাকার নোটটা দিয়ে শনিবার বিকেলে পদ্মকে আমাদের পাড়ার ওষুধের দোকানে পাঠাই। সত্যি বলছি, ওটা যে জাল-নোট, তা আমি তখনও পর্যন্ত জানতুম না। জানলুম পদ্ম ফিরে আসার পর। ফিরে এসে ও বলল, এ-নোট জাল, দোকানি ফিরিয়ে দিয়েছে।"

গেস্ট হাউসে ভাদুড়িমশাইয়ের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। ঘরের এক দিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটা রাইটিং টেবিল। চেয়ার থেকে উঠে ভাদুড়িমশাই তার টানা খুলে একটা কাগজ বার করে আনলেন। তারপর কাগজখানা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "কলকাতার কাগজ এখানে দেরি করে আসে জানেন তো? একটু আগে এই বাংলা কাগজখানা দিয়ে গেছে। তিনের পাতায় একটা খবর দাগ দিয়ে রেখেছি। পড়ে দেখুন।"

পাঁচ-সাত লাইনের ছোট্ট খবরটা এইরকম :

"স্টাফ রিপোর্টার, ১১ মার্চ—সায়েন্স সিটির কাছে, মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে আজ রাত্রে একটি যুবতীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। যুবতীর বয়স আনুমানিক ত্রিশ-পয়ত্রিশ, রং ময়লা, বাঁ হাতের কবজিতে উলকিতে প্রজাপতি আঁকা। গলায় দাগ দেখে পুলিশের সন্দেহ, রাত্রেই গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে তাকে রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হয়েছে।"

খবরটা পড়ে শোনাতে সদানন্দবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "বাঁ হাতের কবজিতে প্রজাপতি আঁকা! সর্বনাশ, ও তো নির্ঘাত পদ্ম! ট্যাংরার ওদিক থেকেই তো আসত! কে মারল তাকে!"

প্রশ্ন নয়, নেহাতই স্বগতোক্তি। সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে ভাদুড়িমশাই তবু বললেন, "আপনার কী মনে হয়? মেয়েটার সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"খুব অল্পই জানি।" সদানন্দবাবু বললেন, "যেটুকু জানি, তাও আবার আমার ওয়াইফের কাছে শোনা।"

"কী শুনেছেন?"

"শুনচি যে মেয়েটা আসলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিংয়ের ওদিককার এক গাঁয়ের চাষিবউ। ছেলেপুলে নেই, স্বামী নেয় না, পেটের জ্বালায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ট্যাংরার একটা বস্তিতে থাকত। থাকার জায়গাটা নাকি এক রাজমিস্তিরি জুটিয়ে দিয়েছিল। তা ওখান থেকেই রোজ কাজ করতে আসত।"

আমি বললুম, "কে ওকে মারতে পারে?"

"সেটাই তো প্রশ্ন।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "জাল পাতলেই যারা ধরা দেয়, তাদের মারা তো মোটেই শক্ত নয়।"

"কীসের জাল?"

"লোভের জাল। নতুন করে সংসার পাতার লোভ, গয়নাগাটির লোভ, শরীরের খিদে মেটাবার লোভ, টাকার লোভ। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। জালটা যারা পেতেছে, এই একটা খুন করেই তারা থেমে থাকবে কি না।"

॥ ৫ ॥

মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে যার লাশ পাওয়া গেছে, সে যদি সত্যিই পদ্ম হয়, তা হলে বুঝতে হবে সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল। ভাদুড়িমশাইয়ের ধারণা, এই খুনের সঙ্গে জাল-নোটের একটা সম্পর্ক থাকাই সম্ভব। গেস্ট হাউসের কিচেন থেকে ইতিমধ্যে আমাদের জন্য চা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরালেন ভাদুড়িমশাই। চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানলেন। তারপর সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওষুধের দোকান থেকে ফিরে এসে যখন পদ্ম বলল যে, নোটটা ওরা নেয়নি, জাল বলে ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন আপনার রিঅ্যাকশনটা কী হল? খুব অবাক হয়ে গেলেন নিশ্চয়?"

"তা তো হলুমই।" সদানন্দবাবু বললেন, "ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া নোট....মানে তখন পর্যন্ত তো আমি আসল ব্যাপার জানি না, তাই তাজ্জব হয়ে গেসলুম।"

"মিসেস বসু তখন ছিলেন সেখানে?"

"ছিলেন মানে?" সদানন্দবাবু একেবারে চুপসে গিয়ে বললেন, "অফ কোর্স ছিলেন। পদ্মর কথা শুনে খেপে গিয়ে আমাকে এই মারেন তো সেই মারেন! যত বলি যে, ওটা ব্যাঙ্কের থেকে পাওয়া নোট, জাল হবে কী করে, তিনি সে-কথায় কানই দেন না! খালি বলেন, 'ছিছি, জাল নোট দিয়ে জিনিস কিনতে পাঠিয়েচ! পাড়ার মধ্যে মান-সম্মান বলে আর কিছু রইল না! বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজ কোতায়-কোতায় গেসলে, সব খুলে বলো, নইলে তোমাকে ছাড়চি না!' তো কী আর করি, সব তাঁকে খুলে বললুম। চাঁদনিতে ওই আছাড় খাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য চেপে যেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, ধুতিটা ছিঁড়ল কী করে, তখন সেটাও চেপে রাখা গেল না।"

"সব শুনে কী বললেন তিনি?"

"যা বললেন, সেটা তো আপনার কথার সঙ্গে মিলে যাচ্চে, মশাই। বললেন যে, ইস্টিশানে আমার পয়সাকড়ি কুড়িয়ে দেবার সময়েই জাল-নোটটা আমার পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েচে।"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "তা যদি বলে থাকেন তো বুঝতে হবে যে, ভদ্রমহিলার বুদ্ধি আপনার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তাঁর কথা থাক, আপাতত আমি পদ্মর কথা ভাবছি।"

অমু এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল, একটাও কথা বলেনি। এবারে বলল, "কী ভাবছেন, মামাবাবু?"

ভাদুড়িমশাই তক্ষুনি অমুর কথার উত্তর না-দিয়ে সদানন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যখন আপনার কথা হয়, ঘরে তখন আর কে ছিল?"

"আর-কেউ ছিল না।"

"পদ্মও ছিল না?"

"না।"

শুনে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, "জাল-নোট দিয়ে পদ্মকে ওষুধ কিনতে পাঠিয়েছিলেন বলে আপনার স্ত্রী তো আপানাকে খুব বকাঝকা করছিলেন তখন, তা-ই না?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে বেশ উঁচু গলাতেই কথা বলছিলেন তিনি, কেমন?"

"সে তো আমার ওয়াইফ সব সময়েই বলেন।" সদানন্দবাবু বললেন, "বকাঝকা করলেও বলেন, না-করলেও বলেন। অবিশ্যি আমিও যে খুব নিচু গলায় কথা বলছিলুম তা নয়।"

"তবে তো সোনায় সোহাগা! পদ্ম সেক্ষেত্রে ঘরে থাক আর না-ই থাক, আপনাদের ডায়ালগ সে বিলক্ষণ শুনতে পেয়ে থাকবে।" একটু চিন্তিত গলায় ভাদুড়িমশাই বললেন, "স্টেশনে আপনি আছাড় খাওয়ার পর ওই জাল-নোট আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আপনার স্ত্রীর এই অনুমানের কথাও পদ্মর সেক্ষেত্রে শুনে থাকাই সম্ভব। আর হ্যাঁ...পদ্ম যেখানে থাকে... কোথায় যেন থাকে বলছিলেন?"

"ট্যাংরার একটা বস্তিবাড়িতে।"

"হ্যাঁ, ট্যাংরার একটা বস্তিবাড়িতে। তো রাত্তিরে সেখানে ফিরে গিয়ে পদ্ম কি এই গল্পটা খুব রসিয়ে সবাইকে বলেনি?"

"গপ্পো কেন হবে?" সদানন্দবাবু বললেন, "এ তো সত্যি ঘটনা!"

"অফ কোর্স সত্যি ঘটনা।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "আর সেইজন্যেই তো গল্প হিসেবে এমন মজাদার...আই মিন বেশ রসিয়ে-রসিয়ে বলার মতন গল্প।...আচ্ছা সদানন্দবাবু, আপনার স্ত্রীর কাছে এই সত্যি ঘটনার কথা যখন বলছিলেন, তখন আপনার সেই পরোপকারী বন্ধুটির... মানে ওই যিনি আপনার জিনিসপত্র আর টাকাপয়সা ফের গুছিয়ে তুলে দিলেন, সেই ভদ্রলোকের চেহারার একটা ডেসক্রিপশান দেননি?"

"তা দিয়েছিলুম বই কী।"

"ডিস্টিংগুইশিং মার্ক...মানে কপালের সেই কাটা দাগটার কথাও বলেছিলেন নিশ্চয়?"

"বলেছিলুম।"

"পদ্ম যদি সেটাও শুনে থাকে আর বস্তিতে ফিরে গিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে গল্প করার সময় সেটাও বলে থাকে, তো তার ফলটা কী দাঁড়ায়?"

অমু বলল, "যাদের মারফতে জাল-নোট ছড়ানো হচ্ছে, তাদের অন্তত

একজনকে আইডেন্টিফাই করার কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়।''

আমি বললুম, ''হয়তো সেইজন্যেই পদ্মকে সরিয়ে দেওয়া হল, কপালে কাটা দাগওয়ালা একটা লোক কীভাবে আর-একজনের পকেটে একটা জাল-নোট ঢুকিয়ে দিয়েছে, এই গল্পটা যাতে না আর ছড়িয়ে পড়তে পারে।''

ভাদুড়িমশাই বললেন, ''সত্যিই যদি পদ্ম এই গল্পটা সেদিন তার বস্তিতে ফিরে সবাইকে বলে থাকে...অ্যাণ্ড আই থিংক সত্যিই সে বলেছিল...তা হলে তো বুঝতে হবে না-জেনে সে নিজেই নিজের ডেথ-ওয়ারেন্টে সই করে দিয়েছিল সেদিন।''

''ওরে বাবা,'' সদানন্দবাবু বললেন, ''এ তো ভয়ংকর ব্যাপার। কাণ্ডটা যে অ্যাদ্দুর গড়াবে, তা তো আমি ভাবতেও পারিনি!''

''এদিকে অমুর কথা তো এখনও আপনাদের বলিনি।'' ভাদুড়িমশাই বললেন, ''সেও কিছু কম ভয়ংকর নয়। তা নইলে আর মুম্বই থেকে পড়িমরি এখানে ছুটে আসব কেন।''

সদানন্দবাবু বললেন, ''কী হয়েচে অমুর? ওকেও কেউ জাল-নোট গছিয়েচে?''

উত্তরটা অমুই দিল। বলল, ''জাল-নোট নয়। জাল সিরিঞ্জ।''

আমি বললুম, ''ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জের কথা বলছ তো?''

''হ্যাঁ, কিরণমামা।''

''একবার ইউজ করেই ওগুলো ভেঙে ফেলার কথা।'' আমি বললুম, ''কিন্তু অনেকেই ভাঙে না, আর তার ফল কী হয়, সে তো সবাই জানি। হাসপাতাল আর নার্সিং হোমের জঞ্জাল ঘেঁটে অনেকে ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর নতুন মোড়কে ওই ইউজ্‌ড সিরিঞ্জগুলো আবার বাজারে ঢুকে পড়ে।''

''ঠিক বলেছেন। তার ফল কী হচ্ছে, তা তো জানেনেই।''

''জানব না কেন, এর ফলে মারাত্মক সব রোগ যে কীভাবে ছড়াচ্ছে, সে তো আমরা সবাই জানি। কাগজে এ নিয়ে লেখালিখিও তো কিছু কম হয় না, আর শুধু কাগজ বলেই বা কথা কী, ইউজ-করা সিরিঞ্জগুলো হাসপাতালের বাইরে কীভাবে ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়, টিভিতেও তো তা কতবার দেখানো হয়েছে। কিন্তু কই, লোকের চৈতন্য হচ্ছে কোথায়!''

''হচ্ছে না, কিন্তু হওয়া দরকার।'' অমু বলল, ''যাতে হয়, তার জন্যে আমাদের কম্প্যানি থেকে...আই মিন আমাদের কম্প্যানির যে পাবলিক রিলেশান্‌স ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, তার থেকে হালে একটা ড্রাইভ দেওয়া হয়েছিল। এতে যে আমাদের কোনও স্বার্থ ছিল না, তা বলব না।''

''কীসের স্বার্থ?'' আমি বললুম, ''তোমরা কি ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জও বানাও নাকি?''

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, ''আরে কিরণবাবু, এটা ওরা মাল বিক্রির জন্যে

করে না, এটা করে কম্প্যানির ইমেজ বাড়াবার জন্যে। পাবলিক ইন্টারেস্টে কলকাতাতেও তো কত কম্প্যানি বাগান বানিয়ে দিচ্ছে, কি একটা বাগান অ্যাডপ্ট করে মালি রেখে সেটা মেনটেন করার দায়িত্ব নিচ্ছে। এও তেমনি। এর সঙ্গে বিক্রিবাটার কোনও সম্পর্ক নেই। এ-সব কাজের...মানে ওই যাকে আপনারা জনহিতকর কাজ বলেন আর কী, এর একটাই উদ্দেশ্য, ইমেজ বাড়ানো।"

অমু বলল, "অ্যাবসলুটলি রাইট। তো আমাদের ডিরেক্টর্স' বোর্ড যখন ঠিক করল যে, আমাদের ম্যাক্রো কন্‌স্ট্রাকশান ইন্টারন্যাশনালকেও ওই রকমের কোনও কাজের ভার নিতে হবে, তখন কাজটা কী হবে, তা ঠিক করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। তো আমি বলি, ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জ নিয়ে এই যে একটা সর্বনেশে চোরাই ব্যাবসা গজিয়ে উঠেছে, এর বিপদ সম্পর্কে পাবলিককে আমরা সচেতন করে তুলতে পারি। বোর্ডও একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই তাতে রাজি হয়ে যায়। আমাকে বলে, গো অ্যাহেড।"

সদানন্দবাবু ভুক্তভোগী মানুষ। একদিকে যখন জাল-নোটের ফাঁদে পড়ে ছটফট করছিলেন, তখন একইসঙ্গে তাঁকে জাল ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জের হ্যাপাও সমানে সামলাতে হয়েছে। তিনি তাই অমুর কথাগুলি এতক্ষণ খুবই মন দিয়ে শুনছিলেন। অমু একটু থামতেই তিনি সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

"তারপর আর কী।" অমু বলল, "বোর্ড আমার প্রোপোজালটা অ্যাপ্রুভ করার পরে আমি আর দেরি করিনি, একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই কাজে লেগে যাই। আমাদের পাবলিক রিলেশানস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে একটা বৈঠক সেরে নিয়েই ডেকে পাঠাই একটা অ্যাড-এজেন্সির ম্যানেজারকে। তাঁকে বলি যে, ডিজপোজেব্‌ল সিরিঞ্জ নিয়ে যে ডিজনেস্ট কারবার চলছে, পাবলিককে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে কাগজের জন্যে কয়েকটা বিজ্ঞাপন তো তৈরি করে দিতে হবেই, সেইসঙ্গে শহরের বড়-বড় ক্রসিংয়ে লাগাতে হবে প্রমাণ সাইজের হোর্ডিং।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল অমু। তারপর বলল, "এ হল মাস দেড়েক আগের ঘটনা। অ্যাড-এজেন্সি আমাদের কাজটা চটপট করে দেয়। কাগজে গোটাকয় বিজ্ঞাপন এরই মধ্যে বেরিয়েও গেছে, সেইসঙ্গে হিন্দি আর ইংরেজিতে লাগানোও হয়েছে গোটাকয়েক বড়-বড় হোর্ডিং। আজ যখন এয়ারপোর্ট টার্মিন্যাল থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন একটা হোর্ডিং হয়তো আপনাদের চোখেও পড়ে থাকবে।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি! একজন লোককে ইঞ্জেকশান দেওয়া হচ্ছে, এই ছবির উপরে বড়-বড় হরফে লেখা : বিওয়্যার অভ দ্য নিড্‌ল! চমৎকার হোর্ডিং।"

কাজের প্রশংসা করলুম, অথচ অমু যে তাতে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছে, এমন মনে হল না। ফের একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনি তো বললেন

চমৎকার, কিন্তু আমাদের এই অ্যাড-ক্যাম্পেন নিয়েই বিপদ ঘটেছে, কিরণমামা। কিছু লোক এটা একদম পছন্দ করছে না।"

কিছুই বুঝতে পারলুম না। ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললুম, "অমুরা যা করছে, সে তো বেশ ভাল কাজ। মানুষের এতে উপকার হবে। যেখানে জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে ইউ কান্ট অ্যাফোর্ড টু বি কেয়ারলেস। এই সব হোর্ডিং দেখে সাধারণ মানুষ সাবধান হতে শিখবে।"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "তা তো বটেই।"

"তা হলে এটা পছন্দ না-হবার কী আছে? কারা পছন্দ করছে না? বিপদের কথাই বা উঠছে কেন?"

"সেটা আমার মুখে শুনে কী হবে?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "অমুই বলুক।"

অমু তিক্ত হাসল, বলল, "আমাদের অন্তত আট-দশটা হোর্ডিং এরই মধ্যে ঢিল মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে।"

"কই," সদানন্দবাবু বললেন, "এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যেটা দেকলুম, সেটার তো কোনও ক্ষতি হয়েচে বলে মনে হল না।"

"ওটা প্রোটেক্টেড এরিয়া, সারাক্ষণ পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে, আর্মড গার্ড চব্বিশ ঘণ্টা টহল দিচ্ছে, ওখানে কে ঢিল-পাটকেল ছুড়তে যাবে, অ্যারেস্ট হবার ভয় নেই? বজ্জাতি হচ্ছে যে-সব জায়গা কম্পারেটিভ্‌লি সেফ, সেখানে। রাত্তিরবেলায় এসে হোর্ডিংয়ের দফা রফা করে দিচ্ছে। শুধু যে ছিঁড়ে দিচ্ছে, তা নয়, ছবি আর লেখার উপরে বুলিয়ে দিচ্ছে কালির পোঁচড়া।"

"এ-কাজ কারা করছে?"

"তা তো জানি না, তবে অনুমান ঠিকই করতে পারি।" অমু বলল, "আমাদের এই ক্যাম্পেনে যাদের ক্ষতি হবার আশঙ্কা, কাজটা যে তারাই করছে, চোখ-কান বুজেই তা বলে দেওয়া যায়।"

"অর্থাৎ যা একবার ব্যবহার করা হয়ে গেছে, কিন্তু নষ্ট করে ফেলা হয়নি, হাসপাতাল আর নার্সিংহোমগুলোর বাইরে ফেলে দেওয়া সেই রাশি-রাশি ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জকে আবার সেলোফেনের মোড়কে মুড়ে যারা বাজারে ফের নতুন বলে চালায়, তারা। ঠিক বলেছি?"

"ষোলো-আনার উপরে আঠারো আনা ঠিক বলেছেন, কিরণমামা।" অমু বলল, "আর এদের এই সর্বনেশে ব্যাবসাটা কীসের সুযোগে চলছে জানেন? চলছে স্রেফ আমাদের অসাবধানতার সুযোগে।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "রোজ এ-দেশে ওই রকমের কত সিরিঞ্জ ইউজ করা হয় ভাবুন তো।"

বললুম, "কয়েক লাখ তো বটেই।"

"তার মধ্যে একটা মস্ত অংশই আবার বাজারে ফিরে আসে। ফিরে আসা সম্ভব হয়, তার কারণ ওই অমু যা বলল, আমরা অত্যন্ত অসাবধান।"

"আমরা অসাবধান, হেল্‌থ সেন্টারগুলো অসাবধান, হাসপাতাল অসাবধান, নার্সিং হোম অসাবধান।" অমু বলল, "আমরা ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জ ব্যবহার করি, কিন্তু ব্যবহার করার পর বড়-একটা সেগুলো ভেঙে ফেলি না। আমরা ভাঙি না, হেল্‌থ সেন্টারগুলো ভাঙে না, হাসপাতাল ভাঙে না, নার্সিং হোম ভাঙে না। রোগীর বিছানার ধারে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে সেটাকে ফেলে দিয়েই আমাদের দায়িত্ব ফুরোয়। আমরা খবরও রাখি না যে, রোগীর ঘর থেকে সেগুলো রাস্তার ভ্যাটে চালান হয়। সেখান থেকে সেগুলো কুড়িয়ে নেয় ওই যাদের আমরা কাগজকুড়ুনি বলি, তারা। তাদের কাছ থেকে ওই ব্যবসায়ীরা সেগুলো জলের দরে কিনে নেয়। তারপর নতুন মোড়কে সেই ইউজ্‌ড সিরিঞ্জগুলো আবার বাজারে এসে ঢোকে। ভিশাস্ সার্ক্‌ল মানে বিষবৃত্ত বা পাপচক্র বলে একটা কথা আছে না? এই হচ্ছে সেই ভিশাস্ সার্ক্‌ল।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "আমরা সাবধান হলেই কিন্তু এই সার্ক্‌লটা ভেঙে যাবে।"

অমু বলল, "কিরণমামা, আমরা ঠিক সেই কাজটাই করছি। লোকজনকে সাবধান করে দিচ্ছি। বিজ্ঞাপন দিয়ে, হোর্ডিং লাগিয়ে সবাইকে বলছি, যে-ছুঁচ আপনার শরীরে ঢুকছে, নামে ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জের ছুঁচ হলেও আপনার আগে সেটা হয়তো কোনও হেপাটাইটিস-বি রোগীর শরীরে ঢোকানো হয়েছিল, কিংবা এমনকী কোনও এইড্‌স-রোগীর শরীরে। বলছি, একবার ইউজ করার পরেই ওই ছুঁচটা ভেঙে ফেলুন। নইলে, ওটা যে ফের আপনারই কোনও প্রিয়জনের শরীরে ঢুকে মারাত্মক কোনও রোগ ছড়াবে না, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। প্রতিটি হাসপাতাল আর নার্সিং হোমের বাইরে এই হোর্ডিং লাগিয়েছি আমরা। যেমন রোগী, তেমনি ডাক্তার আর নার্সদেরও সতর্ক করে দিচ্ছি। ফলে, যারা ইউজ্‌ড সিরিঞ্জের কারবারি, তারা তো খেপে যাবেই। তারা লোক লাগিয়ে আমাদের হোর্ডিংগুলো তো ছিঁড়বেই। আমাদের বিজ্ঞাপন ছাপছে বলে তারা ফোন করে কাগজগুলোকে তো ভয় দেখাবেই।...আর হ্যাঁ, তারা জেনে গেছে যে, এই ক্যাম্পেনের মূলে আছি আমি। আর তাই আমার উপরে তারা হামলা তো করবেই।"

শিউরে উঠে বললুম, "তোমার উপরে হামলা হয়েছে?"

"একবার নয়, দু'বার।" অমু বলল, "প্রথম বার সে অ্যাবাউট আ উইক অর টেন ডেজ এগো.. আপিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে পাথর ছুড়ে আমার গাড়ির কাচ ভেঙে দেয়। আর দ্বিতীয় হামলাটা গত মঙ্গলবার হয়েছে। এয়ারপোর্টে এক বন্ধুকে সি অফ করে রিজ-এর পথ ধরে রাজিন্দর নগরের দিকে যাচ্ছিলুম। রাত তখন এই ধরুন আটটা। একেবারে হঠাৎই বাঁ দিকের একটা গলি থেকে

একটা ট্রাক আমার গাড়ির উপরে এসে পড়ে। গাড়িটা তুবড়ে গেলেও ভাগ্যবলে আমি বেঁচে যাই। ট্রাকটার নম্বর টুকে রেখেছিলুম। পথ-চলতি একটা অটো রিকশা নিয়ে কাছাকাছি একটা থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখাই। থানা থেকে পরদিন আমাকে জানানো হয়, ওই নম্বরের কোনও ট্রাক নেই। বাস্, তাতেই যা বুঝবার তা বুঝে যাই আমি। সেইদিনই ফোন করি মামাবাবুকে। বলি, ইমিডিয়েটলি তিনি যেন দিল্লিতে চলে আসেন।''

।। ৬ ।।

এখন রাত এগারোটা। গেস্ট হাউস থেকে আজ সন্ধে সাতটা পর্যন্ত কোথাও বেরোইনি। সাতটায় যাই গ্রেটার কৈলাসে অমুর ফ্ল্যাটে। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটা সেখানেই ছিল। দুপুর আর বিকেলের বৈঠকে যে-সব কথা হল আর তা থেকে যা জানা গেল, তার উল্লেখ আগেই করেছি। পদ্মকে কারা খুন করেছে, তা বোঝা শক্ত নয়। সদানন্দবাবুর বাড়িতে জাল-নোট নিয়ে যে-সব কথা হয়েছিল, পদ্মর পক্ষে তা শোনাই স্বাভাবিক। এটাও স্বভাবিক যে, সেদিন তার বস্তিবাড়িতে ফিরে পাঁচজনকে সে-সব কথা সে জানিয়েছে। তখন, কপালে কাটা দাগওয়ালা একটা লোকই যে তার মনিব সদানন্দবাবুর পকেটে একটা জাল-নোট ঢুকিয়ে দিয়েছিল, এই শোনা-কথাটাও সে সবাইকে বলেছিল নিশ্চয়। ফলে, তার কথা থেকে যার আইডেন্টিটি ফাঁস হবার আশঙ্কা, পদ্মকে সে-ই যে খুন করেছে, এই সম্ভাবনাকে কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এমনকী আমাদের সদানন্দবাবু, যিনি সব কথাই একটু দেরিতে বোঝেন, তাঁরও সেটা অনুমান করতে একটুও অসুবিধে হয়নি। তিনিও বললেন, ''এ আর দেখতে হচ্চে না, এ নির্ঘাত সেই কপাল-কাটা লোকটার কাজ।''

শুনে আমি বলেছিলুম, ''সদানন্দবাবু ভুল বলেননি।''

তাতে সদানন্দবাবু বলেন, ''ভুল বলব কেন, এ তো বোঝাই যাচ্চে যে, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে যাতে তাকে শনাক্ত করতে না-পারে, তারই জন্যে পদ্মকে সে সরিয়ে দিল।''

কথাটা যে ভাদুড়িমশাইয়ের ভাবনায় বিশেষ দাগ কেটেছে, তাঁর মুখ দেখে তা কিন্তু মনে হল না। সদানন্দবাবুর কথা শুনে চিন্তিত মুখে তিনি বললেন, ''আপনার তা-ই মনে হয়?''

সদানন্দবাবুর হয়ে উত্তরটা আমিই দিলুম। বললুম, ''হওয়াই তো স্বাভাবিক। কাটা-কপালের কথাটা যখন পদ্মর মুখ থেকে বেরিয়েছে, তখন আসামিকে শনাক্ত করতে পুলিশ তো পদ্মকে ডাকবে। অবিশ্যি আসামিকে পুলিশ যদি ধরতে পারে।''

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু পদ্ম তো আসামিকে দেখেইনি। সে একটা শোনা-কথা বলেছে মাত্র, তাও সত্যিই যদি সে পাঁচজনকে তা বলে থাকে। যা-ই হোক, আমি ধরেই নিচ্ছি যে, লোকটার শরীরের ওই ডিস্টিংগুইশিং মার্কটার কথা সত্যিই সে পাঁচজনকে বলেছিল, আর সেই রাত্তিরেই লোকটার কানে সে-কথা পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও সে পদ্মকে তার প্রথম টার্গেট করবে কেন?"

অমু বলেছিল, "কেন করবে না, মামাবাবু?"

"সে তো বললুমই।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "পদ্মর বেঁচে থাকাটা তার পক্ষে বিপজ্জনক ঠিকই, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি বিপজ্জনক এমন লোকের বেঁচে থাকা, যে কিনা পদ্মর মতো শোনা-কথা বলবে না, অর্থাৎ যে কিনা তাকে সত্যি-সত্যি চাক্ষুষ করেছে।"

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে এবারও সদানন্দবাবুর বিন্দুমাত্র দেরি হল না। ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে শুকনো মুখে তিনি বললেন, "আপনি কি আ-আ-আমাকে মিন করচেন নাকি?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "যে-লোকটা আপনার পকেটে ওই পাঁচশো টাকার জাল-নোটটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, পদ্ম কি তাকে দেখেছে?"

"না।"

"কিন্তু আপনি দেখেছেন।"

"হ্যাঁ, তা দেখেচি বই কী।"

"বিপদ অতএব আপনারই বেশি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "পুলিশ যদি সত্যিই লোকটাকে ধরতে পারে, তা হলে তাকে শনাক্ত করার একটা প্রশ্ন তো উঠবেই। তখন কিন্তু আপনার ডাক পড়বে। লোকটার প্রথম টার্গেট অতএব পদ্মর নয়, আপনারই হওয়া উচিত ছিল।"

সদানন্দবাবু বললেন, "কিন্তু পুলিশ আমাকে ডাকবে কেন? আমি তো এ-ব্যাপারে পুলিশকে কিচু জানাইনি। তা হলে লোকটাকে যে আমি চাক্ষুষ করেচি, পুলিশ তা জানবে কী করে?"

"পুলিশকে আমরা যতটা বোকা ভাবি...আই মিন এদেশি আর বিদেশি গোয়েন্দাকাহিনিতে তাদের যতটা বোকা বলে দেখানো হয়, সত্যিই কিন্তু তারা ততটা বোকা নয়, সদানন্দবাবু।" ভাদুড়িমশাই সামান্য হেসে বললেন, "তারা ঠিকই জানতে পারবে।"

গেস্ট হাউসে বসে এ-ব্যাপারে তখন আর কোনও কথা হয়নি। এর পরেই আমরা অমুর প্রসঙ্গে চলে যাই। সাতটা নাগাদ গেস্ট হাউস থেকে চলে যাই অমুর বাড়িতে। সেখানে রাতের খাওয়া শেষ করে যখন আবার গেস্ট হাউসে ফিরব, তখন কপালে-কাটা-দাগওয়ালা লোকটার কথা আর-একবার উঠেছিল। সে-প্রসঙ্গে পরে আবার আসব। তার আগে অন্য কিছু কথা সেরে নিই।

গ্রেটার কৈলাস চমৎকার পাড়া। আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু বিকাশ এখানকার ফেজ টুতে থাকে। দিল্লিতে এলুম, অথচ বিকাশের সঙ্গে দেখা হল না, এমন বড় একটা কখনও ঘটে না, বার দুয়েক তো ওরই বাড়িতে উঠেছি। আবার এমনও হয়েছে যে, উঠেছি হয়তো অন্য জায়গায়, হেলি রোডের বঙ্গভবনে কি লোদি এস্টেটের ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে কি রাজিন্দরনগরে, কিন্তু বিকাশ সে-কথা জানামাত্রই ছুটে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেছে ওর বাড়িতে। এবারে অবশ্য আমার দিল্লি আসার কথা এখনও পর্যন্ত ও জানতে পারেনি। তবে জানবে ঠিকই, আর জানবার পরে যে ছুটে আসবে, তাও ঠিক।

চিত্তরঞ্জন পার্কও এখান থেকে খুব কাছেই। বলতে গেলে সেটা বাঙালি-পাড়াই। সেখানে একটা টিলার উপরে পাশাপাশি যে তিনটি মন্দির রয়েছে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মন্দিরের সামনেকার লন আর বাগানও দেখার মতো। বাগান ঘিরে বেঞ্চি পাতা। বিকেলের দিকে প্রবীণ বাঙালিদের দিব্যি একটা আড্ডা জমে যায়। অনেকেই রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারী। বেশ খানিকটা সময় এখানে বসে গল্পগুজব করে তাঁরা যে-যাঁর বাড়ি ফিরে যান। সদানন্দবাবুকে একদিন ওখানে নিয়ে যেতে হবে। তবে ভদ্রলোকের এখন যে-রকম মনের অবস্থা, খুব-একটা উৎসাহিত হবেন বলে মনে হয় না। তার উপরে আবার পুলিশ যে তাঁকেই শনাক্ত করার জন্য ডাকতে পারে, এই কথাটা শুনে অবধি ভদ্রলোক বড্ডই সিঁটিয়ে আছেন। আমাকে বলেওছেন যে, কলকাতা শহরে লক্ষ-লক্ষ লোক থাকতে কেন যে 'হারামজাদাটা' তাঁরই পকেটে জাল-নোট গুঁজে দিল, "কোনও মানে হয় মশাই?"

তো যা বলছিলুম। গ্রেটার কৈলাস যেমন ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পাড়া, অমুর ফ্ল্যাটটিও তেমনি প্রশস্ত ও পরিপাটি। আসলে একটা চারতলা বাড়ির গোটা তিনতলা জুড়ে এই ফ্ল্যাট। বোঝাই যাচ্ছে যে, ম্যাক্রো কনস্ট্রাকশান ইন্টারন্যাশনাল থেকে এই তিনতলাটা ভাড়া নিয়ে তাদের ডিভিশনাল ম্যানেজারের জন্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। অমু যে এখানে এরই মধ্যে বেশ গুছিয়ে বসেছে, তাও বোঝা যায়। হঠাৎই আবার মনে হল যে, বিদেশে যাক আর না-ই যাক, এ-ছেলে আর কলকাতায় ফিরছে না।

না-ফেরার আরও একটা কারণ সম্ভবত এই যে, অমুর বউ সুলেখা বাঙালি বটে, তবে প্রবাসী বাঙালি পরিবারের মেয়ে, পিত্রালয় জয়পুরে, শুনলুম ইস্কুল জীবন সেখানে কাটিয়ে পরে বাপের বদলির চাকরির সুবাদে দিল্লি চলে আসে। সুলেখার কলেজ-জীবন অতএব দিল্লিতেই কেটেছে। বিয়ের পরে কলকাতায় এক-আধবার গিয়েছে বটে, তবে, স্বাভাবিক কারণেই, দিল্লি তার কাছে যতটা নিজের জায়গা, কলকাতা তার সিকির সিকিও নয়। ছেলে রুনুও দেখলুম বাংলা বিশেষ বলে না। তিন বছরের বাচ্চা। বাংলায় কিছু জিজ্ঞেস করলে বোঝে ঠিকই, কিন্তু উত্তর দেয় ইংরেজিতে। সেই ইংরেজির মধ্যে মাঝে-মাঝে হিন্দিও ঢুকে যায়। ঠেট

হিন্দি। কিন্ডারগার্টেনে যতক্ষণ থাকে, সেই কয়েক ঘণ্টা ছাড়া বেশির ভাগ সময় বেয়ারা-বাবুর্চিদের কথাই শোনে তো, তা হলে আর বাংলা শিখবে কোত্থেকে! নাঃ, অমিতাভর আর কলকাতায় ফেরার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

সম্ভবত ভাদুড়িমশাই আগে থাকতেই আপত্তি জানিয়ে রেখেছিলেন, অমিতাভ তাই বড়-মাপের আয়োজন করেনি। সাদাসিদে বাঙালি খাওয়া। ডাল, ভাজা, একটা তরকারি আর মাছ। সবশেষে দই-মিষ্টি। খাওয়ার পর্ব শেষ হবার পর বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। এ-ফ্ল্যাটের দু'দিকে দুটি ঘেরা বারান্দা। একটা সামনের রাস্তার দিকে। অন্যটা পিছনে। সেখান থেকে নীচের লন ও বাগান দেখা যায়। বাগানে আলো জ্বলছিল। গোটা দুয়েক আলো নাকি সারা রাতই জ্বলে, দিনের আলো ফুটলে নিবিয়ে দেওয়া হয়।

কথা শুরু হয়েছিল দেশের অবস্থা নিয়ে। রাজনীতি, অর্থনীতি, শেয়ার-বাজার ও গ্লোবালাইজেশনের চক্করে ঘুরপাক খেয়ে শেষপর্যন্ত সেটা কারগিল-প্রসঙ্গে এসে কেন্দ্রীভূত হয়। অমু বলে, "কারগিলে ওরা আমাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়েছিল, তবে সুবিধে করতে পারেনি, পাল্টা-মার খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ওরা চুপ করে বসে নেই। আমাদের একটা এয়ারবাস কীভাবে হাইজ্যাক্ড হল, তা তো দেখলেনই, সেইসঙ্গে কাশ্মীরের অবস্থাটাও দেখুন, মামাবাবু। সরাসরি... আই মিন সামনা-সামনি এঁটে উঠতে পারেনি বলে চোরাগোপ্তা হামলা সমানে চালিয়েই যাচ্ছে। এখন একটা দিনও কি যায়, কাগজে যেদিন কাশ্মীরে কোনও নতুন হামলার খবর থাকে না?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "শুধু কাশ্মীর কেন, আমাদের দেশের আরও নানান জায়গায় যে ওরা চক্রান্তের জালটাকে বেশ বড় করেই ছড়িয়েছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। দেশটাকে ডিস্ট্যাবিলাইজ করে দিতে চাইছে তো, এই যে জাল-নোটের কথা হচ্ছিল, এও তো সেই চক্রান্তেরই একটা অংশ। তার উপরে আবার জুটেছে এই জাল-সিরিঞ্জের বিপদ।...বাই দ্য ওয়ে, এ-ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দেবার জন্যে যে অ্যাড-ক্যাম্পেন তোমরা চালাচ্ছ, সেটা কি শুধু দিল্লির কথা ভেবেই করছ নাকি?"

"না না, শুধু দিল্লির কথা ভেবে এটা করা হচ্ছে না।" অমু বলল, "ক্যাম্পেনের এটা ফার্স্ট ফেজ। মোট ছ'টা বড় শহরে এটা চলবে। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ আর ব্যাঙ্গালোর।"

আমি বললুম, "কিন্তু ক্যাম্পেনের ভাষা কি এই একই থাকবে নাকি?"

"না, কিরণমামা। ইংরেজি অবশ্য থাকবেই। তবে হিন্দির বদলে অন্য-সব শহরে আসবে সেখানকার আঞ্চলিক ভাষা। কলকাতায় বাংলা, মুম্বইয়ে মরাঠি, চেন্নাইয়ে তামিল, হায়দরাবাদে তেলুগু আর ব্যাঙ্গালোরে কন্নড়। যেমন কাগজের বিজ্ঞাপনে, তেমনি হোর্ডিংয়ে।"

সুলেখা এতক্ষণ ভিতরেই ছিল। সে ভিতর থেকে বারান্দায় এসে একটা চেয়ার টেনে বসতে ভাদুড়িমশাই বললেন, "ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে এলে?"

"হ্যাঁ।" সুলেখা হেসে বলল, "ঘুমের আগে একটা গল্প বলতে হয়, নইলে ঘুমোতে চায় না।"

আমি বললুম, "কাল থেকে তো আবার ওর ইস্কুল!"

কথাটার জবাব না-দিয়ে অমুর দিকে তাকাল সুলেখা। যে-ভাবে ভুরু কুঁচকে তাকাল, তাতেই বুঝলুম, ইস্কুলের ব্যাপারে কিছু-একটা অস্বস্তির কারণ ঘটেছে।

অমু বলল, "ভাবছি রুনুকে এখন কয়েকটা দিন ইস্কুলে পাঠাব না।"

"কেন? শরীর খারাপ?"

"ন্‌না।" আমতা-আমতা করে অমু বলল, "ঠিক তা নয়।"

"তা হলে?" আমি বললুম, "আমরা অবিশ্যি তিন বছর বয়েসের একটা দুধের বাচ্চাকে এইভাবে ইস্কুলে পাঠাবার কথা ভাবতেও পারতুম না, কিন্তু তোমরা এ-কালের বাপ-মা, তোমাদের চিন্তা-ভাবনা যে অন্যরকম, তা আমরা খুব ভালই জানি। কিন্তু সে-কথা থাক, বাচ্চার শরীর যখন খারাপ নয়, জ্বরজারি হয়নি, তখন তাকে ইস্কুলে পাঠাচ্ছ না কেন?"

অমু কোনও উত্তর দিল না, চুপ করে বসে রইল। মনে হল, সে খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে।

হঠাৎই সরু হয়ে এল ভাদুড়িমশাইয়ের চোখ। একটুক্ষণ একেবারে একদৃষ্টিতে তিনি অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বললেন, "কেউ ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে? শাসিয়েছে যে, ওকে ইস্কুল থেকে তুলে নিয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ।" অমু বলল, "তবে চিঠি নয়, ফোন। আজ বিকেলেই বাড়িতে ফোন করে হুমকি দিয়েছে।"

"আজই বিকেলে? কিন্তু তোমার তো তখন বাড়িতে থাকার কথা নয়, তুমি তখন সফদরজঙ্গের গেস্ট হাউসে ছিলে। আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলে।"

"ঠিকই বলেছেন, মামাবাবু। আমি তখন বাড়িতে ছিলুম না। ফোনটা সুলেখা ধরেছিল।"

সুলেখার দিকে তাকালেন ভাদুড়িমশাই। বললেন, "যে ফোন করেছিল, সে পুরুষ না মেয়ে?"

"পুরুষ।" সুলেখা বলল, "প্রথমেই কয়েকটা গালাগাল দিল। বিচ্ছিরি গালাগাল। এমন বিচ্ছিরি যে, সে আমি মুখে আনতে পারব না। তারপর হেসে বলল, মুন্না তো বহোত্ পেয়ারা হ্যায় না, স্কুলসে উস্‌কো উঠা লেঙ্গে।"

সদানন্দবাবু বললেন, "এই কথাটা হেসে বলল?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে এমন হাসি যে, শুনলে বুক শুকিয়ে যায়।"

অমু বলল, "আমার ধারণা, এ সেই একই লোক, মামাবাবু। দফতরে ফোন করে আমাকে বলেছিল যে, হোর্ডিংগুলো তিন দিনের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে। এর কথা আপনাকে বলেছি।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "আমার মনে আছে। ভয় পেয়ো না, অমু। তবে হ্যাঁ, ছেলেকে তুলে নেবে বলে যখন হুমকি, তখন রুনুকে এখন দিন-কয়েক ইস্কুলে না-পাঠানোই ভাল।... আর ইয়ে...একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি, কাল সকালে কি বাইরের কোনও লোক এ-বাড়িতে এসেছিল?"

"সকালে মানে কখন?"

"এই ধরো ন'টা-দশটা নাগাদ।"

"নট দ্যাট আই নো অব।" অমু একটু ভেবে নিয়ে বলল, "সকাল সাড়ে আটটায় আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেসলাম। ফিরতে-ফিরতে বারোটা বেজে যায়। মাঝখানে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়। জানি না তার মধ্যে কেউ এসেছিল কি না। তবে সুলেখা তো বাড়িতেই ছিল, ও হয়তো বলতে পারবে।"

টুকিটাকি কয়েকটা কাজ সারতে সুলেখা এর মধ্যে বারান্দা থেকে উঠে ভিতরে চলে গিয়েছিল। অমু ডাকতে ফের বারান্দায় ফিরে এল। ভাদুড়িমশাইয়ের প্রশ্ন শুনে বলল, "তেমন কেউ না। তবে হ্যাঁ, টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ থেকে একজন মেকানিক এসেছিলেন বটে। আমাদের রিসিভারটা কোনও গণ্ডগোল করছে কি না জিজ্ঞেস করতে আমি বলি যে, বড় কোনও গণ্ডগোল নয়, এই মাঝেমধ্যে কড়কড় করে একটা জারিং সাউন্ড হয়। শুনে তিনি রিসিভারটা পালটে দিয়ে যান।"

অমু বলল, "বলো কী, আমি তো টেলিফোন-এক্সচেঞ্জে কোনও কমপ্লেন করিনি। স্রেফ নিজে থেকে লোক পাঠিয়ে ওরা রিসিভার পালটে দিয়ে গেল? বাব্বা, দেশটার হল কী! এ তো ভাবাই যায় না।"

ভাদুড়িমশাই একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সেটা শেষ করলেন। তারপর বললেন, "এবারে উঠতে হবে। যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কী ঠিক করলে? জাল-সিরিঞ্জ নিয়ে তোমাদের ক্যাম্পেনটা আশা করি থামিয়ে দেবে না?"

"মোটেই না।" অমু বলল, "শুরু যখন একবার করেছি, তখন এর শেষ দেখে ছাড়ব। তা আমাকে যতই ভয় দেখাক।"

ভাদুড়িমশাই স্পষ্টতই খুশি হলেন। বললেন, "ভেরি গুড।...শোনো অমু, নিজেকে নিয়ে তোমার ভয় নেই, সে আমি জানি। বাকি রইল তোমার বউ আর ছেলে। কিন্তু ওদের নিয়েও ভয় কোরো না। আমি তো আছি। এ-ব্যাপারে যা করবার, আমি ঠিকই করব। ইন ফ্যাক্ট, আমার কাজ এর মধ্যে শুরুও হয়ে

গেছে।”

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর অনেকটা আত্মগতভাবে বললেন, “এদিকে জাল-সিরিঞ্জ, ওদিকে জাল-নোট। কী জানি কেন আমার মনে হচ্ছে যে, দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র একটা আছেই।...পদ্ম মারা গেছে, এবারে কার পালা? কপালে কাটা দাগওয়ালা সেই লোকটার? কিন্তু পদ্মর আগে তো তারই মরার কথা ছিল।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ভাদুড়িমশাই। বললেন, “আর নয়, চলুন, এবারে গেস্ট হাউসে ফেরা যাক।”

।। ৭ ।।

১৩ মার্চ, সোমবার। ডায়েরি লেখা শেষ করে শুয়ে পড়তে-পড়তে কাল রাত বারোটা বেজে গেস্‌ল। সঙ্গে সঙ্গেই যে ঘুমিয়ে পড়তে পেরেছিলুম, তা নয়। মাথার মধ্যে হরেক রকমের চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকলে ঘুম আসতে দেরি হয়। তা, অমিতাভর জীবনে এই যে একটা ঝামেলা এসে জুটেছে, পাথর ছুড়ে গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া ছাড়াও রিজের নির্জন রাস্তায় চুরমার করা হয়েছে তার গাড়ি, তার উপরে আবার ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, ইস্কুল থেকে তার তিন বছরের ছেলেকে কিডন্যাপ করা হবে, বিছানায় টান হবার পরেও একদিকে যেমন সেটা নিয়ে ভাবছিলুম, অন্য দিকে তেমনি ভাবছিলুম পদ্মর কথা। পদ্মকে কে মারল? কপালে কাটা দাগওয়ালা সেই লোকটা? কিন্তু পদ্মর আগে যে তারই মরার কথা ছিল, ভাদুড়িমশাই-ই বা হঠাৎ এমন কথা বললেন কেন? ভাদুড়িমশাই আরও একটা কথা কাল বলেছেন। তাঁর একটা ধারণার কথা। সেটা কী? না জাল-সিরিঞ্জ আর জাল-নোটের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছেই।

চিন্তা হচ্ছিল সদানন্দবাবুকে নিয়েও। যে-বাড়ির কাজের মেয়ে খুন হয়েছে, পুলিশ তার মালিককে নিয়ে টানাটানি করবে না, তাও কি হয় নাকি? লোকাল থানার পুলিশ এতক্ষণে নিশ্চয় সদানন্দবাবুর খোঁজ করতে এসে জেনে গেছে যে, তিনি কলকাতায় নেই, রবিবার সকালের ফ্লাইটে দিল্লি চলে গেছেন। তা কোনও একটা ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ যাদের জিজ্ঞেসাবাদ করতে চায়, তাদের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ অকুস্থল, অর্থাৎ ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে, সেই জায়গা থেকে সরে পড়ে, তা হলে সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে পুলিশের সন্দেহ তার উপরে পড়বেই। কে জানে ভাদুড়িমশাই এ-দিকটা ভেবে দেখেছেন কি না।

ঘুমের আর দোষ কী, মাথার মধ্যে এত সব ভাবনা জট পাকিয়ে গেলে ঘুম আসতে দেরি হওয়াই স্বাভাবিক। আমারও মনে হয় কাল ঘুম আসতে-আসতে একটা দেড়টা বেজে গিয়েছিল। উঠেছি আটটা নাগাদ। উঠে দেখলুম ঘর ফাঁকা।

বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, আমার ঘরের 'বুড়ঢা বাবু' খানিক আগে গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে গেছেন। 'বুড়ঢা বাবু' সাড়ে আটটা নাগাদ ফিরে বললেন, মার্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছিলেন। কাছাকাছি একটা পার্কে গিয়ে গোটা দশেক পাক মেরেছেন। 'তাতে মাইল তিনেক কভার করতে পেরেচি কি না, তা অবশ্য জানি না।' ভদ্রলোকের মুখ দেখে অবশ্য মনে হল না, খুব একটা চিন্তিত। পদ্মর ব্যাপারে পুলিশের সন্দেহের তির যে তাঁকেও লক্ষ্য করতে পারে, তা আর তাঁকে বলিনি। কী দরকার ভদ্রলোককে ফের ভয় পাইয়ে দিয়ে!

ভাদুড়িমশাই আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন ন'টা নাগাদ। কিচেনে ফোন করে ঘরেই ব্রেকফাস্ট আনিয়ে নেওয়া গেল। প্রাতরাশ করতে-করতেই দুটো খবর দিলেন ভাদুড়িমশাই। এক নম্বর খবর, কলকাতায় ফোন করে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা ভাল আছি। আর দু'নম্বর খবর, একটু বাদেই সুরিন্দর বেদী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

পাঠকরা আশা করি সুরিন্দর বেদীকে ভুলে যাননি। ভাদুড়িমশাইয়ের মির্জাপুর-কীর্তি নিয়ে 'পাহাড়ি বিছে' বলে যে কাহিনি আমি লিখেছিলুম, তার প্রথম পরিচ্ছেদেই সুরিন্দর বেদীর কথা ছিল। ছেলেটি চারু ভাদুড়ি ইনভেস্টিগেশানসের দিল্লি ব্রাঞ্চের চার্জে আছে। কাজেকর্মে দক্ষ লোক, ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলে, মুখে সর্বদাই লেগে থাকে অল্প-একটু হাসির ছোঁয়া। কৌশিক অবশ্য বলে যে, ওই হাসিটাই হচ্ছে মারত্মক, 'ও যে হাসতে-হাসতেই কখন কার সোলার প্লেক্সে রদ্দা মেরে বসবে, তার ঠিক নেই।' বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। আগে বাঙ্গালোরে ছিল। বছর পাঁচেক হল এখানকার কাজকর্মের সামাল দিচ্ছে।

সুরিন্দর এল কাঁটায়-কাঁটায় দশটায়। আমাকে আর সদানন্দবাবুকে নমস্কার করে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "অওর কুছু করবার আছে?...আই মিন এমোন কাজ, যেটা আখুনি করা দরকার।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "সেটা একটু বাদে বলছি। আগে বলো যা-যা করতে বলেছিলাম, সেগুলো সব ঠিকমতো হয়েছে কি না। অল আই ওয়ান্ট ইজ আ প্রোগ্রেস রিপোর্ট।"

"রিপোর্ট তো রেডি হো রহা হ্যায়, বস্। ওটা দু'দিন বাদে দিব।" সুরিন্দর তার মুখের হাসিটা ধরে রেখে বলল, "বাট অল দ্য আনসার্স আর অন মাই ফিঙ্গার টিপ্স। আপনি কোয়েশ্চেন কোরেন, আমি আনসার ব্যতাচ্ছি।"

"ভাল।" ভাদুড়িমশাই বললেন, 'ট্রাকটার কোনও হদিশ করতে পারলে?"

"শিওর। ওটা পাঞ্জাবের ট্রাক। বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কের কাছে রিজের রাস্তায় ঘোষ-সাহাবের গাড়িতে বাঁ দিক থেকে ধাক্কা লাগায়। ফর দ্য লাস্ট থ্রি ডেজ ওটা ওখ্লার ওদিকে একটা গারাজে আছে।"

"কিন্তু পুলিশ তো বলছে, অমিতাভ ঘোষ থানায় যে নাম্বারের কথা বলেছিল,

সেই নাম্বারের কোনও ট্রাকের খোঁজ তারা পায়নি।"

"কী করে পাবে, সেটা তো ফল্‌স নাম্বার-প্লেট। পুলিশও জানে যে, সেটা ফল্‌স। অ্যাকসিডেন্টের পরে সেটা পাল্‌টে ফির আসলি নাম্বার লাগিয়ে নিয়েছে।"

"তুমি তা হলে ট্রাকটাকে আইডেন্টিফাই করলে কী করে?"

"ভেরি সিম্প্‌ল, বস্‌।" সুরিন্দর বলল, "অ্যাকসিডেন্টের খবরটা আপনি আমাকে লাস্ট মঙ্গলবার সাত তারিখে দিলেন। বললেন, ঘোষ-সাহাবের গাড়ি, টাটা সুমো। ইউ অল্‌সো গেভ মি দ্য প্লেস অ্যান্ড টাইম। রাইট?"

"হ্যাঁ, আমি মুম্বই থেকে তোমাকে ফোন করি। তার একটু আগেই এখান থেকে অমু আমাকে ফোনে সব জানিয়েছিল।"

"ইয়েস, বস্‌। তো আপনার ফোন পেয়ে আই ওয়েন্ট টু দ্য প্লেস অভ দ্য অ্যাকসিডেন্ট। ঘোষ-সাহাব তখন সেখানে ছিলেন না।"

অমিতাভ বলল, "কী করে থাকব। পথ-চলতি একটা অটো ধরে আমি থানায় চলে গেসলাম।"

"কিন্তু আপনার স্ম্যাশ্‌ড্‌ গাড়িটা সেখানে ছিল।" সুরিন্দর বলল, "আমি গিয়ে দেখলাম, থানা থেকে একজন কনস্টেব্‌ল্‌কে সেখানে পাহারায় রাখা হয়েছে। গাড়ির কাছে ট্রাকের চাকার দাগ ছিল। আমি চাকার দাগের ছবি তুলি। ভাঙা এক টুকরো কাচ ছিল। সেটাও কুড়িয়ে নিই।"

"আমার টাটা সুমোর কাচ?"

"ওহ্‌ নো। ড্রাইভারের ডাইনে দরজার বাইরে একটা সাইড-গ্ল্যাস থাকে তো, এটা সেই সাইড-গ্ল্যাসের একটা ভাঙা টুকরো। লেকিন আপনার গাড়িতে দেখলাম বাঁ-দিকের জানলা আর সামনের কাচটা স্ম্যাশড হয়ে গেলেও ড্রাইভারের সাইড-গ্ল্যাসটা ভাঙেনি। এটা সেই কিলার-ট্রাকের সাইড-গ্ল্যাসের একটা পিস্‌।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তারপর?"

"তারপর আমি লোক লাগালাম। অল ওভার দ্য সিটি অ্যান্ড সাবার্ব আমার এজেন্টদের বলে দিলাম, এইসা এক ট্রাকের পতা মিলনা চাহিয়ে, যার ড্রাইভিং সিটের ডানদিকের সাইড-গ্ল্যাস ভেঙে গেছে, যার সব ক'টা টায়ারই একদম ব্র্যান্ড নিউ...অ্যান্ড ইয়েস, যার সামনের দিকের মাডগার্ডে এমন দাগ লেগে আছে, যাতে বোঝা যায় যে, ট্রাকের সামনের দিকটা ডিপ মেরুন কালারের কোনও গাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল।"

"আরে," অমিতাভ বলল, "আমার টাটা সুমোর'তো ওই রং। ডিপ ড্যাজলিং মেরুন!"

"তো ডিপ ড্যাজলিং মেরুন কালারের গাড়িকে ধাক্কা মারলে, যে সেই ধাক্কাটা মারল, ঘষটানি লেগে তার গাড়ির গায়েও ওই রং একটু লেগে যাবে না?"

ভাদুড়িমশাইয়ের চোখ কৌতুকে ঝিকমিক করছিল। বললেন, "আ ভেরি

ক্লেভার পিস অব ডিডাকশন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, বস্।" সুরিন্দর বলল, "তো আমাদের এজেন্টদের যেমন এই ক্লুগুলান আমি দিয়ে দিলাম, তেমনি জানালাম দিল্লি পুলিশের হেডকোয়ার্টার্সে আমার এক বন্ধুকে, যাতে সে থানাগুলানকে এটা ইমিডিয়েটলি বলে দেয়। অ্যান্ড ইয়েস, স্পেয়ার পার্টসের দুকান অওর গাড়ি-মারাম্মতির গারাজগুলোও জেনে যায় যে, উই আর অন দ্য লুক আউট ফর আ ট্রাক উইথ ব্র্যান্ড নিউ টায়ার্স, আ ব্রোকেন সাইড-গ্ল্যাস অ্যান্ড আ প্যাচ অব ডিপ ড্যাজলিং মেরুন অন ইট্স্ ফ্রন্ট মাডগার্ডস।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ট্রাকের লোকেরাও নিশ্চয় আন্দাজ করেছিল যে, একটা অ্যালার্ট জারি হয়ে যাবে, ফলে পরদিনই কোনও স্পেয়ার-পার্টসের দোকান থেকে সাইড-গ্ল্যাস পালটে নেওয়া কি কোনও গাড়ি রিপেয়ার গারাজে গিয়ে মাডগার্ডের ওই ছোপটা তুলিয়ে আবার নতুন করে রং করানোটা খুব নিরাপদ হবে না।"

"ইয়েস, বস্।" সুরিন্দর বলল, "শেষ পর্যন্ত ওখ্‌লার একটা গারাজে ওটার খোঁজ মেলে। খোঁজটা যে দিয়েছে, সে বলল, মঙ্গলবার রাত থেকে ওটা ওই গারাজেই পড়ে আছে, ওখান থেকে আর বাহার হয়নি।...তো এটা কি দিল্লি -পুলিশকে জানাব?"

"জানাতে তো হবেই।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "ট্রাফিকের অমৃক সিং আমার চেনা লোক। আমার নাম করে তাকে সব জানাও। তবে হ্যাঁ, তাকে বলো যে, এখুনি কাউকে অ্যারেস্ট করার দরকার নেই, শুধু লোকাল থানা যেন গারাজটার উপরে সারাক্ষণ নজর রাখে। জায়গাটা কেমন, সুরিন্দর? জাস্ট একটা গারাজ?"

"ঠিক গারাজও নয়। ধাবার লাগোয়া একটা পার্কিং লটের মতো। অনেকেই ওখানে ট্রাক রাখে।"

"ভাল। তা হলে নজর রাখুক ধাবায় কারা আসে, কখন আসে। কাউকে শেডি ক্যারেকটার বলে মনে হয় কি না। তেমন কেউ আসে কি না, পুলিশের খাতায় যার নাম রয়েছে।"

"ঠিক আছে, এখান থেকে ফিরে গিয়েই আমি অমৃক সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে সব বলব। এনিথিং এল্স?"

ভাদুড়িমশাই একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, "কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে?"

"কালই করেছিলাম। অগর কাল তো সান্‌ডে থা, ইসি লিয়ে শোভন চৌধুরিকে লালবাজারে পাওয়া যায়নি। বাড়িতে ফোন লাগাতে হল। আপনার নাম করে সদানন্দবাবুর কথা ওঁকে বললাম।"

সুরিন্দর বেদীর মুখে হঠাৎ নিজের নামটা উচ্চারিত হওয়ায় সদানন্দবাবু উৎকর্ণ

হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে লক্ষ করলুম, ভদ্রলোকের কপালে গোটা তিনেক ভাঁজ পড়ে গেছে।

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তাতে শোভন কী বলল?"

"বললেন যে, যে-মেয়েটা খুন হয়েছে, উইদিন আ ডে অর টু তার ময়না-তদন্তের রিপোর্ট মিলবে, তার আগে কুছু বলা যাচ্ছে না। এটাও বললেন যে, জাল-নোটের ব্যাপারে নতুন কুছু খবর নাই। অওর হাঁ, সদানন্দবাবু যাতে হ্যারাস্‌ড না হন, সেটা উনি দেখবেন। আজ কি ওঁকে অওর একবার ফোন লাগাব?"

"না, তোমাকে আর ফোন করতে হবে না, ভাবছি দুপুরের দিকে আমি নিজেই শোভনকে একবার ফোন করব। তুমি বরং এ-দিকটা সামলাও।"

"অওর কুছু আপনার জানবার নাই?"

"আর কী জানব?"

"কেন, ঘোষ-সাহাবের বাড়িতে ওই যে ফোনের রিসিভার পালটানো হল, সেইটা?"

হঠাৎই আবার সরু হয়ে গেল ভাদুড়িমশাইয়ের চোখ। সেই সরু চোখে তিনি সুরিন্দরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর হোহো করে হেসে উঠে বললেন, "ওটা তা হলে তুমিই পালটে দিয়ে এসেছ? আমার বোঝা উচিত ছিল।"

সুরিন্দরও হাসছিল। মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেলেও চোখে সেটাকে আটকে রেখে বলল, "না বস্, আমি নিজে পালটাইনি। আই গট দ্য জব ডান বাই আ টেলিফোন-মেকানিক। টেলিফোন-এক্সচেঞ্জে আমাদের লোক আছে, অ্যান্ড হি ইজ অন আওয়ার পে-রোল। রিসিভারে যে মেকানিক্যাল ডিভাইসটা লাগানো আছে, সেটা অবশ্য আমিই সাপ্লাই করেছিলাম।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাদুড়িমশাই বললেন, "একটা কথা ভাবছি, সুরিন্দর। অমিতাভর বাড়িতে তুমি যাকে পাঠিয়েছিলে, সে গিয়ে সুলেখাকে... আই মিন অমিতাভর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, ওদের রিসিভারটা কোনও গণ্ডগোল করছে কি না। তাতে সুলেখা বলে যে, মাঝেমধ্যে একটা জারিং সাউন্ড হয়। তো সুলেখা যদি তা না-বলত, তা হলে কী করে...আই মিন কোন্ অজুহাতে রিসিভারটা পালটে দিত তোমার লোক?"

সুরিন্দর বলল, "আমি একটা বেপারে শিওর ছিলাম, এখনও আছি।"

"সেটা কী?"

"আপনি যদি একটা র‍্যান্ডম সার্ভে করে এ-দেশের যে-কোনও শহরে যে-কোনও একশোটা লোককে পুছেন যে, তার ফোনের রিসিভার ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, তো অ্যাট লিস্ট নাইন্টি পিপ্‌ল বলবে যে, না, ঠিকঠাক কাজ করছে না, একটা-না-একটা কমপ্লেন তারা করবেই। সো মাই ম্যান টুক আ চান্স।"

আমি বললুম, "তা তো হল, কিন্তু এতে কাজটা কী হবে?"

প্রশ্ন শুনে সুরিন্দর যে-ভাবে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকাল, তাতে বুঝলুম, এ নিয়ে আর-কিছু ব্যাখ্যা করে বলা ঠিক হবে কি না, সে সেটা তার উপরওয়ালার কাছে জানতে চাইছে। ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "গো অ্যাহেড।"

সুরিন্দর এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘোষ-সাহাবের বাড়িতে যে নতুন রিসিভারটা বসানো হল, তার ভিতরে একটা ছোট্ট যন্তর লাগানো আছে। আ ভেরি স্মল ওয়ান। সর্ট অব আ ক্যাসেট। বাইরে থেকে যে-ই ওদের ফোন করুক, সঙ্গে-সঙ্গে ওটা অ্যাকটিভেটেড হবে অওর তার ভয়েস ওতে রেকর্ডেড হয়ে যাবে।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "আমি ধরে নিচ্ছি, যে-লোকটা ওদের ছেলেকে তুলে নেবে বলে ফোনে হুমকি দিয়েছিল, দু'এক দিনের মধ্যে সে আবারও ফোন করে হুমকি দেবে। যদি দেয়, তো সঙ্গে-সঙ্গে রেকর্ডেড হয়ে যাবে তার ভয়েস। তা পুলিশের কাছে তো দাগি অপরাধীদের ভয়েস-স্যাম্প্‌ল থাকেই। ফলে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারব যে, সেই সব স্যাম্পেলের কোনওটার সঙ্গে এর গলার স্বর কি কথা বলার ঢং মিলে যায় কি না।"

"তা এতই যখন করা সম্ভব," আমি বললুম, "তখন ইনকামিং কলের সোর্স...মানে লোকটা কোন্ নম্বর থেকে ফোন করছে সেটা ট্রেস করা যায় না?"

সুরিন্দর বলল, "কেনো যাবে না? এক্সচেঞ্জে যে-লোকটি আমাদের হয়ে কাজ করে, তাকে সেটা বলেছি। ঘোষ-সাহাবের টেলিফোন-নাম্বার সে জানে। ওখানে কে ফোন করছে আর কোন্ নাম্বার থেকে করছে, অফ কোর্স হি উইল কিপ অ্যান আই অন দ্যাট।"

"কিন্তু এটা...আই মিন এই ফোন-ট্যাপিং, এই ভয়েস-রেকর্ডিং, এটা কি মানুষের প্রাইভেসির উপরে হামলা নয়? সেদিক থেকে তো এটা ঘোর বে-আইনি ব্যাপার।"

সুরিন্দর এতক্ষণ নিঃশব্দে হাসছিল। এবারে শব্দ করে হাসল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, "অফ কোর্স বে-আইনি বেপার। কিন্তু চাটার্জি-সাব, একবার ভাবুন যে, বে-আইনি বেপারটা আমরা করছি কেনো। দেশের যেটা আইন, সেটাকে হেল্‌প করবার জন্যেই তো। সো হোয়াট্'স রং দেয়ার?"

এর পরে আর কী বলা যায়? আমি চুপ করে গেলুম।

সদানন্দবাবু অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেননি। কিন্তু তাঁর মুখ দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে, কিছু একটা বলতে চান। তবে তা বলা উচিত হবে কি না, সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না।

ভাদুড়িমশাই তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ, মানে ভাবছিলুম যে...ভাবছিলুম যে..."

"কী ভাবছিলেন?"

"ভাবছিলুম যে, কলকাতায় কি অমন কোনও যন্তর লাগাবার ব্যবস্থা নেই?" সদানন্দবাবু বললেন, "তা হলে তো কোত্থেকে কে আমাকে ভয় দেখাচ্চে, সেটাও জানা যেত।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "আছে বই কী। কলকাতাতেও আছে। তবে এ নিয়ে আপনি এত ভাববেন না। ভয়ের কিছু নেই। আপনার ব্যাপারে কী-কী স্টেপ নিতে হবে, কলকাতায় ফোন করে কৌশিককে সেটা আমি বলে দেব। তা ছাড়া আজ দুপুরেই তো শোভনের সঙ্গে কথা বলছি। না না, আপনি চিন্তা করবেন না।"

আমি বললুম, "তা হলে এখন আমরা কী করব?"

"দুপুর একটায় নীচের ডাইনিং হলে গিয়ে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবেন। ততক্ষণ গল্প করুন। মার্চের চমৎকার ওয়েদার, ইচ্ছে হলে বাইরে থেকে একটু ঘুরেও আসতে পারেন। আমি এখন আমার ঘরে গিয়ে গোটাকয় চিঠি লিখে ফেলব।"

সুরিন্দরকে নিয়ে ভাদুড়িমশাই আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

।। ৮ ।।

ভাদুড়িমশাই বিদায় নেবার পর কিচেনে ফোন করে আমাদের ঘরে এক পট কফি পাঠিয়ে দিতে বলি। মিনিট দশেকের মধ্যে কফি এসে যায়। সদানন্দবাবুর উপদেশ অনুযায়ী অনেক বছর ধরেই আমি দুধচিনি না-মিশিয়ে চা খাচ্ছি। নাকি ওতে অ্যাসিডিটি হয় না। তবে কফিটা ওইভাবে খেতে পারি না, বড্ড তেতো লাগে। সদানন্দবাবু আগে কফি খেতেন না, আজকাল খাচ্ছেন। কফিতে অবশ্য তাঁরও দুধচিনি চাই। দুটো পেয়ালায় কফি ঢেলে, দুধচিনি মিশিয়ে, একটা পেয়ালা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, "কেমন বুঝছেন?"

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বেজার মুখে ভদ্রলোক বললেন, "এর আর বোজাবুজির কী আচে। যে গাড্ডায় পড়েচি, ভালয়-ভালয় উদ্ধার পেলে হয়।"

বললুম, "ভয় পাবেন না।"

"ভয় কি সাধে পাচ্চি।" কফিতে আর-একটা চুমুক দিয়ে, যেন কফি নয়, চিরতা-ভেজানো জল খেয়েছেন, এই রকমের মুখ করে সদানন্দবাবু বললেন, "ও যে আমাদের পদ্মই, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। এখন এই খুনের ব্যাপার নিয়ে পুলিশ না আমাকে টানাটানি করে। কে জানে, পুলিশ হয়তো এতক্ষণে আমাদের বাড়িতে এসেও গেচে। আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করে জেনেও গেচে যে, আমি দিল্লিতে চলে এসেচি। এখন এই কলকাতা ছেড়ে চলে আসাটাকে তারা

কীভাবে নেবে? আমি পালিয়ে এসেচি, এমন ভাববে না তো?”

আমিও যে ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছি, ভদ্রলোককে তা আর বললুম না। বললে উনি আরও ঘাবড়ে যাবেন। তাই যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললুম, “তা নিশ্চয় ভাববে না। লোকে তো কাজেকর্মেও বাইরে যায়। যাবার দরকার হয় বলেই যায়। আর তা ছাড়া, সুরিন্দর তো আপনার ব্যাপারে শোভনের সঙ্গে কথা বলেছেই। ভাদুড়িমশাইও বললেন যে, আজ দুপুরে লালবাজারে ফোন করে শোভন চৌধুরির সঙ্গে কথা বলবেন। সেইসঙ্গে অমুর কথাটাও ভাবুন। সমস্যা যেমন আপনার, তেমনি অমুরও। দু'দু'বার তার উপরে হামলা হয়েছে, ফোনে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কই, সে তো আপনার মতো ঘাবড়ে যায়নি।”

নেতিয়ে-পড়া ভিতু মানুষও দেখেছি অনেক সময় হঠাৎ-হঠাৎ তেতে ওঠে। অমুর কথায় সদানন্দবাবুও হঠাৎ দুম করে তেতে উঠলেন। বললেন, “ঠিক, ঠিক, অমু ইজ এ কারেজাস ইয়ং ম্যান! আমাকেও ওই রকমের কারেজাস হতে হবে। আমি তো কোনও দোষ করিনি। তা হলে ভয় পাব কেন?”

“তা হলে চলুন, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। সবে তো এগারোটা বাজে। চমৎকার ওয়েদার, পাড়াটাও ভাল, একটু ঘুরে এলে দিব্যি লাগবে। লাঞ্চ একটায়, তার মানে আমাদের হাতে এখনও দু'ঘণ্টা সময়। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।”

ভেবেছিলুম, ভদ্রলোকের মন-মেজাজের এই যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাতে বাইরে যাবার প্রস্তাবটা তিনি লুফে নেবেন। কোথায়! সদানন্দবাবু হঠাৎ আবার সেই আগের মতোই নেতিয়ে পড়ে বললেন, “না, মশাই, বাইরে গিয়ে কাজ নেই।”

“কেন?”

“সকালে তো একবার বেরিয়েছিলুম। তখন একটা ব্যাপার দেখেচি, সেটা আমার খুব ভাল ঠেকেনি।”

“কী দেখেছিলেন?”

“কাছেই একটা পান-সিগারেটের দোকান আচে, চোখে পড়েচে?”

“পড়েছে। তাতে কী হল?”

“তা হলে শুনুন। ভোরবেলায় যখন মর্নিং ওয়াক করতে বেরোই, দুটো লোক তখন ওই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা লোক ফর্সা আর বেঁটে, অন্যজন আবলুশ কাঠের মতো কালো আর ঢ্যাঙা। তো আমি তাদের পাশ দিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে তো একটা পার্কে গিয়ে ঢুকলুম। ঢুকে চক্করও দিলুম গোটা দশেক। তাতে ঘণ্টা খানেক লাগল। তা আমার মনে হল, ঘণ্টা খানেক যখন হেঁটেচি, তখন নিশ্চয় মাইল তিনেক হাঁটা হয়ে গেচে, তা হলে আর হেঁটে কাজ নেই, ওভার-এক্সারসাইজ হয়ে যাবে। এই ভেবে আমি পার্ক থেকে বেরিয়ে আবার এখানে

ফিরে আসি। তো ফিরে আসার সময় কী দেকলুম জানেন?”

“আপনি না-বললে কী করে জানব? কী দেকলেন?”

“দেকলুম যে, সেই লোক দুটো তখনও ওই পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আচে, আর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে আমাদের এই বাড়িটার দিকে তাকাচ্চে।”

আশ্চর্য ব্যাপার! দুটো লোক একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, এ তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে বিচলিত হবার কী আছে!

কথাটা সদানন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, “বাঃ, আপনি তো অদ্ভুত লোক! আরে মশাই, দাঁড়িয়ে থাক্ না, কিন্তু এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন, আর মাঝে-মাঝে ত্যাড়চা চোখে এই বাড়িটার দিকে তাকাবেই বা কেন? সন্দেহজনক ব্যাপার নয়?”

‘ত্যাড়চা চোখে’ কথাটা আগে বলেননি, এটা এবারে যোগ করলেন। সন্দেহ নেই যে, এর পরে যখন আবার এই ঘটনার কথাটা উঠবে, সদানন্দবাবু তখন আরও দু’চারটে নতুন-নতুন কথা যোগ করবেন। আপাতত এইটে বুঝলুম যে, সদানন্দবাবুর বাইরে বেরুবার ইচ্ছে নেই। অগত্যা কী আর করা, পায়জামা তো পরাই ছিল, তার উপরে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে আমি একাই বেরিয়ে পড়লুম।

গেস্ট হাউসের গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে ডাইনে তাকিয়ে দেখি, তাজ্জব কাণ্ড, পানের দোকানের সামনে সত্যি দুটো লোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে। একজন মোটামুটি ফর্সা আর বেঁটে, অন্যজন মিশমিশে কালো আর ঢ্যাঙা। ঠিক যেমনটি সদানন্দবাবু বলেছিলেন। দুজনেরই পরনে খাটো ময়লা পায়জামা আর হাফশার্ট। তফাত এই যে, ফর্সা লোকটির হাফশার্টের রং নীল আর কালো লোকটি সাদায়-লালে চেক-কাটা একটা শার্ট পরে আছে। দুজনের পায়েই টায়ার-কাটা রবারের মোটা চপ্পল। ঠেট হিন্দিতে নিচু গলায় দুজনে গল্প করছিল আর হাসছিল।

আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা ম্যাচবাক্স কিনলুম। তারপর দোকানিকে জিজ্ঞেস করলুম যে, এখানে ধারেকাছে কোনও অটো-স্ট্যান্ড আছে কি না। দোকানি লোকটি হাসিখুশি। দোকান থেকে সামনে একটু মুখ বাড়িয়ে বাঁ দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “ওই দিকে খানিকটা এগোলেই একটা ইস্কুল-বাড়ি দেখবেন, তার পাশের গলিতেই অটো দাঁড়ায়।”

আমি একটু হেসে ‘বহোত সুক্‌রিয়া ভাইসাব’ বলে বাঁ দিকে এগিয়ে গেলুম। যেতে-যেতে খানিক বাদে একবার ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল যে, দোকানের সামনে সেই লোক দুটো তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

ইস্কুলের পাশের সরু গলিটা সত্যিই একটা অটো-স্ট্যান্ড। গোটা পাঁচ-সাত অটো সেখানে লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাইনের একেবারে সামনের চালকটিকে

হাত তুলে ইঙ্গিত করতেই সে তার গাড়ি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কলকাতা হলে প্রথমেই সম্ভবত জিজ্ঞেস করত যে, আমি কোথায় যাব। গন্তব্যস্থলটা তার পছন্দ হলে যেত, নয়তো যেত না। এ কোনও প্রশ্ন করল না, আমি সিটে উঠে বসবার পর পিছন ফিরে আমার দিকে একবার তাকাল মাত্র। চাউনির অর্থটা পরিষ্কার, সওয়ারি কোন্ দিকে যেতে চান, সেটা জানালে সে ঠিক করে নিতে পারে যে, কোন্ রাস্তা ধরবে। আসলে আমি যে বিশেষ কোথাও যেতে চাইছিলুম, তা নয়। গেস্ট হাউসে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না বলে বেরিয়ে পড়েছি, ভাবছি যে, ঘণ্টা দেড়েক এ-দিকে ও-দিকে ঘুরে আবার গেস্ট হাউসে ফিরে যাব। অটো-চালককে খোলাখুলি সে-কথা জানালুমও। বললুম, "দ্যাখো ভাই, দিল্লিতে আমি নতুন আসছি না, তবে এ-দিকটায় এর আগে কখনও থাকিনি। তো এক কাম করো, দেড়-দো ঘন্টেকে লিয়ে তুম মুঝে থোড়া ইস্ ইলাকেকো সয়ের করাও, উস্‌কে বাদ ফির্ ইয়াহাঁ হি হামকো ছোড় দেনা।"

আমার হিন্দি শুনে সবাই হাসে। কিন্তু এ-লোকটিকে তো হাজার রকমের সওয়ারি সামলাতে হয়, তাদের কারও-কারও মুখে নিশ্চয়ই এর চেয়েও নড়বড়ে হিন্দি শুনে থাকবে, তাই হাসল না। গম্ভীর মুখে 'ঠিক হ্যায় সাব্' বলে অটোতে স্টার্ট দিতেই সেটা প্রচুর ধোঁয়া ও শব্দ উদ্গিরণ করে আর সেইসঙ্গে কয়েকটা ঝাঁকুনি মেরে চলতে শুরু করল। এমন মোক্ষম ঝাঁকুনি যে, অটোর ছাউনির লোহার একটা রড একেবারে তৎক্ষণাৎ আঁকড়ে না-ধরলে হয়তো আসন থেকে রাস্তার উপরে ছিটকে পড়তুম।

খানিক এগোতেই একটা পার্ক। সদানন্দবাবু কি এই পার্কেই আজ সকালে মর্নিং ওয়াক করে গেছেন? কী জানি, সেটা হয়তো অন্য পার্কও হতে পারে। পার্কের তো এখানে কিছু কমতি নেই। মিনিট তিনেকের মধ্যেই সফদরজং এনক্লেভের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আমরা বড়রাস্তায় গিয়ে পড়লুম, আর তখনই, রাস্তার মোড়ে চোখে পড়ল একটা বিশাল হোর্ডিং। কাল সকালে এয়ারপোর্ট এলাকায় যে হোর্ডিংটা আমরা দেখেছিলুম, এটা তার হিন্দি সংস্করণ। ছবিটা আলাদা। মায়ের কোলে ছোট্ট একটা বাচ্চা, আর সেই বাচ্চাকে ইঞ্জেকশান দেওয়া হচ্ছে। ছবির উপরে নাগরী লিপিতে বড়-বড় হরফে লেখা : ইয়ে সুঁই নয়া হ্যায় কেয়া? ছবির তলায় হিন্দি ভাষায় আরও কিছু লেখা। সিগন্যাল পেয়ে আমাদের অটো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বলে লেখাটা আর পুরো পড়তে পারলুম না। লেখার তলায় আর-একটু বড় হরফে বিজ্ঞাপনদাতার নামটা দেওয়া হয়েছে বলে সেটা অবশ্য পড়ে নেওয়া গেল। ম্যাক্রো কনস্ট্রাকশান ইন্টারন্যাশনাল।

কাল যখন এয়ারপোর্ট থেকে সফদরজং এলাকায় এসে ঢুকি, এই হোর্ডিংটা তখন এখানে ছিল না। থাকলে নিশ্চয় চোখে পড়ত। তা হলে এটা কখন লাগানো হল? সম্ভবত কাল রাত্তিরে। রাত্তিরে রাস্তাঘাটে ভিড়ভাট্টা কম থাকে। অ্যাড-

এজেন্সির লোকেরা হয়তো সেই জন্যেই এটা সেই সময়ে এসে লাগিয়েছে।

অটো চলছে, আর আমি দেখে যাচ্ছি দু'দিকের চোখ-ধাঁধানো ঘরবাড়ি আর দোকানপাট। দিল্লিতে যখনই আসি, একটা ব্যাপার লক্ষ না-করে পারি না। যেমন চওড়া এখানকার রাস্তাঘাট, তেমনি ঝকঝকে-তকতকে সব দোকান। ঘরবাড়ির আর্কিটেকচারও নতুন ধাঁচের। আর গাড়ি! সবই প্রায় হাল-ফ্যাশনের। দেখে বোঝা যায়, এখানে যারা এ-সব পাড়ায় থাকে, পয়সা তাদের অঢেল, দু'হাতে যতই খর্চা করুক, তাদের ভাঁড়ারে কখনও টান পড়ে না। তাই বলে কি এই শহরে গরিব-গুর্বো নেই? আছে বই কী। বিস্তর আছে। নুন আনতে তাদের পান্তা ফুরোয়। তবে এ-সব মহল্লায় তারা থাকবে কী করে? তাদের এলাকা আলাদা। সে-সব এলাকা যে দেখিনি, তা তো নয়। তাও অনেক দেখেছি। এমন সব এলাকা, যেখানে দিনের বেলাতেও রোদ্দুরের প্রবেশ নিষেধ। যেখানে ঢুকলে দম আটকে আসার উপক্রম হয়।

কিন্তু আমি তো এখন চলেছি বসন্তবিহারের রাস্তা দিয়ে। দু'দিকে চোখ বুলোতে-বুলোতে চলেছি। আর যতই দেখছি, ততই তাক লেগে যাচ্ছে। কে বলবে যে, এটা গরিব, উন্নয়নশীল দেশ! এ তো উন্নতির একেবারে পরাকাষ্ঠা! দেশের কোটি-কোটি মানুষের জীবনে এই উন্নতির ছোঁয়া লাগেনি ঠিকই, এটাও ঠিক যে, স্বাধীনতা লাভের পরে বাহান্ন-তিপ্পান্নটা বছর কেটে গেলে কী হয়, জনসাধারণের একটা মস্ত অংশ আজও দারিদ্র-রেখার নীচেই পড়ে আছে, আবার একইসঙ্গে বেশ-কিছু লোকের পকেট যে রাতারাতি দারুণ রকমের ভারী হয়েছে, তাও তো চোখের সামনেই দেখছি।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই একবার মনে হল যে, আর এগোনো বোধহয় ঠিক হবে না। গেস্ট হাউসে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। হাতঘড়িতে বারোটা বাজে। তা হলে আর দেরি না-করে ফেরাই ভাল। অটোওয়ালাকে বললুম, "আব ওয়াপস চলো, ভাইসাব।"

ফিরতি-পথে কিছুক্ষণের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। চমক ভাঙল অটোওয়ালার কথায়। "দেখিয়ে সাব্ ক্যা হো রহা হ্যায়।"

যা দেখলুম, সেটা চমকে যাওয়ার মতোই ব্যাপার বটে। বড়রাস্তা থেকে সফদরজং এনক্লেভে ঢোকার মুখে যেখানে অমুদের সেই হোর্ডিং লাগানো হয়েছে, তার সামনেই রাস্তার ধারে হাতে ঝোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারো-চোদ্দো বছরের গুটি পাঁচ-সাত ছেলে। যে যার ঝোলা থেকে একটার পর একটা ঢ্যালা বার করছে তারা, আর সমানে সেই হোর্ডিংয়ের দিকে ছুড়ে যাচ্ছে। অটো থেকে লাফিয়ে নেমে আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু নামা হল না। অটোওয়ালা ছেলেটি আমার হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, "কুছ্ মাত কহিয়ে সাব্, মুশকিল হোগা।" বলে সে আর দেরি করল না। অটোর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফের তাতে স্টার্ট

দিয়ে সে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারই মধ্যে পিছন ফিরে দেখলুম, চকোলেট রঙের একটা মারুতি ভ্যান একেবারে হঠাৎই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ভ্যানের দরজা খুলে যেতেই ছেলেগুলো তার মধ্যে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। ভ্যানটা তার পরে আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াল না। যে-দিক থেকে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সেই দিকেই ফের ছুটে বেরিয়ে গেল। হোর্ডিংটা ঝুলতে লাগল একটা ছেঁড়া পতাকার মতো। গোটা ব্যাপারটা ঘটে যেতে দু'মিনিটও লাগল না।

গেস্ট হাউসে ফিরে দেখি, ভাদুড়িমশাই আমাদের ঘরে বসে সদানন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। ঢিল ছুড়ে অমুদের হোর্ডিংটার দফা রফা করে দেবার ব্যাপারটা তাঁকে বললুম। সব শুনে তিনি বললেন, "অটোওয়ালা যে আপনাকে আটকেছিল, ছেলেগুলোকে বাধা দিতে দেয়নি, সেটা সে ভালই করেছে। ওদের বাধা দিলে কী হত জানেন? হোর্ডিংয়ের দিকে ঢিল না ছুড়ে আপনার মাথা তাক করে ছুড়ত। ...না না, ওরা বাচ্চা-ছেলে হতে পারে, কিন্তু ওদের পিছনে পাকা মাথা রয়েছে। ওই যারা ভ্যানে করে ওদের ওখানে পাঠিয়েছিল, তারপর আবার ভ্যানে করে জায়গামতো ফিরিয়েও নিয়ে গেছে, তারা। রাত্তিরে আবার আর-এক দল ছেলেকে তারা আর-এক জায়গায় পাঠাবে। আরে মশাই, এই অ্যাড-ক্যাম্পেনে কাদের স্বার্থে ঘা পড়েছে, সেটা বোঝেন না? এ-সব কাজ তারাই করাচ্ছে।"

খিদে পেয়ে গিয়েছিল। বললুম, "একটা তো বাজে। খেতে যাবেন না?"

"যাব।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু কলকাতার কাগজ এসে গেছে, একবার চোখ বুলিয়ে নিন। তিনের পাতায় একটা খবরে দাগ দিয়ে রেখেছি, সেটা পড়তে ভুলবেন না।"

কথাটা যে-ভাবে বললেন, তাতে তিনের পাতাটাই আগে খুলতে হল। দাগ-দেওয়া খবরটি এই রকম :

স্টাফ-রিপোর্টার, ১২ মার্চ—আজ রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ পার্ক সার্কাস কানেক্টর ও বালিগঞ্জ কানেক্টরের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় হাত-পা বাঁধা আবস্থায় বাইপাসের ধারে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বছর ত্রিশ-চল্লিশের একটি পুরুষের মৃতদেহ। পুলিশের ধারণা, লোকটিকে খুন করে চলতি কোনও গাড়ি থেকে ওখানে নিক্ষেপ করা হয়। লোকটির কপালে পুরনো একটি ক্ষতচিহ্ন রয়েছে।

খবরের শেষ লাইনটা পড়ে আমি চমকে উঠে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকালুম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, "চলুন, খেতে যাওয়া যাক।"

।। ৯ ।।

খাওয়া আমার মাথায় উঠে গিয়েছিল। খবরে স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে যে, মৃত লোকটির কপালে রয়েছে একটি পুরনো ক্ষতচিহ্ন। তার মানে কি এ সেই লোক? ভাদুড়িমশাই নিশ্চয় সেই রকমই মনে করেন। তা নইলে আর তিনের পাতার ছোট্ট এই খবরটিকে তিনি আলাদা করে দাগ দিয়ে রাখবেন কেন? তিনি এও বলেছেন যে, পদ্মর আগে এই লোকটারই মরার কথা ছিল। কেন? সদানন্দবাবুর পকেটে যে-লোকটা চাঁদনি স্টেশনে সে-দিন জাল পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিয়েছিল, তার কপালে একটা কাটা দাগ রয়েছে, এটা জানাজানি হয়ে গেছে বলে? আর পুলিশের পক্ষে সেইজন্যে তাকে ধরে ফেলা সহজ হবে বলে?

কী খাচ্ছি সে-দিকে মন নেই, খেতে-খেতে শুধু এইসবই আমি ভেবে যাচ্ছিলুম। একটা কথা তো জলের মতো পরিষ্কার। সেটা এই যে, দেশের নানান জায়গা থেকে এই যে জাল-নোটের খবর আসছে, এ-সব নোট ছাপানো আর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দেওয়া কারও একার কাজ নয়। নোটগুলি বিদেশে ছাপা হলেও কারা কীভাবে সেগুলি এ-দেশে নিয়ে আসছে? আর হ্যাঁ, এ-দেশে সেগুলি পৌঁছেই বা দেওয়া হচ্ছে কাদের কাছে? যাদের কাছেই পৌঁছোক, তারাই নিয়েছে এ-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই জাল-নোটগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ।

অর্থাৎ এটা একটা চক্রের কাজ। কপালে কাটা দাগওয়ালা লোকটা সেই চক্রের হয়ে কাজ করছে। সে নেহাতই একটি চুনোপুঁটি। কিন্তু তাকে নিয়েও বিপদ আছে। পুলিশ যদি তাকে ধরে তো হাজতে ঢুকিয়ে উত্তম-মধ্যম দিলে সে হয়তো ফাঁস করে দেবে যে, কারা তাকে এই কাজে লাগিয়েছে আর কাদের কাছ থেকে সে পেয়েছে এই জাল টাকা। চক্রের লোকগুলোকে ধরে ফেলাও তখন পুলিশের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।

চক্রটা যারা চালাচ্ছে, এই রকমের আশঙ্কা তো তাদের হতেই পারে। হয়েওছে নিশ্চয়। আর তা যদি হয়ে থাকে তো একটা কাজই তাদের পক্ষে করা স্বাভাবিক। কাজটা আর কিছুই নয়, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই কপালে কাটা দাগওয়ালা লোকটাকে এই ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়া। যাতে সে কিছুই ফাঁস করতে না পারে। ঠিক তা-ই তারা করেছে। তারা জানে যে, মরা লোক কথা বলে না।

খাব কী, প্লেটের ভাত নাড়াচাড়া করতে-করতে এই সব কথাই আমি ভাবছিলুম, প্লেট থেকে আর মুখে কিছুই পৌঁছচ্ছিল না। ভাদুড়িমশাই সেটা লক্ষ করে থাকবেন। বললেন, "কী ব্যাপার, খিদে নেই বুঝি? কিছুই তো খাচ্ছেন না?"

বললুম, "না...মানে ভাবছিলুম যে..."

"আরে মশাই, ভাবনাচিন্তার সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। যা ভাববার,

পরে ভাববেন। এখন খেতে বসেছেন, অন্য ব্যাপারে মাথা না-ঘামিয়ে মন দিয়ে খেয়ে যান।"

"কী জ্বালা, খাওয়ায় মন দিতে পারছি কোথায়? লোকটা যদি মরেই গিয়ে থাকে...আই মিন যদি সে খুনই হয়ে থাকে, তা হলে তো আর কোনও আশাই নেই!"

"কীসের আশা নেই?"

"যাদের হয়ে ও কাজ করছিল, তাদের খোঁজ পাবার।"

"তা ঠিক।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "লোকটা বেঁচে থাকলে তাদের খোঁজ পাওয়া যেত। বেঁচে নেই, অতএব তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে না। এটা আপনি একেবারে টু হান্‌ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু এখন আর তা নিয়ে ভেবে কী হবে। এখন খেয়ে নিন। তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যাবে যে, অন্য কোনও উপায়ে তাদের নাম-ঠিকানা বার করা যায় কি না।"

যে-ভাবে, যে-রকম হাল্কা গলায় এই কথাগুলি ভাদুড়িমশাই বললেন, তাতে আমার মনে হল, এর মধ্যে কোথাও কিছু একটা রহস্য রয়েছে, যেটা উনি এখুনি ভাঙতে চান না। বললুম, "কী ব্যাপার বলুন তো। এ-লোকটা কি সেই লোক নয়? অবশ্য কপালে কাটা দাগ থাকলেই যে সেই লোক হতে হবে, এমনও কোনও কথা নেই। ও-রকম দাগ কি পুরনো জখমের চিহ্ন অন্য লোকেরও থাকতে পারে।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "খাওয়া শেষ করে দোতলায় উঠে আমার ঘরে আসুন। তখন এ নিয়ে কথা হবে।"

একটা ব্যাপার লক্ষ করে একটু বিস্ময়বোধ করছিলুম। ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে এই যে আমার এত কথা হল, সদানন্দবাবু এর মধ্যে একটিবারও মুখ খোলেননি। গম্ভীর মুখে চুপচাপ তিনি খেয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ এমনটা কখনও হয় না। যে-প্রসঙ্গে তাঁর কোনও বক্তব্য থাকার কথাই নয়, তাতেও তিনি গোঁত্তা মেরে ঢুকে পড়েন, নিজে কোনও মতামত প্রকাশ না-করলেও মাঝেমধ্যে দুটো-একটা ফোড়ন কাটেন। আর এ তো বলতে গেলে তাঁরই প্রসঙ্গ। যে-লোকটা, উপকার করার ছলে, তাঁর মস্ত অপকার করে গেছে, এবং ডিস্টিংগুইশিং মার্কটা দেখে রেখেছিলেন বলে যাকে একমাত্র তাঁর পক্ষেই শনাক্ত করা সম্ভব, সেই লোকটার মৃত্যু নিয়ে কথা হচ্ছে, অথচ সদানন্দবাবু নীরব, এটা কী করে হয়?

বললুম, "কী হল সদানন্দবাবু, চুপ করে আছেন কেন?"

ভদ্রলোক তাতে মুখ নিচু করে যেমন খাচ্ছিলেন, তেমন খেতে-খেতেই ভাদুড়িমশাইয়ের কথার পুনরুক্তি করে বললেন, "খেয়ে নিয়ে উপরে চলুন, তখন কথা হবে।"

থালা থেকে মুখ তুলে আমার দিকে একবার তাকালেন না পর্যন্ত।

খাওয়া শেষ করে দোতলায় উঠে ভাদুড়িমশাইয়ের ঘরে ঢুকে দেখি, তাঁর মুখচোখের চেহারা এখন একেবারে অন্যরকম। হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনি তো অটো নিয়ে দিব্যি একটা চক্কর দিয়ে এলেন। তো সেই ফাঁকে আমিও কয়েকটা কাজ সেরে নিলুম।"

"আপনি তো বলেছিলেন, গোটা কয়েক চিঠি লিখে ফেলবেন।"

"চিঠি লিখেছি, ফোনও করেছি।"

"কাকে?"

"লালবাজারের শোভন চৌধুরিকে। কলকাতার কাগজ দিল্লিতে আমাদের এই আস্তানায় এসে পৌঁছবার পরই শোভনের কাছ থেকে আসল খবরটা পেয়ে যাই।"

কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। বললুম, "কীসের খবর?"

"কালু মল্লিকের খবর।" ভাদুড়িমশাই হাসছিলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, "কলকাতার আন্ডার-ওয়ার্ল্ড যাকে ন্যাটা কালু বলে চেনে।"

ধাঁধা আরও বেড়েই যাচ্ছিল। বললুম, "প্লিজ মিস্টার ভাদুড়ি, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়, যা বলার স্পষ্ট করে বলুন, আর দগ্ধে মারবেন না। হু ইজ দিস কালু মল্লিক?"

"বলছি, বলছি, সবই বলছি," মুখের হাসিটাকে ধরে রেখেই ভাদুড়িমশাই বললেন, "বাইপাসের ধারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওই যে একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে...এই মানে যার কপালে একটা পুরনো ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, সেটা এই কালু মল্লিকের।"

"তার মানে..."

"তার মানে এই ন্যাটা কালুই চাঁদনি স্টেশনে আমাদের সদানন্দবাবুর পকেটে জাল-নোটটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।"

এতক্ষণে সদানন্দবাবু মুখ খুললেন। রীতিমত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন, "সেইসঙ্গে আমার পাঁচশো টাকার জেনুইন নোটটা যে হাপিস করে দিয়েছিল, সেটাও বলুন।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "এই ন্যাটা কালু হচ্ছে একটি পাকা পকেটমার। জাল নোটের চক্রটা যারা চালায়, সম্ভবত সেই জন্যেই তারা একে রিক্রুট করেছিল। লোকটা যেহেতু পকেটমার, তাই তারা বুঝেছিল যে, একে দিয়ে এই কাজটা করিয়ে নেওয়া খুবই সহজ হবে।"

বললুম, "এই কাজ মানে নিরীহ মানুষদের পকেটে জাল টাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজ?"

"রাইট।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু কালু তো জাত-পকেটমার। তাই, শুধু জাল-টাকা ঢুকিয়ে সে খুশি থাকবে কেন, একই সঙ্গে সুযোগমতো সে আসল

টাকাও সরিয়ে ফেলত।"

সদানন্দবাবু বললেন, "যেমন আমার আসল টাকা সরিয়েছিল।"

"আর ওটাই করেছিল বিশাল ভুল। বলতে গেলে এ একেবারে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারার মতো ব্যাপার। ন্যাটা কালু স্রেফ ওই একটা ভুলের জন্যেই ফেঁসে গেল।"

ভাদুড়িমশাই যে এ-সব কথা কেন বলছেন, কী এর তাৎপর্য, কিছুই আমি বুঝতে পারছিলুম না। অথচ সদানন্দবাবু দেখলুম, মিটিমিটি হাসছেন। তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে অগত্যা আমাকে কবুল করতে হল যে, কিছুই আমার মাথার মধ্যে ঢুকছে না। দু'হাত জোড় করে বললুম, "দয়া করে একটু যদি বুঝিয়ে বলেন তো বড্ডই ভাল হয়।"

"বলছি, বলছি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা একবার আদ্যন্ত ভেবে দেখুন তো। সদানন্দবাবুর পকেটে এই লোকটা যে গত চৌঠা মার্চ তারিখে পাঁচশো টাকার একটা জাল নোট ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তা আমরা জানি।"

সদানন্দবাবু বললেন, "সেইসঙ্গে হাতিয়ে নিয়েছিল আমার পাঁচশো টাকার আসল নোটখানা।"

"তাও জানি। ওটা খুবই ভাইটাল ব্যাপার, তবে ওটার কথায় একটু পরে আসব। তার আগে ওই জাল নোটের কথাটা একটু ভেবে দেখুন।"

বললুম, "কী ভাবব?"

"ভাববার আছে, ভাববার আছে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "লোকটা যে একটা পকেটমার, শোভনের কাছ থেকে তা আমরা জেনেছি। কিন্তু পকেটমাররা তো নেহাতই অল্প জলের মাছ, স্রেফ চুনোপুঁটি। তারা লোকের পকেট হাল্কা করে, কিন্তু জাল-নোট বানায় না। যারা বানায়, ন্যাটা কালুর মতো চুনোপুঁটিদের তারা কাজে লাগিয়েছে। কাজটা কী? না নিরীহ গোবেচারা গোছের লোকদের পকেটে জাল নোট গুঁজে দিতে হবে। সেই বাবদে কিছু টাকাও পাবে তারা। তা সদানন্দবাবুর পকেটে ওই যে পাঁচশো টাকার একখানা জাল নোট গুঁজে দিয়েছিল, কালুকেও সেই বাবদে কিছু টাকা নিশ্চয় তারা দিয়েছে। কত টাকা? তা এই ধরুন, দশ বিশ কি পঞ্চাশ টাকা, ফর ইচ অ্যান্ড এভ্রি ফাইভ হান্ড্রেড রুপি ফেক্ নোট। কী, ঠিক বলছি তো?"

"বলে যান। তারপর?"

"পার্ জাল-নোট কালু কত ফি পেত, দ্যাট্‌স নট ইম্পর্ট্যান্ট। আসল কথা হচ্ছে, লোক বেছে-বেছে পাচার করার জন্যে কালুকে কি আর নিতান্ত একখানাই জাল-নোট দেওয়া হয়েছিল? তা নিশ্চয় নয়। আরও অনেক জাল-নোট তাকে দেওয়া হয়ে থাকবে। আর, যেমন আমাদের সদানন্দবাবুর পকেটে ঢুকিয়েছে, তেমন

নিশ্চয় আরও কিছু লোকের পকেটে কালু ঢুকিয়ে দিয়েছে আরও বেশ-কিছু জাল নোট।"

একটুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন ভাদুড়িমশাই। একটা সিগারেট ধরালেন। তাতে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়াটাকে মুখের মধ্যে আটকে রাখলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর মুখ খুলে ধোঁয়াটাকে গলগল করে বার করে দিয়ে বললেন, "মজা কী জানেন, যে-চক্রটা এর পিছনে রয়েছে, একা কালুকেই যে তারা কাজে লাগিয়েছে, তা নয়, আর একা সদানন্দবাবুর পকেটেই যে তারা জাল-নোট ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাও আমি বিশ্বাস করি না, অথচ এই সর্বনাশা খেলার যারা ভিকটিম...আই মিন যাদের পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে জাল-নোট, পুলিশকে তারা কেউই কিছু জানায়নি। না জানিয়েছেন সদানন্দবাবু, না অন্য কেউ।"

বললুম, "তার মানে তো সুরিন্দর কাল ওই যে শোভনকে ফোন করেছিল, তার আগে পর্যন্ত কলকাতার পুলিশ এ-ব্যাপারে কিছুই জানত না। বাই দ্য ওয়ে, আপনিও তো আজ শোভনকে ফোন করেছিলেন।"

"করেছিলুম। কিন্তু করে দেখলুম, ওখানকার পুলিশ সবই জানে। ইন ফ্যাক্ট, সদানন্দবাবুর জেনুইন নোটখানাকে হাপিস করে দিয়ে যে সেখানে জাল-নোট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও তারা জানত। কবে থেকে জানত জানেন?"

"কবে থেকে?"

"গত শনিবারের আগের শনিবার থেকে। তার মানে চৌঠা মার্চ থেকে। তবে সুরিন্দরের কাছে শোভন সে-কথা ফাঁস করেনি।"

আমার ধাঁধা কাটছিল না। বললুম, "কিন্তু সদানন্দবাবু তো তাঁর পকেটমার হবার কথা পুলিশকে জানাননি। পুলিশ তা হলে এত সব ডিটেল্‌স জানল কী করে?"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "কিরণবাবু, কলকাতা-পুলিশের এফিসিয়েন্সি যে আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে, সেটা ঠিক। কিন্তু তাই বলে তাদের যতটা অপদার্থ আপনারা ভাবেন, একে তো তারা ততটা অপদার্থ নয়, তাদের ইনফর্মেশান-সোর্সের নেটওয়ার্কটা যতই ধসে গিয়ে থাক্, তার কিছু-কিঞ্চিৎ এখনও অবশিষ্ট আছে, আর তার উপরে আছে লাক্ বলে একটা ফ্যাক্টর।"

"লাক্...মানে ভাগ্য?"

"হ্যাঁ, ভাগ্য।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "নইলে ভাবুন, তার মনিবের আসল নোটটা যে পকেটমার হয়েছে, আর তার বদলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা জাল-নোট, এই কথাটা শুনে ফেলার পরে, ট্যাংরার বস্তিতে ফেরার আগে, পদ্মদাসী আবার সেই ওযুধের দোকানে যাবে কেন, আর সেখানে গিয়ে তার শোনা-কথাটা সবাইকে বলবেই বা কেন?"

সদানন্দবাবু বললেন, "সে কী, পদ্ম আবার ওযুধের দোকানে ফিরে গিয়েছিল?

কই, আমি তো সে-কথা জানতুম না।"

"কী করে জানবেন? পদ্ম এই যে দ্বিতীয়বার সেদিন ওষুধের দোকানে গিয়েছিল, তার পরে তো সে আর আপনাদের বাড়িতে ফিরে যায়নি। সেখান থেকেই সে চলে গিয়েছিল তার ট্যাংরার বস্তিতে।"

"কিন্তু পদ্ম আবার ওষুধের দোকানে গিয়েছিল কেন?"

"গিয়েছিল তার মনিবের মান বাঁচাতে। দোকানের লোকদের বলতে যে, তার মনিব জেনেশুনে একটা জাল-নোট চালাবার মতো খারাপ লোক নন, তাঁর পকেটমার হয়ে গিয়ে আসলের জায়গায় নকল নোট এসে গেস্‌ল, আর সেই নকল নোটকেই তিনি আসল নোট বলে ধরে নিয়েছিলেন।"

সদানন্দবাবু আর কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না। ফলে, প্রশ্নটা আমাকেই করতে হল। বললুম, "লালবাজার তা হলে ওই ওষুধের দোকান থেকেই খবরটা পেয়ে যায়?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "সরাসরি পায়নি। দেশে যে একটা জাল নোটের কারবার গজিয়ে উঠেছে, কাগজে তো তার খবর কিছু কম বেরোয় না, সে-সব খবর দোকানের মালিকের চোখেও নিশ্চয় পড়ে থাকবে, তিনি তাই আর দেরি না করে পদ্মদাসীর কথাটা লোকাল থানাকে জানিয়ে দেন, আর লোকাল থানাও আঁচ করে যে, এর মধ্যে একটা চক্রের হাত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ফলে তারা আর ঝুঁকি না নিয়ে লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে সব জানিয়ে দেয়।"

"শোভনই আপনাকে এ-সব কথা বলল?"

"শোভন বলল, শোভনের ওপরওয়ালাও বললেন। তবে কোনও রাখঢাক না-করে তিনি জানালেন যে, চক্রটাকে ভাঙবার জন্যে বাছাই-করা জনাকয় লোককে নিয়ে একটা টিম গড়া হয়েছে ঠিকই, আর টিমের প্রত্যেকটি লোকই খুব খাটছে বটে, বাট ইয়েস, দে মাস্ট গিভ দ্য ক্রেডিট হোয়্যার ইট্'স ডিউ, এ-ব্যাপারে শোভনের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি।"

"এ-ব্যাপারে শোভন আসছে কোত্থেকে?"

"যে-টিমটা গড়া হয়েছে, তারা কাজ করছে শোভনেরই লিডারশিপে, আর শোভন এগোচ্ছে আমি যে লাইনের কথা আপনাদের বলেছি, একেবারে সেই লাইনে।"

ভাদুড়িমশাই যে কোন লাইনের কথা আমাদের বলেছিলেন, তক্ষুনি সেটা মনে করতে পারলুম না। বললুম, "লাইনটা কী?"

"বাঃ মনে নেই?" ভাদুড়িমশাই অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "মেমারি দেখছি বর্ধমান! আরে মশাই, একটু আগেই তো বললুম, ন্যাটা কালু ওই যে সদানন্দবাবুর আসল নোটখানা সরিয়ে ফেলেছিল, ওটাই হয়ে গেল তার

মস্ত ভুল। ব্যাটা লোভ সামলাতে পারল না। ফলে যা হয় আর কি, লোভে পাপ, ব্যাটা সেই পাপের ফলে পস্তাল। নিজেই ফাঁস করে দিল ওর আইডেন্টিটি। আমি বুঝে গেলুম, এ-লোকটা পকেটমার। আপনাদের কি তা বলিনি? আমি তো বলেইছি যে, জাল-নোটের চক্র এ-কাজে পকেটমারদের লাগিয়েছে।"

বললুম, "আপনি তো বুঝেছেন। কিন্তু শোভন বুঝল কী করে?"

"বুঝল, কারণ, পদ্ম ওই যে দ্বিতীয়বার ওষুধের দোকানে গিয়ে বলেছিল যে, তার মনিবের পকেট থেকে আসল নোট সরিয়ে নিয়ে জাল নোট ঢোকানো হয়েছে, সেই কথাটাই তো ওষুধের দোকান থেকে লোকাল থানা হয়ে লালবাজারে পৌঁছয়, আর গোটা ব্যাপারটার মোডাস অপারেন্ডি থেকেই শোভন বুঝে যায়, এটা কোনও পাকা পকেটমারের কাজ। ইট'স অ্যাজ সিম্প্‌ল অ্যাজ দ্যাট।"

রহস্যটা আস্তে-আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছিল। বললুম, "তারপর?"

ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "তার পরের ব্যাপারটা বোঝার আগে দুটো কথা জেনে রাখুন। প্রথমত, বড়-বড় সব শহরেই পকেটমারদের মধ্যে এরিয়া ভাগ করা থাকে। যে-গ্যাঙের যেটা এরিয়া, সেই গ্যাঙের লোকেরা সেই এরিয়ার বাইরে পারতপক্ষে নাক গলায় না। বলতে পারেন আন্ডারওয়ার্ল্ডে এটা একটা চুক্তির মতো। ভদ্রলোকের চুক্তি। না না, অবাক হবেন না। নিজেদেরই স্বার্থে এই চুক্তিটা তারা করে নিয়েছে, যাতে এক গ্যাঙের তল্লাটে আর-এক গ্যাঙের লোক না ঢুকে পড়ে, আর তার পরিণামে না তাদের নিজেদের মধ্যেই একটা লাঠালাঠি লেগে যায়। তো এই হচ্ছে প্রথম কথা।"

সদানন্দবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে সব শুনছিলেন। ভাদুড়িমশাই চুপ করতে বললেন, "দ্বিতীয় কথাটা কী?"

"দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সব শহরের পুলিশই এটা জানে। জানে কলকাতার পুলিশও। আর জানে বলেই শহরের হরেক এরিয়ার পকেটমারদের এই গ্যাংগুলোর কাজ-কারবারের খোঁজ যাতে ঠিকমতো পাওয়া যায়, পুলিশকে তার জন্যে পুষতে হয় কিছু ইনফর্মার।...না না, আবার বলছি, অবাক হবেন না। আরে মশাই, এমন কথা কি কখনও শোনেননি যে, চৌরঙ্গির কোনও সিনেমা-হল কি হোটেলের সামনে কারও একটা দামি কলম কি হাজার কয়েক টাকা পকেটমার হল, আর তিনি গিয়ে লালবাজারে সে-কথা জানাবার পরে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পুলিশ সেটা উদ্ধার করে দিল...কী, কখনও শোনেননি এমন ঘটনার কথা?"

বললুম, "শুনেছি। এই রকমের একটা ঘটনার খবর তো কিছুকাল আগে কাগজেও বেরিয়েছিল। একজন বিদেশি ছাত্র, যদ্দুর মনে পড়ছে জাপানি ছাত্র, নাম তাকাহাসি...কলকাতায় বেড়াতে এসে যখন ঘোরাঘুরি করছে, তখন ওই চৌরঙ্গিতেই তার টাকাপয়সা আর পাসপোর্ট খোয়া যায়। কখন যে কে তার পকেট থেকে নিঃশব্দে সে-সব তুলে নিয়েছে, বেচারা কিচ্ছু টের পায়নি। অবস্থাটা একবার

ভেবে দেখুন। একে তো পকেট বিলকুল ফাঁকা, তার উপরে বিদেশে-বিভুঁইয়ে পাসপোর্ট খোয়া যাওয়া মানে তো মাথার উপরে আকাশ ভেঙে পড়া! তা পুলিশে সে-কথা জানাবার পরে মাত্র ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই কিন্তু তারা তার সবকিছু উদ্ধার করে দিয়েছিল।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কী করে উদ্ধার করতে পেরেছিল বলে আপনার মনে হয়?"

"ওই ইনফর্মারদের কল্যাণে?"

"রাইট। স্রেফ ওই ইনফর্মারদের কল্যাণে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তারাও তো আন্ডারওয়ার্ল্ডেরই লোক, তারাই পুলিশকে সব জানিয়ে দেয়।"

ভাদুড়িমশাই আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ফের একটা সিগারেট ধরিয়ে, গোটাকয়েক টান মেরে সেটাকে অ্যাশট্রেতে পিষে দিয়ে বললেন, "ভাগ্যের কথা বলছিলুম না? শোভন ইজ আ লাকি চ্যাপ। পদ্মদাসীর কথাটা ওই যে ওষুধের দোকান থেকে লোকাল থানা হয়ে লালবাজারে পৌঁছল, তাতেই শোভন বুঝে গেল যে, লোকটা নির্ঘাত পকেটমার। তারপর বুধবার আটুই মার্চ কলকাতা থেকে কিরণবাবুর ফোন পাবার পরে আমিও আর দেরি না-করে বাঙ্গালোর থেকে শোভনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি। কালপ্রিটের ডিস্টিংগুইশিং মার্কটার কথা তো তার আগে রবিবার...মানে পাঁচুই মার্চ তারিখে...সদানন্দবাবুর মুখেই শুনেছিলুম, শোভনকে সেটাও জানিয়ে দিই। ফলে তার কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ইনফর্মারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে জানিয়ে দেয় যে, কাজটা হয়েছে চাঁদনি স্টেশনে, সুতরাং কালপ্রিট নিশ্চয় এমন গ্যাঙের লোক, চাঁদনি স্টেশন যাদের অপারেশনের এরিয়ার মধ্যে পড়ে। আর হ্যাঁ, তার কপালে একটা কাটা দাগ রয়েছে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী, ইনফর্মারদের কাছ থেকে একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই মিলে গেল তার হদিশ। লোকটার নাম কালু, ডান হাতের তুলনায় বাঁ হাত বেশি চলে, লেফ্‌টি, তার থেকেই ক্রমে ন্যাটা কালু নামটা চালু হয়ে যায়।"

সদানন্দবাবু বললেন, "পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেচে নিশ্চয়?"

আমি বললুম, "অ্যারেস্ট করবে কী, সে তো মারা গেছে! কাগজে তো তারই খবর দেখলুম।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, সবটা আগে শুনুন।...না, পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেনি। তবে তাকে ওয়াচে রেখেছিল। সারাক্ষণ তাকে শ্যাডো করে যাচ্ছিল। দেখছিল, সে কোথায় কোথায় যায় আর কারাই বা তার কাছে আসে। ন্যাটা কালু ইজ আ স্মল ফ্রাই, তাকে অ্যারেস্ট করে তো আর মস্ত কোনও লাভ হবে না, পুলিশ তাই তার মারফতে চেষ্টা করছিল জাল-টাকার চক্রের পিছনে

যারা রয়েছে, সেই রাঘব-বোয়ালদের কাছে পৌঁছতে।"

"পৌঁছতে পারা গেছে?"

"এখনও পারা যায়নি।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "তার কারণ, পুলিশের নজর এড়িয়ে এরই মধ্যে একদিন তিলজলার ওদিকে একটা বস্তি-এরিয়ায় সে হঠাৎ ভ্যানিশ করে যায়। পুলিশ তাকে সেখানে ঢুকতে দেখেছিল, কিন্তু তারপরে আর বেরিয়ে আসতে দেখেনি।"

"এ-ব্যাপারে শোভন কী বলছে?"

"শোভনের ধারণা, পুলিশ যে তাকে শ্যাডো করছে, এটা আঁচ করে ন্যাটা কালু নিজেই গা ঢাকা দেয়, আর নয়তো ন্যাটা কালু নিজে কিছুই আঁচ না-করলেও জাল-চক্রের পাণ্ডারা বুঝতে পেরে যায় যে, ন্যাটা কালুর পিছু নিয়ে পুলিশ আসলে তাদেরই কাছে পৌঁছতে চাইছে। আর তা যদি তারা বুঝতে পেরে থাকে তো কালুকে গুম করে দিয়েছে তারাই।"

আমি বললুম, "এত সব আন্দাজ করেও শোভন চৌধুরি হাত গুটিয়ে বসে রইল?"

"মোটেই না।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "শোভন কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবার ছেলে! লোকাল থানাকে সঙ্গে-সঙ্গেই সে জানায় যে, তাদের এলাকায় একজন 'ওয়ান্টেড পার্সন' গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। জানায়, লোকটির কপালে আছে কাটা দাগ। জানায়, ওই এলাকা থেকে সে যেন কিছুতেই সরে পড়তে না পারে। সেইসঙ্গে বাইপাসে বাড়িয়ে দেয় পুলিশ-পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা।"

"তাতে কাজ হয়?"

ভাদুড়িমশাই উত্তর দেবার আগেই ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন ধরে ভাদুড়িমশাই বললেন, "ইয়েস?...হ্যাঁ, আমিই কথা বলছি।...এটা কখন এল?...তা হুমকি যে ফের দেওয়া হবে, সে তো জানাই ছিল। ভয় পেয়ো না। বরং এক কাজ করো। এখন তো সাড়ে তিনটে বাজে। বাড়ি ফিরবে কখন?...ঠিক আছে, বাড়ি যাও, তারপর সেখান থেকে ছ'টা নাগাদ এখানে চলে এসো।"

ফোনটাকে ক্রেডলে নামিয়ে রেখে ভাদুড়িমশাই আমাদের দিকে তাকাতেই আমি বললুম, "অমু?"

"হ্যাঁ। ফের হুমকি দিয়ে বলেছে যে, মুন্নার ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে কোনও লাভ হবে না। উইদিন অ্যানাদার টু ডেজ হোর্ডিংগুলো যদি নামিয়ে না নেয়, আর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া যদি বন্ধ না করে তো দুপুরবেলায় বাড়িতে ঢুকে মুন্নাকে খুন করে যাবে। তো ও-কথা এখন থাক, আপনি কী যেন জিজ্ঞেস করছিলেন?...ও হ্যাঁ, শোভন যে-সব ব্যবস্থা নিয়েছে, তাতে কাজ হচ্ছে কি না, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে শুনুন," ভাদুড়িমশাই বললেন, "লোকাল থানা থেকে কয়েকটা

বস্তিতে হানা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কালুকে তারা খুঁজে বার করতে পারেনি। তবে, বাইপাসে পুলিশ-পেট্রোলিং বাড়াবার ফলে যে কাজ হয়েছে, সেটা মানতেই হবে।''

''কী রকম?''

''বলছি, গত শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ একটা পুলিশের জিপ টহল দিতে বেরিয়ে দেখতে পায় যে, একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি পার্ক সার্কাস কানেক্টর থেকে দারুণ স্পিডে এসে মোড়ের আইল্যান্ডটাকে চক্কর না-দিয়েই ডাইনে বাঁক নিয়ে বালিগঞ্জ কানেক্টরের দিকে ছুটতে থাকে। পুলিশের জিপের লোকদের সন্দেহ হয়, অ্যাম্বাসাডরটা নিশ্চয়ই অ্যাকসিডেন্ট করে পালাচ্ছে। তারাও স্পিড বাড়িয়ে পিছু নেয়। কিন্তু অ্যাম্বাসাডরটাও, সম্ভবত পুলিশ পিছু নিয়েছে বুঝতে পেরেই, ছুট লাগায় একেবারে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যের মতো। আর সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই একটা লোককে পথের ধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উধাও হয়ে যায়।''

সদানন্দবাবু বললেন, ''সে কী, পুলিশ তাদের উধাও হতে দিল?''

''হ্যাঁ, দিল। না-দিয়ে উপায় ছিল না।'' ভাদুড়িমশাই বললেন, ''কোন্‌টা বেশি জরুরি কাজ সদানন্দবাবু? অ্যাম্বাসাডরটাকে ধরা? নাকি সেই গাড়ি থেকে যাকে রাস্তার ধারে ছুড়ে ফেলা হয়েছে, তখনও সে বেঁচে আছে কি না, সেটা দেখা?''

আমি বললুম, ''কিন্তু একটা কথা যে আমি বুঝতে পারছি না।''

''কোন্ কথাটা?''

''আপনি যা বলছেন, তাতে মনে হয়, ঘটনাটা ঘটেছে পুলিশের চোখের সামনেই। এটা আপনাকে কে বলল? শোভন নিশ্চয়?''

''হ্যাঁ, শোভন।''

''এদিকে কাগজে লিখেছে, পুলিশের এটা ধারণা। তার মানে তো ব্যাপারটা তারা স্বচক্ষে ঘটতে দেখেনি, অনুমান করে নিয়েছে মাত্র। কোন্‌টা ঠিক?''

ভাদুড়িমশাই হোহো করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, ''শোভন যা বলেছে, সেটাই ঠিক।''

''তা হলে কাগজে ও-কথা লিখল কেন?''

''লিখল, তার কারণ, কাগজকে ওইভাবেই খবরটা খাওয়ানো হয়েছে।...আর হ্যাঁ, লোকটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, এটাও সত্যি নয়, পুলিশ থেকে খাওয়ানো মিথ্যে খবর। যাতে হাত-পা বাঁধা ন্যাটা কালুকে যারা মেরে ফেলতেই চেয়েছিল, কিন্তু পুলিশ তাড়া করায় একেবারে মেরে ফেলতে পারেনি, প্রচণ্ডভাবে জখম করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল গাড়ি থেকে, তাদের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। যাতে তারা ধরে নেয় যে, ন্যাটা কালু মারাই গেছে, সে আর কিছু ফাঁস করতে পারবে না। আ ডেড ম্যান টেল্‌স নো টেল্।''

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে বললুম, ''কালু মারা যায়নি?''

"না, সে বেঁচে আছে, তার চিকিৎসা হচ্ছে, সে একটু-একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে, আর হ্যাঁ, পুলিশকে সে জানিয়েও দিয়েছে এই জাল-চক্রের পাণ্ডাদের গোপন ডেরার খবর। পুলিশ সেখানে খুব শিগগিরই হানা দেবে।"

আবার ফোন বেজে উঠল। সেল-ফোন। পকেট থেকে বার করে ভাদুড়িমশাই বললেন, "ইয়েস?...হ্যাঁ, অমিতাভ ফোন করেছিল।...কী বললে? ট্রেস করতে পেরেছ?... এক্সেলেন্ট! এক কাজ করো। অমিতাভ এখানে। তুমিও যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো।"

।। ১০ ।।

অমু ঠিক ছ'টাতেই চলে এসেছিল। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, সে বেশ উদ্বিগ্ন।

সুরিন্দর এল ছ'টা বাজার একটু পরে। তাঁর সঙ্গে যিনি এলেন, তাঁকে চিনলুম না। মুখ দেখে মনে হল, সুরিন্দরের ইনি সমবয়সী, তার মানে এঁর বয়েস সম্ভবত বছর পঁয়ত্রিশের মধ্যেই হবে। সেইসঙ্গে মাথার পাগড়ি, পাকানো গোঁফ, ফেট্টিতে জড়ানো চাপদাড়ি আর হাতের বালা দেখে বোঝা গেল যে, ইনি শিখ। তবে এর আগে এঁকে কখনও দেখিনি।

ভাদুড়িমশাই অবশ্য এঁকে দেখবামাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে, ভদ্রলোকের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে বললেন, "আরে, অমৃক! এসো, এসো!"

নাম শুনে বুঝলুম, ইনি অমৃক সিং। দিল্লি পুলিশের এই তরুণ অফিসারটির কথা ভাদুড়িমশাইয়ের কাছে এর আগেও আমরা শুনেছি। এখন আমাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দেবার সময় তিনি এটাও জানালেন যে, কলকাতার শোভন চৌধুরি আর দিল্লির অমৃক সিং আসলে একই বছরের আই.পি.এস., ব্যাচমেট হিসেবে পরস্পরের এঁরা বন্ধুস্থানীয়, তা ছাড়া যে যাঁর ক্যাডারে কাজে যোগ দেবার আগে মুসৌরির লালবাহাদুর ইনস্টিট্যুটে একই সঙ্গে ট্রেনিং পেয়েছিলেন। দু'জনের বন্ধুত্ব সেই তখন থেকে।

কথাবার্তা আর এগোবার আগে অমু বলল, "এখানে তো চেয়ার মাত্র তিনটে, বসতে অসুবিধে হবে; চলুন, আমাদের কনফারেন্স-রুমে যাওয়া যাক।"

কনফারেন্স-রুম গেস্ট হাউসের এই তলারই এক প্রান্তে। ভাদুড়িমশাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা সেখানে চলে এলুম। ঘরটা খুব বড় না-হলেও, একটা গোল

টেবিল ঘিরে খান আস্টেক গদি-আঁটা চেয়ার ছাড়াও দেওয়াল ঘেঁষে লম্বালম্বি সোফার ব্যবস্থা রয়েছে দেখলুম। চেয়ারগুলোতে মুখোমুখি বসে পড়া গেল। সবাই ঠিকমতো বসেছে দেখে নিয়ে অমু বলল, "কিচেনে আমি চা-কফির কথা বলে রেখেছি। সাড়ে ছ'টায় ওরা চা-কফি দিয়ে যাবে। আপনারা কথা বলুন, আমার তো আর নতুন করে কিছু বলার নেই, আমি বরং যাই।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "সে কী, তোমার তো থাকা দরকার, কোথায় যাবার কথা ভাবছ?"

"বাড়ি যাব। আজ আবার ফোন করে ওই যে হুমকি দিল, তার পর থেকেই সুলেখা বড্ড অস্থির হয়ে আছে।"

অমৃক সিং বললেন, "ঘোষ-সাহাব, আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেনো?"

"ঘাবড়ে যাব না?" অমু বলল, "যতক্ষণ বাইরে থাকি, ভয়ে-ভয়ে থাকি। ভয় আমার নিজের জন্যে নয়, ফর মাই ওয়াইফ অ্যান্ড দ্যাট ইনোসেন্ট চাইল্ড।"

"তাদের কুছু হোবে না।" অমৃক সিং বললেন, "ফোনের কথা আমি জানি। আপনার ফ্ল্যাটে অ্যাডিকুয়েট সিকিওরিটির বন্দ্‌বস্ত্‌ করে তব্ না আমি আসছি ইখানে? প্লিজ ডোন্ট গেট নার্ভাস।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তুমি একটু থেকে যাও, অমু। যা বুঝতে পারছি, অমৃক যখন এসেই গেছে, তখন একটা প্ল্যান অব অ্যাকশন ছকে নেওয়া ভাল। তবে কিনা, জাল-সিরিঞ্জের যারা কারবারি, আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে যখন তোমাকেই তারা বেছে নিয়েছে, তখন পাল্টা-ব্যবস্থা হিসেবে যা-ই আমরা ঠিক করি না কেন, সেটা তোমাকে জানানো দরকার। আর হ্যাঁ, তাতে তোমার সম্মতিও থাকা দরকার।"

অমৃক সিং বললেন, "আমরা যা করব বলে ভাবছি, আপনারা পারমিশান দিলে সেটা আমি বলব।"

"নিশ্চয়ই বলবে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিন্তু তার আগে সুরিন্দরের কথাটা শুনি। সুরিন্দর, অমুর বাড়িতে ফোন করে যে-লোকটা ভয় দেখাচ্ছে, সে কোথা থেকে ফেন করছে, সেটা তো তুমি ট্রেস করতে পেরেছ, তা-ই না?"

সুরিন্দর কথা বলতে গিয়েও বলল না, কেন না, মস্ত দুটো ট্রে'র উপরে চা আর কফির সরঞ্জাম নিয়ে দুটি বেয়ারা ঠিক সেই মুহূর্তেই কনফারেন্স রুমে এসে ঢুকল। টেবিলের উপরে পট, পেয়ালা ও পিরিচ সাজিয়ে তারা সম্ভবত জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল যে, আমাদের মধ্যে কে চা খাবেন আর কে কফি। কিন্তু তারা মুখ খুলবার আগেই অমু বলল, "তোমরা যেতে পারো, চা আর কফি আমরা নিজেরাই ঢেলে নেব। এখন আর তোমাদের কোনও দরকার নেই।"

বেয়ারা দুটি আর দাঁড়াল না, মৃদু গলায় 'জি সাব' বলে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে

গেল।

সুরিন্দরের দিকে তাকিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "নাও, কী বলছিলে বলো। কল্‌টা কোত্থেকে করেছে?"

"যে-নাম্বার থেকে করেছে, সেটা কোনও প্রাইভেট লাইনের নয়।" সুরিন্দর বলল, "সেটা একটা পাবলিক বুথের নাম্বার। অ্যান্ড দ্য বুথ ইজ ইন দ্য সেম এরিয়া।"

"কোন্‌ এরিয়া?"

"ওখ্‌লা।"

শুনে, হঠাৎই পাল্‌টে গেল ভাদুড়িমশাইয়ের মুখচোখের চেহারা। সেইসঙ্গে কণ্ঠস্বরও। আমি দেখলুম, এতক্ষণ যিনি স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলছিলেন, তাঁর ভিতর থেকে যেন অন্য-একটা মানুষ বেরিয়ে এসেছে। সরু চোখে সুরিন্দরের দিকে তাকিয়ে, চাপা কিন্তু ভীষণ রকমের কঠিন গলায় তিনি বললেন, "বুথটার নাম্বার যখন জেনেছ, তখন সেটা ওখ্‌লার কোন্‌ রাস্তার কত নম্বর বাড়িতে, সেটা জানাও তো শক্ত নয়।...কী সুরিন্দর, জেনে নিয়েছ?"

"ইয়েস, বস্‌।"

"ওটা নিশ্চয় ধাবাটার খুব কাছেই?"

"আপনি কোন্‌ ধাবার কথা বলেছেন, মামাবাবু?" অমিতাভ বলল, "যার পাশের পার্কিং লটে সেই ট্রাকটা রয়েছে? মানে সেদিন বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কের কাছে রিজের রাস্তায় যে-ট্রাকটা আমার টাটা সুমোকে ধাক্কা মেরেছিল?"

ভাদুড়িমশাই সুরিন্দরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। সেদিক থেকে মুখ না-ফিরিয়ে অমুর প্রশ্নের জবাবে বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর সুরিন্দরকে বললেন, "কী, টেলিফোন-বুথটা সেই ধাবার খুব কাছেই তো?"

সুরিন্দর বলল, "হাঁ, কিন্তু আপনি সেটা কী করে জানলেন?"

কথাটার উত্তর না দিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "কত কাছে?"

"একদম কাছে। ইন ফ্যাক্ট, ধাবাটার এক সাইডে তো ওই পার্কিং লট, আর অন্য সাইডে এই বুথ।"

সুরিন্দর বেদীর ডাইনে বসে আছেন অমৃক সিং। এবারে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "তোমার প্ল্যানটা কী অমৃক?"

অমৃক সিং মৃদু হেসে বললেন, "প্ল্যান কুছু ঠিক করি নাই। সেইটা আপনার অ্যাডভাইস নিয়ে তারপর ঠিক করব। আমার চিফ্‌ও সেইটাই চান। দ্যাট্‌'স হোয়াই আই হ্যাভ কাম টু ইউ।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ঠিক আছে। কিন্তু তুমি তো এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছ। কী মনে হয় তোমার?"

"হাঁ, আমি ধেয়ান দিয়েছি।" অমৃক বললেন, "তো আমি ভাবলাম যে, দুটা

কাজ তো করাই যায়। ট্রাক-ড্রাইভারকে আমি ওয়াচে রেখেছি, সে ইখানেই আছে। অওর, ট্রাকটা জলন্ধরে রেজিস্টার্ড হলেও ট্রাকের যে ওনার, সে দিল্লির লোক। তা অ্যাকসিডেন্ট করল, কিন্তু পুলিশকে সেটা জানাল না, তার উপরে আবার ফল্‌স নাম্বার-প্লেট লাগিয়েছিল, সির্ফ এইজন্যেই আমি ওদের দুজনকে অ্যারেস্ট করতে পারি। কিন্তু করছি না।"

"কেন করছ না?'

"ফর টু রিজন্‌স। রিজ্‌ন নাম্বার ওয়ান, জাল ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জের এগেন্‌স্টে দিল্লিতে যে অ্যাড-ক্যাম্পেন চলছে, সেটাকে যারা রুখে দিতে চায়, সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স থেকে বুঝতে পারছি যে, গুরমিত্‌ সোঁধি ইজ ওয়ান অব দেম।"

"হু ইজ দিস গুরমিত্‌? আর হ্যাঁ, তার এগেন্‌স্টে এভিডেন্সটাই বা কী?"

হাসিটাকে ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে অমৃক বললেন, "গুরমিতই ওই ট্রাকের ওনার।"

আর ব্যাখ্যার দরকার ছিল না। ভাদুড়িমশাই বললেন, "বুঝেছি। তারই ট্রাক যে অমুর টাটা সুমোকে ধাক্কা মেরেছিল, এটাই তোমরা ব্যবহার করবে এভিডেন্স হিসেবে, কেমন?"

"সেটা ডিফিকাল্ট হোবে না, মিস্টার ভাদুড়ি।" অমৃক বললেন, "অ্যাড-ক্যাম্পেনটা একটা মালটি-ন্যাশনাল কম্প্যানির নামে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ক্যাম্পেনের পিছনে যে আছে ঘোষ-সাহাবের ব্রেন, সেটা সবাই জানে। কেসটা আদালতে উঠলে সেটাই আমরা বলব। উই শ্যাল অলসো সে দ্যাট কুছু লোকের ইললিগ্যাল বিজনেস এই ক্যাম্পেনের জন্যে সাফার করছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াই দে ট্রায়েড টু কিল মিস্টার ঘোষ অন দ্যাট নাইট বাই স্টেজিং আ ফেক্‌ অ্যাকসিডেন্ট।"

"কিন্তু সোঁধির বিজনেস যে এই ক্যাম্পেনের ফলে সাফার করছে, সেটা প্রুভ করবে কী করে? প্রুভ করতে হলে তোমাকে দেখাতে হবে যে, সে ইউজ্‌ড সিরিঞ্জকেই ফের নতুন মোড়কে মুড়ে বাজারে ছাড়ছে। সেটা দেখাতে পারবে তো?"

"পারব, মিস্টার ভাদুড়ি।" অমৃক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন "কিন্তু কী করে পারব, সেটা এখন জানতে চাইবেন না, প্লিজ।" একটু থেমে আবার বললেন, "গুরমিত্‌কে আমরা আজই অ্যারেস্ট করতে পারি। কিন্তু করছি না। আর দু-একটা এভিডেন্সের জন্যে ওয়েট করছি। সেটা পেয়ে গেলেই ওর ডেরায় গিয়ে হানা দেব।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ওয়েট করার সেটা তো একটা কারণ। অন্য কারণও আছে নাকি?"

"অন্য কারণটা তো আপনি।" অমৃক সিংয়ের গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ল। হেসে বললেন, "মিস্টার ভাদুড়ি, কলকাতা থেকে শোভন আমাকে ফোন করেছিল।

সে বলল, আপনি বিশোয়াস করেন যে, জাল সিরিঞ্জ আর জাল কারেন্সি নোট, এ দুটার মধ্যে একটা লিঙ্ক আছে।"

"শুধু এ-দুটো কেন, লিঙ্ক আছে আরও অনেক-কিছুর মধ্যেই।"

"যেমন?"

"তাও বলে দিতে হবে?" ভাদুড়িমশাই বললেন, "এই যে এখানে-ওখানে এত বোমা ফাটানো হচ্ছে, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘরবাড়ি, রেলের লাইন উপড়ে ফেলা হচ্ছে, এখানে-ওখানে পাওয়া যাচ্ছে এত এত আর.ডি. এক্স, এই যে এত নিরীহ লোক মেরে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, কী ভাবো তোমরা, এর মধ্যে কোনও যোগসম্পর্ক নেই? আছে। ঠিক যেমন আছে এই জাল-সিরিঞ্জ আর জাল-নোটের মধ্যে। এর কোনওটাই বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, সবই ইন্টারলিঙ্কড। আবার কোনওটা ঘটাচ্ছে এ-দেশেরই এমন-কিছু লোক, টাকার লোভে যারা নিজের মাকেও বেচে দিতে পারে। আর এই সবকিছুর উদ্দেশ্য তো একটাই।"

"সেটা কী?"

"মানুষ মেরে, আতঙ্ক ছড়িয়ে, সন্দেহের আগুনে বাতাস লাগিয়ে দেশটাকে ডিস্টেবিলাইজ করে দেওয়া।..... অমৃক, জাল-টাকা ছড়ানো আর জাল-সিরিঞ্জ দিয়ে অসুখ ছড়ানো, তুমি ভাবছ এ-দুটো আলাদা-আলাদা ক্রাইম। কিন্তু, কাজ আলাদা হলেও এদের উদ্দেশ্য সেই একই—ডিস্টেবিলাইজেশন।"

"শোভনও তা-ই বলছিল।" অমৃক সিং বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলে তারও এই একই বিশোয়াস হয়েছে। আর সেইজন্যেই সে চায় যে, দিল্লি আর কলকাতা, দুটো জায়গায় একইসঙ্গে অচানক রেইড করা দরকার। যাতে এক জায়গায় রেইড হলে অন্য জায়গার লোক সেটার খবর পেয়ে সরে পড়তে না পারে। তা, শোভন ইজ রেডি উইথ হিজ টিম। আর এখোন আপনাকে বলতে পারি, রেডি আছি আমরাও।"

"রেইড কবে হবে?"

"কবে হবে, কখন হবে, শোভনের সঙ্গে কথা বলে সেটা আমি ঠিক করে নিয়েছি। তবে সেটা আমি সির্ফ আপনাকে বলব।" অমৃক সিং চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, "চোলেন মিস্টার ভাদুড়ি, আপনার ঘরে যাই। তবে যাবার আগে ঘোষ সাহাবকে অ্যাসিওর করে যাচ্ছি, ইট উইল বি আ স্মুদ অপারেশন, তাঁর ঘাবড়াবার কুছু নাই।"

ভাদুড়িমশাইকে সঙ্গে নিয়ে কনফারেন্স-রুম থেকে অমৃক সিং বেরিয়ে গেলেন।

॥ ১১ ॥

১৫ মার্চ, বুধবার। সদানন্দবাবুকে যাঁরা চেনেন, তাঁদের খুব ভাল করেই জানা আছে যে, ভদ্রলোকের প্রাতঃভ্রমণে বড়-একটা ছেদ কখনও পড়ে না। সব ঋতুতে ও সর্বরকমের বাধাবিপত্তির মধ্যেও মর্নিং-ওয়াক তাঁর করাই চাই। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই তিনি শয্যাত্যাগ করেন, তারপর চোখমুখ ধুয়ে ও এককাপ চা সেবন করে, হাতে একটা কুকুর-তাড়ানো খেটে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। কলকাতায় থাকলে গোলদিঘিতে গিয়ে গুনে-গুনে নটি পাক দেন, কেননা তাতে নাকি ঠিক তিন মাইল হাঁটা হয়। বাইরে গেলে ঘড়ি ধরে হাঁটেন ঠিক এক ঘণ্টা। ভদ্রলোকের ধারণা, তাতেও হাঁটা হয় ওই তিন মাইলই।

কিন্তু আমার হাতঘড়িতে এখন যদিও আটটা বাজে, সদানন্দবাবু আজ এখনও বিছানা থেকে ওঠেননি। তাঁর বাঁ চোখের ভুরুর আধ ইঞ্চি উপরে একটা আর ডান গালের হনুর খানিক নীচে আর একটা ব্যাণ্ড-এড লাগানো। তিনি যে তাঁর প্রাতঃকালীন চা এখনও খাননি, তা অবশ্য নয়, কিচেনে ফোন করে চা আনিয়ে নিয়ে, বিছানায় সেই চা সেবন করে, বিছানাতেই তিনি শুয়ে আছেন। কথাও বলছেন চিঁচিঁ করে। ভদ্রলোকের শরীর ও মন দুয়ের উপর দিয়েই কাল যা ধকল গেছে, তাতে মনে হয় আজ আর তিনি বিছানা ছেড়ে উঠবেন না।

শরীর ও মন যে আমারই খুব ভাল, তাও বলতে পারছি না। সদানন্দবাবুর মুখের উপরে দু'দুটো ব্যান্ড-এড, আর আমার ব্যান্ড-এড দুই হাঁটুতে। তাড়া খেয়ে দৌড়তে গিয়ে রাস্তার উপরে পড়ে গেসলুম, হাঁটু দুটো তার ফলে ছড়ে যায়, গেস্ট হাউসে ফিরে একটা লোশন দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে সেখানে ব্যান্ড-এড লাগিয়েছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভোগাবে। হাঁটতে গেলে হাঁটুতে টান পড়ে কষ্ট হয়। তবু তারই মধ্যে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বাথরুমে গিয়ে মুখচোখ ধুয়েছি, দাড়ি কামিয়েছি, একটু আগে বারান্দা থেকে একটু ঘুরেও এলুম। সেই সময়ে ভাদুড়িমশাইয়ের ঘরেও একবার উঁকি মারি। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছি দেখে তিনি বললেন, "এই অবস্থায় আর কষ্ট করে একতলার ডাইনিং হলে যাবার দরকার নেই, কিচেনে ফোন করে বলে দিন যে, ব্রেকফাস্ট যেন আপনাদের ঘরে দিয়ে যায়, আমাকেও তখন আপনাদের ঘরে ডেকে নেবেন।" কথা শুনে চলে আসছি, তখন ফের পিছন থেকে ডেকে বললেন, "রাস্তায় পড়ে গিয়ে কেটেছে, একটা অ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকশন নিলে ভাল হয়। চলুন, কাছেই একটা ডাক্তারখানা রয়েছে, ব্রেকফাস্টের পর সেখানে গিয়ে ওটা নিয়ে নেবেন।.......কিন্তু একটা কথা বলুন দিকি। আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে আপনারা ওভাবে দৌড়তে গেলেন কেন?"

কেন যে দৌড় লাগিয়েছিলুম, সে আমি খুব ভালই জানি। রাস্তার সমস্ত আলো

যদি হঠাৎই একসঙ্গে নিভে যায়, আর দুমদাম এ-দিকে ও-দিকে বোমা ফাটে গোটাকয়েক, আর তারই মধ্যে কেউ বিকট গলায় চেঁচিয়ে ওঠে 'মারো শালেকো', তা হলে দৌড় না-লাগিয়ে উপায় থাকে? আবার বলি, দৌড় লাগাবার কারণটা আমি খুব ভালই জানি। শুধু জানি না যে, ভাদুড়িমশাই বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও কাল রাত্তিরে আমি আর সদানন্দবাবু তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলুম কেন। ভাদুড়িমশাই আর সুরিন্দরকে নিয়ে দিল্লি পুলিশের দুই অফিসার অমৃক সিং আর শেখর চৌহান যে ওখ্‌লার সেই ধাবায় গিয়ে হানা দেবেন, পরশু বিকেলে তা জানা সত্ত্বেও কাল দুপুর পর্যন্ত ভাদুড়িমশাই আমাদের ঘুণাক্ষরেও জানাননি যে, ব্যাপারটা কাল রাত্তিরেই ঘটবে। সেটা জানলুম কাল ডাইনিং হলে দুপুরের খাওয়া শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর। তাও যে তিনি নিজের থেকে জানালেন, তা নয়, ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় বেয়ারাটি এসে জিজ্ঞেস করে যে, রাতে আমরা কী খাব। তাতে ভাদুড়িমশাই বলেন, রোজ রাত্তিরে যা খাচ্ছি, তা-ই খাব, তবে তিনটের বদলে মিল হবে দুটো। শুনে আমি বলি, "দুটো কেন? আপনার কি কোথাও নেমন্তন্ন আছে নাকি?" ভাদুড়িমশাই সঙ্গে-সঙ্গে কোনও উত্তর দিলেন না। বললেন, "চলুন, উপরে যাওয়া যাক।"

শুনে আমার সন্দেহ হয় যে, একটা কোনও ব্যাপার তিনি গোপন করে যাচ্ছেন। সন্দেহ অবশ্য পরশু রাত্তির থেকেই হচ্ছিল। প্রথমত, অমৃক সিং সেই যে কনফারেন্স-রুম থেকে তাঁকে নিয়ে গোপনে কী সব কথা বলতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর থেকেই দেখছিলুম যে, ভাদুড়িমশাই আমাদের যেন একটু এড়িয়ে-এড়িয়ে চলছেন। অমৃক সিং তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে, গেস্ট হাউস ছেড়ে চলে যাবার পরেও তিনি দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যেই বসে রইলেন। রাত দশটা নাগাদ তাঁর ঘরের দরজায় টোকা মেরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, খাবার জন্যে সবাই এবারে নীচে নামব কি না। তাতে তিনি দরজা না-খুলে ভিতর থেকেই বলেন যে, আমরা যেন খেয়ে নিই, তাঁর খাবার তিনি ঘরেই আনিয়ে নেবেন। রাত বারোটা নাগাদ সদানন্দবাবু একবার ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর দরজার পাল্লায় কান রেখেছিলেন। ফিরে এসে বললেন, "ঘুমোননি। মনে হল যেন কারও সঙ্গে কথা বলছেন। অথচ ঘরে তো উনি একা!" আমি বললুম, "তা হলে নিশ্চয় টেলিফোনে কথা বলছেন। কিছু বুঝতে পারা গেল?" তাতে সদানন্দবাবু হতাশ ভঙ্গিতে ঠোঁট উলটে দু'দিকে মাথা নাড়লেন মাত্র। মানে, কিছুই বোঝা যায়নি।

এ-সব পরশু রাত্তিরের ব্যাপার। কাল সকালেও সেই একই অবস্থা। অমৃক সিংয়ের সঙ্গে তাঁর কী নিয়ে কথা হল, জানার জন্য ছটফট করছি। অথচ তিনি মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। কাল অত রাত্তিরেই বা কার সঙ্গে কথা বলছিলেন? না, তাও জানার কোনও উপায় নেই। ভাদুড়িমশাই একেবারে স্পিকটি নট। যা-ই জিজ্ঞেস করি, তিনি এড়িয়ে যান। অথচ, তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায় যে,

কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত। মাঝে-মাঝেই চোখ দুটো ভীষণ সরু হয়ে যায়, একদৃষ্টিতে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু কিছুই বলেন না। এমনকী, জাল সিরিঞ্জ নিয়েও না, জাল-নোট নিয়েও না। তারই মধ্যে কখনও-কখনও নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন, দরজার পাল্লায় কান রেখে বুঝতে পারি, আবার তিনি ফোন তুলে কারও সঙ্গে কথা বলছেন।

কাল দুপুরের খাওয়ার পর আর পারলুম না। পরশু থেকেই জানার চেষ্টা করে যাচ্ছি যে, কী হয়েছে, হঠাৎ তিনি এমন নিশ্চুপ হয়ে গেছেন কেন। কিন্তু তা-ই নিয়ে কোনও চাপাচাপি এ-পর্যন্ত করিনি। কিন্তু এবারে উপরে উঠে এসেই চেপে ধরলুম ভাদুড়িমশাইকে। বললুম, "রাত্তিরে এখানে খাবেন না কেন? বলুন কী হয়েছে। না-বললে ছাড়ছি না।"

সত্যিই যে ছাড়ব না, ভাদুড়িমশাই সেটা বুঝতে পেরে গেসলেন। বললেন, "রাত্তিরে এখানে খাব না, তার কারণ, সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আমি এই গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে যাব।"

"কখন ফিরবেন?"

"ঠিক নেই।"

"কোথায় যাবেন?"

"সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে এখানে একটা গাড়ি আসবে। সেই গাড়িটা নিয়ে আমি সুরিন্দরের বাড়িতে যাব। তাকে তুলে আর-এক জায়গায় যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"তাও জানতে চান?" ভাদুড়িমশাই সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। এতই যখন জানার ইচ্ছে, তখন সবই বলছি। কিন্তু একটা অনুরোধ আছে।"

বললুম, "অনুরোধটা পরে শুনব। আগে বলুন, সুরিন্দরকে নিয়ে আপনি কোথায় যাবেন।"

"ওখ্‌লায়।"

শুনে চমকে উঠে বললুম, "তার মানে?"

"মানে তো খুবই সোজা। অমৃক সিং একটা গ্রিন সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেটা এসে গেছে। তাই আর দেরি করা ঠিক হবে না, আজ রাত্তিরেই রেইড হবে।......বাই দ্য ওয়ে, রেইড সিমালটেনিয়াসলি দু'জায়গায় হচ্ছে।"

আমি সেই একই প্রশ্নের পুনরুক্তি করলুম। "তার মানে?"

"মানে অমৃক সিং হানা দিচ্ছে ওখ্‌লার ধাবায়। তার টিমের সঙ্গে আমি আর সুরিন্দরও থাকছি। আর সেই একই সময়ে...একেবারে কাঁটায় কাঁটায় একই সময়ে..."

ভাদুড়িমশাই কথাটা শেষ না করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমার বুকের মধ্যে একটা শব্দ হচ্ছিল। উত্তেজনা চেপে রেখে বললুম,

"একেবারে একই সময়ে কী হবে?"

"একেবারে একই সময়ে কলকাতায় শোভন চৌধুরি তার টিম নিয়ে খিদিরপুর ডক-এলাকায় একটা বাড়িতে হানা দেবে।" ভাদুড়িমশাই একটু থেমে যোগ করলেন, "জাল-নোটের পান্ডাদের এই ডেরার হদিশটা ন্যাটা কালুর কাছ থেকে পাওয়া গেছে।"

সদানন্দবাবু বললেন, "বলেন কী!"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "ঠিকই বলছি। শোভনের সঙ্গে কাল রাত্তিরে তো বটেই, আজ সকালেও ফোনে কথা হয়েছে আমার। ন্যাটা কালু যা-কিছু জানে, সব বলেছে। কে তাকে রিক্রুট করে কার কাছে নিয়ে গিয়েছিল, কে তাকে জাল-নোট দিয়ে যেত, সব। ডক এরিয়ার ওই বাড়িতেই আটকে রাখা হয়েছিল তাকে। ওখান থেকেই হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে, একটা গাড়িতে করে তাকে বাইপাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার পরের কথা আপনারা জানেন।"

"মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল, তা জানি।" আমি বললুম, "মারা যায়নি, তাও আপনার কাছে শুনেছি। তবে জাল-নোটের পান্ডাদের ডেরার হদিশ যে তার কাছে পাওয়া গেছে, তা জানতুম না। পুলিশ যে আজই সেখানে হানা দেবে, তাও এই প্রথম শুনলুম।"

"এটাও শুনলেন যে, রেইড হবে একই সময়ে।" ভাদুড়িমশাই বললেন, "এখানে ওখ্‌লায় আর কলকাতায় খিদিরপুরে। এখন একটা অনুরোধ আছে।"

"বলুন।"

"ওখ্‌লায় রেইডের সময় আমি আর সুরিন্দর এদের সঙ্গে থাকব। সেটা যেমন আমি চাইছি, তেমন অমৃক সিংও চাইছে। এখন আমার অনুরোধ এই যে, দয়া করে আপনারা আমার সঙ্গে যেতে চাইবেন না।"

অনুরোধটা যে এইরকমই হবে, তা আমি আঁচ করতে পেরেছিলুম। সে-ক্ষেত্রে সদানন্দবাবুর প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা জানা না-থাকলেও আমি কী বলব, তাও জানতুম আমি। বললুম, "তা কী করে হয়? না মশাই, আই ওন্ট চিকেন আউট।" বলেই সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললুম, "আপনি?"

আমি যে ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে যেতে চাই, সদানন্দবাবু তা বুঝতে পারেননি বলে আমার মনে হয় না, তবু তিনি যা করতে চান, সম্ভবত সেটা জানাবার আগে ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কারভাবে বুঝে নেবার জন্যে যে প্রশ্নটা ভদ্রলোক করলেন, অত উত্তেজনার মধ্যেও তাতে আমার হাসি পেয়ে গেল। সদানন্দবাবু বললেন, "ওই যে 'চিকেন আউট' বলে একটা কথা বললেন, ওটার মানে কী?"

উত্তরটা আমার বদলে ভাদুড়িমশাই-ই দিলেন। বললেন, "ওর মানে ভয় পেয়ে পালানো।"

ব্যাস্‌, বারুদে এই অগ্নিসংযোগটুকুরই দরকার ছিল। একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে বদলে

গেল সদানন্দবাবুর চেহারা। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভেবেছেন কী, অ্যাঁ? আপনি পালাবেন না, আর আমি ভয় পেয়ে পালাব? কভি নেহি। আমিও যাব। তাতে যা হয় হোক।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "হতে কিন্তু অনেক-কিছুই পারে।"

তাতে আমি বললুম, "জানি।" আর সদানন্দবাবু বললেন, "হলে হবে। কিন্তু আমি যাবই।"

তারপরেও ভাদুড়িমশাই আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। শেষে যখন দেখলেন যে, তাঁর সঙ্গ ছাড়তে আমরা রাজি নই, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, না-গিয়ে যখন ছাড়বেনই না, তখন আমি অমুককে বলে আপনাদের জন্যে পারমিশান আনিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা, অপারেশন যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ একেবারে চুপ করে আপনারা গাড়ির মধ্যে বসে থাকবেন, ভুল করেও যেন গাড়ির থেকে নামবেন না। কথাটা মনে থাকবে তো?"

বললুম, "থাকবে, নিশ্চয় থাকবে।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "তা হলে তৈরি থাকবেন। গাড়ি আসবে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। আপনারা বরং সাতটার মিনিট পাঁচেক আগেই আমার ঘরে চলে আসুন।"

গতকাল এর পরবর্তী পর্যায়ে যা-যা ঘটেছিল, তার পুরো বর্ণনা দেওয়া আমার কিংবা সদানন্দবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। তার কারণ পুরো ব্যাপারটা আমাদের চোখের সামনে ঘটেনি। আমি আর সদানন্দবাবু যেটুকু দেখেছি, তার কথাতে একটু পরে আসব। তার আগে বলে রাখি, ভাদুড়িমশাই ওই যে আমাদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন যে, ওখ্‌লায় যতক্ষণ অপারেশন চলবে, ততক্ষণ আমরা গাড়ির মধ্যেই বসে থাকব, কিছুতেই গাড়ি থেকে নামব না, সেই কথাটা আমরা শেষ পর্যন্ত রাখতে পারিনি। অ্যাকশন শুরু হবার খানিক বাদে হঠাৎ বোমা পড়তে আরম্ভ করে। নার্ভাস হয়ে গিয়ে আমরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে দৌড় লাগাই। তার ফল হয়েছে এই যে, আমরা কেউই মারাত্মকভাবে জখম হইনি ঠিকই, তবে বোমার দুটো ছোট্ট স্প্লিনটার লেগে সদানন্দবাবুর মুখের দু'জায়গায় সামান্য কেটে গেছে আর অন্ধকার রাস্তায় হোঁচট খেয়ে ছড়ে গেছে আমার হাঁটু দুটো। তাই, বেশ বেলা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আর্লি রাইজার সদানন্দবাবু আজ এখনও শয্যাত্যাগ করেননি আর আমাকে একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দু'জনের দুর্দশার কথা তো এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বলেছি, এবারে কাল রাত্তিরে যেটুকু যা দেখেছি, সেই কথায় আসা যাক।

*　　　　*　　　　*

গাড়ি একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় সাতটাতেই এল। নীচের পার্কিং স্পেসে গাড়ি রেখে, রিসেপশন থেকে অনুমতি নিয়ে, ড্রাইভারটি উপরে উঠে এসেছিল,

ভাদুড়িমশাইয়ের ঘরে ঢুকে বলল, ঘোষ-সাহাব তাকে পাঠিয়েছেন।

ভাদুড়িমশাই বললেন, "পুলিশ-পারমিট করিয়ে এনেছ তো? ওটা না-থাকলে কিন্তু যেখানে যাচ্ছি, সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে দেবে না।"

"হাঁ সাব," ড্রাইভারটি হেসে বলল, "পারমিট নিয়ে এসেছি।"

"তা হলে নীচে গিয়ে একটু বোসো।" পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে ড্রাইভারের হাতে দু'খানা দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, "কাছেই একটা খাবারের দোকান আছে, পারলে কিছু খেয়ে নাও, আমরা সাড়ে সাতটায় রওনা হব।"

ড্রাইভারটি একটা সেলাম ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আমি বললুম, "ওর নামটা জেনে রাখা হল না।"

"ওর নাম মোহন সিং।" ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, "কোটের বুকপকেটের বর্ডারে নাম-লেখা একটা স্ট্রিপ আঁটা রয়েছে, আপনি দেখেননি।"

রাত্তিরে যে পেটে কিছু নাও পড়তে পারে, তা জানাই ছিল। বিকেল ছ'টায় যখন চা দেয়, কিচেন থেকে তখনই তাই আরও কিছু খাবার আনিয়ে নিই। নীচে নামি ঠিক সাড়ে সাতটায়। সুরিন্দরের বাড়ি প্যাটেল-নগরে। যাব তো শেষ পর্যন্ত ওখ্‌লায়। তা হলে প্যাটেল-নগর হয়ে সেখানে যাচ্ছি কেন? এটা তো ঘুর-পথ হল। ভাল হত যদি সুরিন্দরকেই সফদরজঙ্গে চলে আসতে বলতেন ভাদুড়িমশাই। কিন্তু তা তিনি বলেননি। কেন বলেননি, তা জানি না। হয়তো তিনি আশঙ্কা করছেন যে, আমাদের গতিবিধির উপরে নজর রাখা হচ্ছে। যারা নজর রাখছে, এটা কি তাদের ধোঁকা দেবার জন্যে? কিছু জানি না। জানার কোনও উপায়ও নেই। গাড়িতে ওঠার আগে ভাদুড়িমশাই এটাও আমাদের দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছেন যে, পথে আমরা কোনও প্রশ্ন করব না।

প্যাটেল-নগরে পৌঁছতে-পৌঁছতে সাড়ে আটটা বাজল। শুনেছিলুম, সুরিন্দর এখানে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলায় পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। একটা ফ্ল্যাটে তার সংসার, অন্যটায় তার আপিস। চারু ভাদুড়ি ইনভেস্টিগেশানসের দিল্লি ব্রাঞ্চের কাজকর্ম চলে সেখান থেকেই। সুরিন্দরই তার চার্জে রয়েছে। কিন্তু মোহন যে-বাড়িটার সামনে তার গাড়ি থামাল, সেটা আদৌ কোনও ফ্ল্যাট-বাড়ি নয়। স্রেফ একতলা একটা বিশাল দোকান-ঘর। দোকানের সামনে লোহার শাটার ফেলা, তবে সাইনবোর্ড থেকে বোঝা যায় যে, এখানে মোটরগাড়ির স্পেয়ার-পার্টস বিক্রি করা হয়। দোকান-ঘরের পাশে একটা সরু অন্ধকার প্যাসেজ। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে গাড়ি থেকে নেমে ভাদুড়িমশাই সেই প্যাসেজের মধ্যে ঢুকে গেলেন। মিনিট পাঁচেক বাদে দেখলুম, সুরিন্দরকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে আসছেন। দু'জনের হাতে দুটো ঝোলা। ভাদুড়িমশাই বসে ছিলেন ড্রাইভারের বাঁ পাশের সিটে। সামনের দরজা দিয়ে তিনি সেখানেই ফের উঠে পড়লেন। সুরিন্দর উঠলেন পিছনের দরজা

দিয়ে। পিছনের সিটে আমাদের পাশে বসে ঝোলা থেকে দুটো প্যাকেট বার করে আমাদের দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "জাস্ট সাম স্ন্যাক্‌স। ভুখ লাগলে খেয়ে নিবেন।"

ঝোলার মধ্যে আর কী আছে, তা আমরা জিজ্ঞেস করলুম না। এ-সব কথা যত কম জিজ্ঞেস করা যায়, ততই ভাল। গাড়ি আবার ছুটল। আমি আর সদানন্দবাবু একেবারে নিঃশব্দে বসে রইলুম।

ওখ্‌লায় যখন পৌঁছলুম, আমার রেডিয়াম-লাগানো হাতঘড়িতে তখন দশটা বেজে গেছে। যাঁর নির্দেশে গাড়ি থামাতে হল, প্লেন ড্রেসে থাকায় তাঁর পরিচয় জানার উপায় নেই, তবে কথা বলার ধরন দেখে আন্দাজ করলুম যে, খুব উঁচু দরের না-হলেও ইনি পুলিশের একজন ছোটখাটো অফিসারই হবেন। পেন্সিল-টর্চ ফেলে গাড়ির ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে মোহন সিংকে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, আর না-এগিয়ে গাড়িটা যেন এখানেই সে রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখে। তারপর ভাদুড়িমশাইকে বললেন, "আপনি আর সুরিন্দর বেদী নেমে আসুন, আপনাদের আমি মিস্টার সিংয়ের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। অন্যেরা জানলার কাচ তুলে দিয়ে গাড়ির মধ্যেই বসে থাকুন, অপারেশন শেষ হলে আমরা জানাব, তার আগে ওঁরা যেন গাড়ি থেকে না নামেন। আন্ডার নো সার্কাম্‌স্টান্সেস।"

ভাদুড়িমশাই যেন তৈরি হয়েই ছিলেন, সুরিন্দরকে নিয়ে তিনি গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। লক্ষ করলুম, তাঁরা দুজনেই নামলেন একেবারে খালি হাতে, তাঁদের ঝোলা দুটি গাড়িতেই পড়ে রইল। তবে, নামার আগে সুরিন্দর তার ঝোলা থেকে যে-বস্তুটি বার করে কোমরের বেল্টে গুঁজে নিয়েছে, সেটা আমি চিনি। একটা রিভলভার। ধরেই নেওয়া যায় যে, ভাদুড়িমশাইও নিতান্ত নিরস্ত্র অবস্থায় গাড়ি থেকে নামেননি। একটু বাদেই ওঁরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

হাতঘড়ির দিকে তাকালুম। রাত এখন দশটা কুড়ি। এই সময়েও পুরনো দিল্লির রাস্তাঘাটে প্রচুর লোক চলাচল করে, যেমন বড়রাস্তায় তেমনি ছোটখাটো গলিতেও খোলা থাকে বেশ-কিছু খাবারের দোকান, টাঙ্গা আর অটো চলে, বিস্তর ফেরিওয়ালা চিৎকার করে নজর কাড়ে পথচলতি মানুষের। কিন্তু নিউদিল্লির ব্যাপার আলাদা। সেখানকার চওড়া-চওড়া সব রাস্তা এর অনেক আগেই ফাঁকা হয়ে যায়। হুশহাশ করে দিশি-বিদেশি গাড়ি তখনও চলতে থাকে ঠিকই, কিন্তু রাস্তাঘাটে মানুষজন বড় একটা চোখে পড়ে না। আর এ তো ওখ্‌লা। শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে এ-জায়গা অনেক দূরে। এককালে তো এখানে জনবসতি ছিল না বললেই চলে, কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মহানগরের সীমানাও দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি, বাড়ি-ঘরের সংখ্যা এ-দিকেও সেইসঙ্গে বাড়ছে বই কী। তবু, তুলনায় এ-দিকটা এখনও মোটামুটি ফাঁকা। তার উপরে, রাত ক্রমেই বাড়ছে। এত রাতে এখানে রাস্তায় লোকজন থাকার কথাই নয়। নেইও। প্রাইভেট গাড়িও চোখে বিশেষ

পড়ছে না। শুধু কিছু ট্রাক মাঝে-মাঝে এক প্রান্ত থেকে ছুটে এসে আবার অন্য প্রান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার পরেই আবার সব স্তব্ধ হয়ে যায়।

রাত সাড়ে দশটায়, একেবারে হঠাৎই, যেন সেই স্তব্ধতার বুকে ছুরি চালিয়ে দিয়ে, তীব্র একটা হুইস্‌ল বেজে ওঠে। সেইসঙ্গে ভেসে আসে কিছু ভারী বুটের শব্দ। দূরে একটা চেঁচামেচির শব্দও শুনতে পাই। পরক্ষণে সেটা থেমে যায়। মোহন বলে, "অ্যাকশন শুরু হো গিয়া হোগা।" আমরা কোনও কথা বলি না। নিশ্বাস বন্ধ করে আমি আমার হাতঘড়ির মিনিটের কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকি।

মিনিটের কাঁটা পিছলে-পিছলে ঘুরে যাচ্ছে। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় হঠাৎ রাত্রির নৈঃশব্দ্য আবার ভেঙে যায়। পরপর কয়েকটা শব্দ শুনে বুঝতে পারি, বোমা পড়ছে। তারপরেই শুরু হয়ে যায় বোমার বৃষ্টি। যারা বোমা ছুড়ছে, ক্রমেই যে তারা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, পায়ের শব্দ আর কোলাহল থেকে তাও টের পাই। মোহনের গলা শুনে বুঝতে পারি, সে ভয় পেয়েছে। কাঁপা-কাঁপা গলায় সে বলে, "আগর্ আপ চাহে তো ইয়াঁহা বইঠ্ শক্‌তে হ্যায়, পর্ হাম্ অব্ চলে যায়েঙ্গে।" বলে সে আর এক মুহূর্তও দেরি করে না, গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় নেমে ছুটতে থাকে।

ভাদুড়িমশাই বলে দিয়েছিলেন, তার উপরে এখানকার পুলিশ-অফিসারটিও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কোনও অবস্থাতেই যেন আমরা গাড়ি থেকে না নামি। কিন্তু সে-কথা তখন আর মনে থাকে না। মোহনকে পালাতে দেখে আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। আর ঠিক তখনই নিভে যায় রাস্তার সমস্ত আলো। অন্ধকারের মধ্যে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা ছুটতে থাকি। ছুটতে-ছুটতেই হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই আমি। হাঁটুতে প্রচণ্ড লাগে। মনে হয়, আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারব না। কাছেই বোমা ফাটে একটা। সদানন্দবাবু 'মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠেই আমার পাশে বসে পড়েন। আমার মনে হয়, আজই আমাদের শেষ দিন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। পিছন থেকে ছুটতে-ছুটতে একটা লোক আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর, যেন দুটো ন্যাকড়ার পুতুল কুড়িয়ে নিচ্ছে, এইভাবে রাস্তা থেকে আমাদের দুজনকে দু'কাধে তুলে নিয়ে ফের ছুট লাগায়। ছুটতে-ছুটতেই ঢুকে পড়ে বড় রাস্তার পাশের একটা অন্ধকার গলিতে। সেখানে আরও খানিকটা এগিয়ে একটা মাঠকোঠার মতো দোতলা বাড়ির একতলার দরজায় ধাক্কা মারতেই দরজা খুলে যায়। মনে হয়, বাড়িতে কেউ নেই। লোকটাও সম্ভবত তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে আর দেরি করে না। দরজা খুলে যেতেই আমাদের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। তারপরে আর অপেক্ষা না-করে, যে-রকম ছুটতে-ছুটতে এসেছিল, সেইভাবেই আবার ছুটতে-ছুটতে ফিরে যায় বড় রাস্তার দিকে।

আমাদের বোধবুদ্ধি একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেস্‌ল। পরপর যা সব কাণ্ড

ঘটল, তাতে সেটা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। কোনও কিছুই মাথায় ঢুকছিল না আমাদের। কে এই লোকটা? দিল্লি-পুলিশেরই কোনও কনস্টেবল কি হাবিলদার? নাকি শত্রুপক্ষের কোনও লোক? কিছুই বোঝার উপায় নেই। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছিলুম যে, লোকটা অসম্ভব শক্তিশালী। তা নইলে সে রাস্তা থেকে একইসঙ্গে দু'দুটো লোককে এইভাবে কাঁধে তুলে এ-রকম ছুটতে-ছুটতে এখানে নিয়ে এল কী করে?

এখানে আমাদের ঢুকিয়েই বা দিল কোথায়? আলো নেই। হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা। তবু কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে হাত বুলোতে লাগলুম, যদি একটা সুইচ খুঁজে পাওয়া যায়। পাওয়া গেল না। জানলা থাকলে দেওয়ালে হাত বুলিয়ে সেটা বোঝা যেত। না, তাও নেই। তবে এখন শুক্লপক্ষ। তিথিটা নবমী। সম্ভবত সেই কারণেই ঘরের মধ্যে খুব সামান্য একটু আলো এসে পড়েছে। কোন পথে সেটা আসছে, উপরে তাকিয়ে সেটা বোঝা গেল। একটা ঘুলঘুলি। অন্ধকারটা চোখে একটু সয়ে আসার পরে বোঝা গেল যে, এটা একটা অন্ধ কুঠুরির মতো জায়গা। এই কুঠুরিতে একটা দরজা ছাড়া বড়-বড় দুটো বাক্স আছে, আর আছে একদিকে স্ট্যাক করে রাখা ট্যাবলয়েড সাইজের, মানে ছোট মাপের খবরের কাগজের সাইজের, কিছু কাগজ। তা ছাড়া আর কিছুই এখানে নেই। দরজায় খিল এঁটে দিলুম। এখন দেখা যাক কী হয়।

সদানন্দবাবু জ্ঞান হারাননি। তবে বেদম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। খুবই স্বাভাবিক। কুঠুরির এক কোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তিনি ঝিম মেরে বসে আছেন। সেখান থেকেই নিস্তেজ গলায় বললেন, "আমি বোধহয় আর বাঁচব না, কিরণবাবু। আপনারা আমার উইডোকে একটু দেকবেন।"

আমি বললুম, "ও কী কথা, অপারেশন যদি সাকসেসফুল হয়, তা হলে ওরা আমাদের খুঁজতে বেরোবে ঠিকই, আর খুঁজতে-খুঁজতে এখানে নিশ্চয় এসেও যাবে। ...কিন্তু আপনার কি খুবই লেগেছে?"

"মুখে লেগেচে। মুখ রক্তে ভেসে গেচে! মুখে হাত বুলিয়ে জিভে আঙুল ঠেকিয়েছিলুম। নোনা ঠেকল। তার মানে রক্ত। হাতটা চটচট করচে।..... একটা রুমাল দিতে পারেন?"

"আপনার রুমাল কী হল?"

"গাড়িতে ফেলে এসেচি, নয়তো পথে কোথাও পড়ে গেচে। কী করি বলুন তো?"

আমি সাধারণত দুটো রুমাল নিয়ে বেরোই। কিন্তু সে-দুটোই তো এখন আমার দুই হাঁটুতে বাঁধা। তাতেও রক্ত লেগে আছে, তা দিয়ে অন্যের মুখ মোছার কথা ভাবাই যায় না। একটু ভেবে বললুম, "দাঁড়ান, এক কাজ করা যাক।" বলে স্ট্যাক্-করা কাগজ থেকে একটা শিট টেনে নিয়ে, সেটা আধাআধি ছিঁড়ে একটা অংশ

দিয়ে সদানন্দবাবুর মুখ মুছিয়ে বাকি অংশটা তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, "এটা ভাঁজ করে আপনার পকেটে রেখে দিন, আপাতত এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে।"

একটা ব্যাপার লক্ষ করছিলুম। আমরা এই কুঠুরিতে ঢোকার পরেও বোমা ফাটার যে শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, বেশ কিছুক্ষণ ধরেই সেটা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু এমন সাহসও হচ্ছিল না যে, দরজা খুলে বাইরে বেরোই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সাড়ে এগারোটা বাজে। তার মানে প্রায় ঘণ্টাখানেক এই কুঠুরির মধ্যেই আমরা বসে আছি। কে জানে আর কতক্ষণ আমাদের এইভাবে বসে থাকতে হবে।

দরজায় ধাক্কা পড়ল রাত বারোটায়। সেইসঙ্গে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন : 'কিরণবাবু, সদানন্দবাবু, আপনারা কোথায়?' এ-গলা আমার চেনা। ভাদুড়িমশাই। দরজা খুলে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাইরে তাঁরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন। ভাদুড়িমশাই, অমৃক সিং আর সুরিন্দর বেদী। টর্চ ফেলে সদানন্দবাবুকে দেখে ভাদুড়িমশাই শিউরে উঠে বললেন, "এ কী, আপনার মুখের এই অবস্থা কী করে হল?"

শুনে, দু'পা এগিয়ে সদানন্দবাবু যে-ভাবে ভাদুড়িমশাইয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সেটা দেখে, এত হেনস্থার মধ্যেও আমার 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির সেই অবিস্মরণীয় দৃশটির কথা মনে পড়ে গেল, সেই যেখানে মগনলাল মেঘরাজের চ্যালার রোমহর্যক ছোরার খেলার শেষে লালমোহনবাবু সটান ফেলুদার কোলে মূর্ছা গেসলেন।

।। ১২ ।।

তা এ-সব কাল রাতের খবর। এখন আবার আজকের কথায় ফিরব। কিন্তু তার আগে বলা দরকার, কালকের রেইডের ফলাফল কী দাঁড়াল।

হানা একইসঙ্গে দুটো ঘাঁটিতে দেওয়া হয়েছিল। দিল্লির ওখ্‌লায় আর কলকাতার খিদিরপুরে। কলকাতায় মোট আটজন গ্রেফতার হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন বিদেশি। এ-দেশে আসার ও থাকার কোনও বৈধ কাগজপত্র তারা দেখাতে পারেনি। ঘাঁটিতে জাল ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জ পাওয়া গিয়েছে কয়েক হাজার। সেইসঙ্গে জাল-নোটের বান্ডিলও কয়েক লক্ষ টাকার হবে। ন্যাটা কালু সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে রাজসাক্ষী হবে। এ-খবর ভাদুড়িমশাইয়ের কাছেই পাওয়া গেল। আজ তিনি কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

এখানকার খবর কাল রাতে ওখ্‌লা থেকে ফিরতি পথেই পেয়েছি। ধাবা ও তার দুই ধারের পার্কিং লট ও টেলিফোন বুথ থেকে গুরমিত সিং সোঁধি-সহ মোট পনেরোজন গ্রেফতার হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজন বিদেশি। গোটা এলাকাটা পুলিশ কর্ডন করে রেখেছিল। তাই বোমা ফাটিয়ে যারা পালাবার চেষ্টা করেছিল,

পুলিশের জালে তারা আটকে যায়। দুষ্কৃতীদের মধ্যে সাতজন জখম, পুলিশ-পার্টির পাঁচজন।

অ্যাকশন শেষ হবার পর ভাদুড়িমশাই আমাদের গাড়ির কাছে ফিরে এসেছিলেন। এসে দেখেন, গাড়িতে কেউ নেই। ফলে, তিনি আমাদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন।

খুঁজে পাওয়া যায়নি একমাত্র আমাদের ড্রাইভার মোহন সিংকে। গাড়ি লক্ না-করে, এমন কী চাবিটা পর্যন্ত গাড়িতেই ফেলে রেখে সে পালায়। সেই গাড়িতে করেই কাল রাত্তিরে আমরা ওখ্লা থেকে সফদরগঞ্জে ফিরে আসি।

ফেরার পথে একটা কাণ্ড হয়। সদানন্দবাবুকে বাঁ পাশে বসিয়ে ভাদুড়িমশাই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। খানিকটা পথ এগিয়ে তিনি বলেন, "সবই তো হল, কিন্তু কেসটাকে দাঁড় করানো খুব শক্ত হবে।"

পিছনের সিট থেকে আমি বললুম, "কেন?"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "কিছুই তো পাওয়া গেল না! ভেবেছিলুম, গাদা-গাদা জাল-সিরিঞ্জ পাওয়া যাবে! কিচ্ছু পাওয়া যায়নি! ব্যাটা সব সরিয়ে ফেলেছে! নিশ্চয় খবর পেয়ে গেস্‌ল!"

"তা হলে?"

"তা হলে আর কী! এখন এভিডেন্স বলতে স্রেফ গুর্‌মিতের ওই ট্রাক! কিন্তু ওটার উপরে ভরসা করে আর কদ্দুর যাওয়া সম্ভব? পুলিশ বলবে, গুর্‌মিত ওই ট্রাক চালিয়ে অমিতাভ ঘোষকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। জবাবে ওদের উকিল বলবে, মার্ডার কেন করতে চাইবে, মোটিভ্ কী, ওটা জাস্ট একটা অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"মোটিভ প্রমাণ করা যাবে না?"

"যেত, যদি গুর্‌মিতের ওই ডেরা থেকে পুলিশ কিছু জাল-সিরিঞ্জ উদ্ধার করতে পারত। সরকারি উকিল সে-ক্ষেত্রে বলতে পারত যে, গুর্‌মিত জাল-সিরিঞ্জের কারবার করে, অমিতাভ ঘোষের অ্যাড-ক্যাম্পেনে সেই কারবার ধাক্কা খেয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট্‌স হোয়াই হি ওয়ান্টেড টু গেট হিম মার্ডারড। কিন্তু কিছুই তো .....আরে, আরে, ওটা আপনি কী দিয়ে আপনার মুখ মুছছেন?"

গাড়ি চালাতে-চালাতেই কথা বলছিলেন ভাদুড়িমশাই। সেই অবস্থাতেই স্পিড কমিয়ে, ব্রেক কষে বললেন, "ওটা কী, সদানন্দবাবু?"

সদানন্দবাবু তাঁর পকেট থেকে সেই কাগজখানার বাকি অর্ধাংশ বার করে মুখ মুছতে শুরু করেছিলেন। হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "আজ্ঞে, এটা একটা কাগজ। রুমাল হারিয়ে ফেলেছি বলে এইটে দিয়ে মুখের রক্ত মুছতে হচ্চে।"

কাগজখানা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন ভাদুড়িমশাই। গাড়ির বাতি জ্বালিয়ে সেটা দেখে বললেন, "এই কাগজ আপনি পেলেন কোথায়?"

আমি বললুম, "ওটা আমিই ওঁকে দিয়েছিলুম। যে-কুঠুরির মধ্যে আমাদের দুজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে এমন বিস্তর কাগজ স্ট্যাক করা রয়েছে। তারই একটা শিট তুলে তার আধখানা ছিঁড়ে আমি ওঁর রক্ত মুছিয়ে দিই, বাকি আধখানা উনি পকেটে রেখে দেন।....কেন, তাতে কী হল?"

"কী হল, কুঠুরির মধ্যে আলো না থাকায় সেটা আপনারা কেউই বুঝতে পারেননি। নিন, গাড়ির আলো তো জ্বেলে দিয়েছি, এবারে ভাল করে দেখুন।"

কাগজখানা ভাদুড়িমশাইয়ের হাত থেকে নিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার বিষম খাবার উপক্রম। দুপিঠ-ছাপানো কাগজখানা আসলে পরপর-সাজানো নোটের সারি। সবই পাঁচশো টাকার নোট।

ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকাতে তিনি বললেন, "জাল নোট। এখানে আছে এক-এক সারিতে পাঁচখানা করে পাঁচ সারিতে পঁচিশখানা। কিন্তু এটা তো পুরো শিট নয়, তার অর্ধেক। পুরো শিটে তা হলে পঞ্চাশখানার মতো নোট থাকবে। এ-রকম শিট ওখানে কত আছে?

"প্রচুর।" আমি বললুম, "কিন্তু নোটগুলো তো আলাদা নয়। একই শিটে একসঙ্গে ছাপানো।"

"তাতে পাচার করার সুবিধে। পরে খুব ধারালো ব্লেডের কাটিং মেশিনে ফেলে এগুলো আলাদা করে নিলেই হল। ....থ্যাঙ্ক গড, ভাগ্যিস আমার কথা না শুনে আপনারা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন, আর ভাগ্যিস ঢুকেছিলেন ওই কুঠুরির মধ্যে। নইলে তো এই জাল-নোটের ব্যাপারটা ধরাই পড়ত না। এভিডেন্স হিসেবে এটা কাজে লাগবে।"

বলেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিলেন ভাদুড়িমশাই। আবার ছুট লাগালেন ওখ্‌লার সেই ঘাঁটির দিকে। আমার বুকের মধ্যে ফের ঢিবঢিব করে শব্দ হতে শুরু করেছিল। ভাবছিলুম, আমরা গিয়ে পৌঁছোনোর আগেই কেউ স্ট্যাক-করা সেই কাগজগুলোকে সরিয়ে ফেলবে না তো?

না, শেখর চৌহান খুবই হুঁশিয়ার অফিসার, গোটা এলাকাটা জুড়ে তিনি একেবারে নিশ্ছিদ্র পাহারার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। যাতে একটি মাছিও সেখান থেকে না গলতে পারে। ফলে, শুধু স্ট্যাক-করা সেই কাগজের শিটগুলো কেন, যে-দুটো বাক্স সেখানে দেখেছিলুম, বিশাল আকারের সেই বাক্স দুটোকেও সেখানে যথাস্থানেই পাওয়া গেল। আর সেই বাক্সের মধ্যেই পাওয়া গেল পুরনো, ব্যবহৃত হাজার কয়েক ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জ।

* * *

তো এখন আবার আজ সকালের কথায় ফেরা যাক। গেস্ট হাউসে আমাদের ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট খেয়েছি। ডাক্তারবাবু আমাকে আর সদানন্দবাবুকে অ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকশনও দিয়ে গেছেন। তার খানিক বাদে আমরা সবাই কনফারেন্স

রুমে এসে বসেছি। আমি এসেছি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে, আর সদানন্দবাবু এসেছেন তাঁর ফোলা মুখ নিয়ে।

কনফারেন্স রুমে শুধু আমরা কেন, অমৃক সিং আর সুরিন্দরও হাজির। গতকাল রাতের ঘটনা নিয়ে দু'চার কথার পর অমৃক বললেন, "এখন তা হলে আর ভাবনা কী। জাল-সিরিঞ্জও যখন পাওয়া গেছে, গুর্‌মিতের মোটিভ প্রমাণ করা তখন শক্ত হবে না। ওটাও গুর্‌মিতেরই বাড়ি। এ তো একেবারে ওয়াটার-টাইট কেস্‌।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "সবই হল, কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।"

সুরিন্দর বলল, "কোন বেপারটা?"

"কিরণবাবু আর সদানন্দবাবুকে রাস্তা থেকে তুলে ওই মাঠকোঠার কুঠুরিতে পৌঁছে দিল কে। সে ওখানে এলই বা কোত্থেকে?"

"তা জানি না।" আমি বললুম, "তবে একটা কথা বলতে পারি। লোকটা ভীষণ শক্তিমান। এমন ভাবে আমাদের দু'জনকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুট লাগাল, যেন দুটো তুলোর বালিশ নিয়ে দৌড়চ্ছে।"

"লোকটা কোনও কথা বলেনি?"

"না। একটাও না। তবে শুক্লপক্ষের নবমীর রাত তো। রাস্তার আলো নিভে গেলেও তাই আকাশে অল্প-স্বল্প আলো ছিল। তাতে যেটুকু যা ঠাহর করলুম, সেটা বলতে পারি।"

ভাদুড়িমশাই বললেন, "বেশ তো, তা-ই বলুন।"

বললুম, "লোকটা অসম্ভব কালো আর অসম্ভব ঢ্যাঙা। আপনারা কেউ অমন কাউকে চেনেন?"

শুনে, ভাদুড়িমশাই, সুরিন্দর আর অমৃক সিং যে-রকম বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকালেন, তাতেই বোঝা গেল যে, তাঁরা অন্তত অমন কাউকে চেনেন না। শুধু অমু হঠাৎ দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে টেবিলের উপরে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল।

সদানন্দবাবু অস্ফুট গলায় বললেন, "তারা ব্রহ্মময়ী মা গো, অবোধ সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখো মা!"

রচনাকাল : জুন, ২০০০